দ্বিতীয় ভাগ।

(ঐতিহাসিক।)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ,

ও

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

প্রণীত।

—*—

কলিকাতা,

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৯।

মুল্য ১।০ পাঁচসিক

আর্য্য-নারী

প্রথম ভাগ সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত।

স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি—"আর্য্যনারী" আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সম্যক্ আদরের বস্তু।"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার—"আর্য্যনারী' বড় সুন্দর।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর—"অতি মহৎ কার্য্য সুন্দর সফল হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল—"গ্রন্থ সুপাঠ্য, লোকহিতকর।"

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি, এল—"পুস্তক বাঙ্গালায় অমর হইবে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হইবে।"

শ্রীযুক্তা মানকুমারী দাসী—"আর্য্যনারী,' জাতীয় সাহিত্যে উজ্জ্বল রত্ন।"

ভারতী—"জাতীয় অমূল্য গ্রন্থাবলী,—জাতীয় উন্নতির সহায়;—সুললিত,—হৃদয়গ্রাহী।"

প্রবাসী—"আর্য্যনারী' কন্যা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার উপযুক্ত অতি উপাদেয় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক।"

বসুমতী—"প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মীরই এই পুস্তক খানি পাঠ করা উচিত। ইহার ভাষাও অতি প্রাঞ্জল।"

ঢাকাপ্রকাশ—"এই পুস্তকের সকলই সুন্দর। ললনাগণ এরূপ গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলে সংসার আবার সুখের আগারে পরিণত হইবে।"

শিক্ষা-সমাচার—"দেশের মহান্ অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই অতুলনীয়।"

বৃহদক্ষরে পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ।

মূল্য—রাজসং[illegible] পূর্ব্ববৎ—পাঁচ সিকা [illegible]

সূচীপত্র।

বঙ্গের নারী-গীতা

আর্য্য-নারী

প্রথম ভাগ—তৃতীয় সংস্করণ।

বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধযুগ এবং বিক্রমাদিত্যের কাল পর্য্যন্ত, সকল সময়ের, ভারতের সর্ব্বপ্রকার আদর্শ আর্য্যললনার একীকৃত পুণ্য-জীবনী।

নারীজাতির অর্চ্চনার পারিজাত-অঞ্জলি।

—প্রথম ভাগের সূচী—

প্রকাশক

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্,

৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আর্য্য-নারী।

দ্বিতীয় ভাগ।

দাহির-মহিষী।

(ভারতের আদি 'জহর-ব্রত' কাহিনী)

(১)

হিন্দুগৌরব সিন্ধুরাজ দাহির যখন সিন্ধুরাজ্যের সিংহাসন আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে, মুশল্লমানগণ ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করেন। সিন্ধু দেশই তখন বিদেশীয়দের ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রধান পথ ছিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে, আরবদেশে আরব জাতির মধ্যে প্রথমে মুশলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। নূতন ধর্ম্মবলে অনুপ্রাণিত বীর আরবজাতি, অতি অল্পকাল মধ্যে *এসিয়া* মহাদেশের পশ্চিমভাগ এবং আফ্রিকা নামক মহাদেশের উত্তরভাগ জয় করিয়া, বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। রাজধানী বোগদাদ্ নগরে প্রথম আরব সম্রাট্‌গণ এই বিপুল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। ইঁহারা খলিফা নামে অভিহিত। এই খলিফাদের

রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, মহম্মদ বিন্ কাশিম নামক একজন আরব সেনাপতি সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। দেবল বন্দর ও অন্যান্য কয়েকটি নগর অধিকার করিয়া, কাশিম, সিন্ধুরাজ দাহিরের রাজধানী আলোর নগরের সম্মুখে আসিলেন। রাজা দাহিরও তাঁহার সৈন্য সহ কাশিমের সম্মুখীন হইলেন।

তখন ভারতীয় রাজারা হাতী লইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইহাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই ছিল। হাতীকে রাগাইয়া ও ক্ষেপাইয়া শত্রু-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে শত্রু সৈন্য একেবারে মথিত হইত। আবার কখনো কখনো হাতী ভয় পাইয়া ফিরিলে, কিছুতেই তা'র গতিরোধ করা যাইত না। নিজ পক্ষীয় সৈন্য মথিত করিয়া হাতী চলিয়া যাইত। কখনো রাজা বা সেনাপতিকে লইয়া হাতী এমন ভাবে পলায়ন করিত, যে, সৈন্যগণ ভয় পাইয়া তাহার সঙ্গে পলাইত এবং অবশেষে যুদ্ধে পরাজয় ঘটিত।

এ যুদ্ধেও তাহাই হইল। মুশলমানের অস্ত্রে আহত হইয়া দাহিরের হস্তী দাহিরকে লইয়া ছুটিয়া পলাইয়া নিকটে এক নদীর মধ্যে গিয়া পড়িল। রাজাকে পলায়িত মনে করিয়া সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিল।

দাহির আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যগণের ভীতি ও চঞ্চলতায় যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা দেখিয়া, আঘাতের বেদনা তিনি ভুলিয়া গেলেন। অবিলম্বে তীরে উঠিয়া, একটি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, দ্রুতবেগে তিনি বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণের

মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। জ্বলন্ত উৎসাহবাক্যে ক্ষত্রিয় বীর আপন সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া, পুনরায় অমিত বিক্রমে মুশলমান-সৈন্যের সম্মুখীন হইতে আদেশ করিলেন।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন সৈন্য আর আগের মত শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারিল না। আরব সৈন্য অগ্রসর হইয়া যে স্থান অধিকার করিয়াছে, আর সে স্থান হইতে তাহারা হটিল না। দাহিরের বিচ্ছিন্ন ও স্খলিতপদ সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া ক্রমে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

দাহির বুঝিলেন, জয় ও রাজ্যরক্ষার আশা আর নাই। কিন্তু স্বাধীনতা হারাইয়া জীবন রাখিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। জীবনের শেষ—আশার শেষ—প্রচণ্ড শক্তিতে শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতে করিতে অবশেষে বীর নৃপতি দাহির, শত্রু-শোণিতে সিক্ত রণ-শয্যায়, ক্ষত্রিয় বীরের পরম গতি লাভ করিলেন। দীপ নিভিল; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা তেমনি অকলঙ্কিত রহিল।

কেবল, দাহিরের কাপুরুষ পুত্র, ক্ষত্রিয় গৌরব মসিলিপ্ত করিয়া দূরবর্ত্তী কোন নগরে পলায়ন করিল। সিন্ধুরাজ্য বিপদ সমুদ্রে পতিত হইল।

(২)

রাজধানী আলোর অরক্ষিত। রাজা নিহত, রাজপুত্র পলায়িত, সৈন্য বিধ্বস্ত, কে আর নগর রক্ষা করিবে? অসহায়

পুরনারীগণ বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হইবেন! পবিত্র আর্য্যনারীর দেহ বিদেশীর কলুষস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে! আলোরবাসী একটি পুরুষের দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিতে কি, সত্যই আলোর-পুরনারী বিদেশীর দাসী হইবে? এ কলঙ্ক যে, চিরদিন ভারতের ইতিহাসে ভারতবাসীকে হীন করিয়া রাখিবে! কেহ কি নাই, যে, আলোরের জীবিত—বিধ্বস্ত সৈন্যগণকে একত্র করিয়া আবার তাহাদের প্রাণে সাহস সঞ্চারিত করে—শেষ মরণ-পণে আলোরের মর্য্যাদা রক্ষা করে?

অন্তরের অন্তরে দাববহ্নি জ্বলিল,—দাহির-পত্নী পতিশোক ভুলিলেন। পুত্রের কাপুরুষতার দারুণ লজ্জার বেদনা প্রাণে চাপিয়া রাখিলেন। অবিলম্বে, ভীমা ভৈরবী রণরঙ্গিনী বেশে অশ্বারোহণে আলোরের রাজপথে আবির্ভূতা হইলেন।

আলোর রাজ্য চমকিল। রণরঙ্গিনীর গভীর ভীম হুঙ্কারে আলোরবাসী স্তম্ভিত হইল। বীরাঙ্গনার বীর-আহ্বানে ভীত—বিধ্বস্ত ও পলায়িত সৈন্যগণ আশ্চর্য্য মানিয়া নূতন সাহসে তাঁহার চারিদিকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পুরবাসীরা গৃহ ছাড়িয়া অস্ত্র লইয়া সৈন্যগণের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাণী সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সৈন্যগণ! পুরবাসিগণ! যে যেখানে আছ, আজ শোন!—শোন, তোমাদের বীররাজা নিহত, অধম রাজপুত্র পলায়িত। কিন্তু ভয় পাইও না। আমি আছি,—রাজার রাণী আমি, বীরের সহধর্ম্মিণী আমি—আজ তোমাদিগকে যুদ্ধে বলদান করিব। আমি

আজ তোমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইব। তোমাদের মাতৃভূমি আজ শত্রুর পদতলে পতিত প্রায়; তোমাদের দেব-মন্দির আজ বিধর্ম্মীর পদাঘাতে ভগ্নপ্রায়। তোমাদের মাতা পত্নী ভগিনী ও কন্যাগণ আজ বিদেশীর দাসী হইতে চলিয়াছে; তবে আর কোন্ সুখের আশায় আজ ছার জীবন রক্ষার বাসনায় গৃহে পলাইতেছ? স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের লাঞ্ছনা যদি চক্ষে না দেখিতে চাও, কুলনারীকে বিদেশীর স্পর্শে যদি কলঙ্কিত দেখিতে না চাও, কুক্কুরের মত বিদেশীর অসিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন যদি হইতে না চাও, বন্য পশুর ন্যায় শৃঙ্খলিত হইয়া বিদেশীর গৃহে যদি বিদেশীর সেবা না করিতে চাও, তবে চল!—সকলে আজ আমার সঙ্গে আমার সমক্ষে মরণ পণ কর! মরণ পণে,—দেশের গৌরব, জাতির গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব, কুলনারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব রাখিতে প্রস্তুত হও!”

ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সিন্ধুরাজধানীময় কল কল শব্দ উত্থিত হইল;—হুঙ্কারে জয়নাদে সমস্ত পুরী কম্পিত হইয়া উঠিল।

(৩)

সৈন্যগণ ও পুরবাসিগণ প্রত্যেকে মরণ পণে রাণীর আদেশ পালনে প্রস্তুত হইয়াছে। এ দিকে আরব সৈন্য নগর অবরোধ করিয়া নগর-প্রাচীর আক্রমণ করিল।

বীর্য্যবতী রাণী সেই মুহূর্ত্তে অনুবর্ত্তী সৈন্য ও পুরবাসিগণের

সাহায্যে, আক্রমণে প্রবল বেগে বাধা দিয়া নগর রক্ষার সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত রাণী অদম্য উৎসাহে ও অতুল বিক্রমে নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নগরের সঞ্চিত আহার্য্য ফুরাইল ; বাহির হইতে আহার্য্য আসিবার উপায় নাই। সহসা এইরূপে অবরুদ্ধ হইয়া বহুদিন নগর রক্ষা করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে কেহ মনে করিতে পারেন নাই। সুতরাং অবরোধের পূর্ব্বে সমস্ত নগরবাসীর জন্য বহুদিনের মত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই।

রাণী দেখিলেন, আর নগর রক্ষার উপায় নাই।

তখন, তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা রাণী, সমস্ত প্রধান নাগরিক ও সেনানায়কগণকে একত্র করিয়া কহিলেন,—"সিন্ধুগৌরব বীরগণ! দেখিতেছ আর রক্ষার উপায় নাই। কিন্তু শোন!—রক্ষার উপায় নাই বলিয়া আমরা জীবিত থাকিতে শত্রুর করে আত্মসমর্পণ করিব না! মরিতে একদিন হইবেই, তবে এস, আমরা মানুষের মত সকলে মরিব। মানুষ হইয়া, ক্ষত্রিয় হইয়া, রাজপুত হইয়া, মনুষ্যত্বহীন পরাধীন জীবন কখনো গ্রহণ করিব না! আমরা আর্য্যনারী, সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কখনো ডরাই না। স্বামীর পরলোকে স্বামী-বিরহিত অসার জীবন বহন না করিয়া, স্বামীর চিতায় স্বামীর পরলোকের সঙ্গিনী, আমরা হইয়া থাকি। পুরবাসিনী আমরা সকলে একত্রে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তা'রপর, আমাদের এই ভীষণ মৃত্যুর সদ্য স্মৃতির অগ্নিজ্বালা বুকে লইয়া, বীর তোমরা সকলে শত্রু নাশ করিতে করিতে শত্রুর

অসিতে রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের প্রিয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর! শোন! —আজ আমরা যে কঠোর পবিত্র জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, ভারতে রাজপুতনারী বিদেশী শত্রু হইতে ধর্ম্মরক্ষার জন্য চিরদিন সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভারতনারীর পবিত্র নাম গৌরবান্বিত করিবে।”

রাণী নীরব হইলেন। সমস্ত সিন্ধু-বীর ধীর গম্ভীর ভাবে রাণীর বাক্য অনুমোদন করিলেন।

তখন নগরের মধ্যস্থলে ভীষণ চিতা প্রস্তুত হইল। রাণী ও অন্যান্য পুরনারীরা রক্ত বসন পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই ধ্বক্ ধ্বক্ প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তে অগ্নির সহস্র জিহ্বা আকাশ স্পর্শ করিল। সহস্রে সহস্রে দাঁড়াইয়া, নয়ন সমক্ষে, সিন্ধুর বীরগণ সেই মর্ম্মভেদী ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন। কাহারও মাতা, কাহারও পত্নী, কাহারও ভগিনী, কাহারও কন্যা একে একে চিতানলে প্রবেশ করিলেন। বীরগণের মর্ম্মে মর্ম্মে সহস্র চিতা জ্বলিল। সে জ্বালা নীরবে জ্বলিল, সে আগুন প্রাণের মর্ম্মে শিখা বিস্তার করিল।

প্রাণের ভক্তির, প্রীতির ও স্নেহের সারধনগুলি একে একে অনলে পুড়িল; বীরগণ ধীর অটলভাবে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন।—দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইল। তখন, ভীম হুঙ্কারে নগর কাঁপাইয়া সহস্র সহস্র বীর, প্রলয় কালের এক একটি জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় ছুটিয়া আরবসেনার মধ্যে পড়িলেন। সে বেগ—সে তেজ, সে অশনিসম্পাতে বহু আরব সেনা, নিঃশেষে

ভস্মীভূত হইল। অশনির আগুনও চিরদিনের মত—নিভিল।

দাহির-মহিষীর তেজ সেই দিন সমস্ত পৃথিবীর কাছে অগ্নিময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। দাহির-মহিষী হইতেই ভারতের ঐতিহাসিক ভীষণ অগ্নিলীলা "জহর-ব্রত" প্রচলিত হয়।

সংযুক্তা।

(১)

মুশলমানগণ যখন ভারতবর্ষ জয় করেন, তখন উত্তর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রাজপুত নামক ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধান্য ছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশের যে বিস্তীর্ণ প্রদেশের নাম রাজস্থান বা রাজপুতানা, তাহাই রাজপুত জাতির আদিস্থান। ইঁহাদের নাম অনুসারেই ঐ প্রদেশের নাম রাজস্থান বা রাজপুতানা হইয়াছে।

সাহস, বীরত্ব ও মহানুভবতায় রাজপুত জাতির তুলনা জগতে হয় না। এই সমস্ত গুণে রাজপুত-রমণীরাও রাজপুত পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। বস্তুতঃ রাজপুত জাতির মধ্যে যত বীরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জগতে আর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

প্রাচীন—পৌরাণিক যুগের কোন গ্রন্থে রাজস্থান বা রাজপুত জাতির কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বিক্রমাদিত্য, শিলাদিত্য প্রভৃতি রাজগণের পরে, ক্রমে ভারতের প্রাচীন রাজবংশীয়েরা হীনতেজ হইয়া পড়েন। সেই সময়, রাজস্থান প্রদেশের এই অজানা রাজপুত জাতি, নূতন শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া, উত্তর ভারতবর্ষে জয়ের পতাকা তুলিলেন।

মুশলমানগণ ক্রমে উত্তর ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, রাজপুত জাতির আদিস্থান রাজপুতানা তাঁহারা কখনো অধিকার করিতে পারেন নাই। যখন পাঠান সম্রাট্‌গণ দেশশাসন করিতেন, তখন রাজস্থানের রাজপুতগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালেই, মিবারের রাণা ব্যতীত, আর সব রাজপুত রাজারা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু, নামে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহারা নিজরাজ্য নিজেরাই শাসন করিতেন এবং কখন কখন আকবরের অধীনে সেনাপতিত্ব, বা কোন খণ্ড-রাজ্যে শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া, সাম্রাজ্যের বিস্তারে সহায়তা করিতেন।

রাজপুত রাজগণের মধ্যে, কেহ কেহ প্রাচীন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। অন্যান্য সকলে অগ্নিকুল নামে আর নূতন চারিটি বংশের সন্তান। এই অগ্নিকুলের জন্ম সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প আছে।

জৈন নামে ভারতবর্ষে একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় জৈন ধর্ম্মও হিন্দুজাতি হইতেই উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু এই উভয় ধর্ম্মই অনেক পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মের মত-বিরোধী। বৌদ্ধ ও জৈনগণের উদয়ে এক সময়ে, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ খুব হীনবল হইয়া পড়ে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণ অনেক চেষ্টা করিয়া আবার ভারতবর্ষে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণ ও জৈনগণের

মধ্যে যখন প্রাধান্য লইয়া বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন, ঋষিগণ জৈনদিগের দমন জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে, পুরীহর, চালুক, প্রমার এবং চোহান নামক চারি জন বীরপুরুষ উঠিলেন। ইহার মধ্যে চোহানই বীরত্বে সর্ব্বপ্রধান। ইঁহারই বিক্রমে জৈনকুলের শক্তি নাশ হইয়া, ভারতে আবার, হিন্দুর প্রাধান্য হইল।

রাজপুত জাতির ঐ চারিবংশই অগ্নিকুল বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। সূর্য্যবংশীয় রাজপুতগণের মধ্যে মিবারের রাণারা এবং মারবারের রাঠোর রাজবংশই প্রধান।

রাজপুত জাতির, ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(২)

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, গজনীর রাজা সুলতান মামুদ, দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি অনেক নগর লুঠেন এবং অনেক দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু, একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত আর কোন দেশ তিনি অধিকার করিতে পারিলেন না।

ইহার পর দেড়শত বৎসরের অধিককাল আর কোন মুশলমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। পরে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে আফগানিস্থানের অন্তর্গত ঘোর রাজার ভ্রাতা ও সেনাপতি সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ অধিকার করিবার ইচ্ছায় বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

এই সময় দিল্লী, আজমীর, কনোজ, মিবার প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলি বিশেষ পরাক্রান্ত ছিল।

দিল্লীর রাজা অনঙ্গপালের মাত্র দুইটি কন্যা ছিল। এক কন্যা চোহানবংশীয় আজমীররাজ সোমেশ্বর এবং অন্য কন্যা রাঠোর-বংশীয় কনোজরাজ বিজয়লাল, বিবাহ করেন। সোমেশ্বরের পৃথ্বিরাজ এবং বিজয়লালের জয়চাঁদ নামে পুত্র হয়।

পুত্রহীন দিল্লীরাজ অনঙ্গপাল, মৃত্যুকালে পৃথ্বিরাজকে দিল্লীর সিংহাসন দান করেন। ইহাতে পৃথ্বিরাজের প্রতি জয়চাঁদের বিশেষ ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ জন্মিল। সংযুক্তা এই কনোজরাজ জয়চাঁদের কন্যা।

দিল্লী ও আজমীররাজ পৃথ্বিরাজ বীরত্বে ও মহৎচরিত্রে ভারতের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। বীরাঙ্গনা চিরদিনই বীরত্বের পক্ষপাতিনী। পৃথ্বিরাজের প্রতি পিতার দারুণ বিদ্বেষ ও শত্রুতার কথা জানিয়াও, সংযুক্তা, পৃথ্বিরাজের প্রতি অনুরাগিনী হইলেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোনও রাজা বিশেষ পরাক্রমশালী হইলে অন্যান্য রাজারা তাঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং এই প্রধান রাজা 'সম্রাট্' বা 'সার্ব্বভৌম' উপাধি গ্রহণ করিতেন। একে পৃথ্বিরাজ বীরত্বের জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তা'রপর আবার মাতামহের দিল্লীরাজ্য পাওয়ায় তাঁহার ক্ষমতাও বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে। কুটিলমতি জয়চাঁদের ইহা সহ্য হইল না। তিনি আপনাকে 'সার্ব্বভৌম' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

কোন কোন রাজা তাঁহাকে সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু পৃথ্বিরাজ এবং তাঁহার পরম সুহৃদ্ মিবার-রাজ বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহ তাঁহার এই উপাধি গ্রাহ্য করিলেন না। জয়চাঁদ আপনার সার্ব্বভৌম পদ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল পৃথ্বিরাজ, ও সমরসিংহের নিমন্ত্রণ হইল না। তাঁহাদিগকে অপমান করিবার জন্য জয়চাঁদ, পৃথ্বিরাজ ও সমরসিংহের দুইটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞসভার দ্বারপালরূপে সেই দুইটিকে স্থাপিত করিলেন।

যজ্ঞের পরেই সংযুক্তা স্বয়ম্বরা হইবেন বলিয়া জয়চাঁদ ঘোষণা করিলেন।

যথাসময়ে সংযুক্তা পিতার আদেশে বরমাল্য লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানিতেন, পৃথ্বিরাজের নিমন্ত্রণ হয় নাই, কিন্তু দ্বারপালরূপে পৃথ্বিরাজের প্রতিমূর্ত্তি সভাগৃহের দ্বারদেশে আছে। সমবেত রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া, সংযুক্তা, সেই প্রতিমূর্ত্তির গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

ক্রোধে ও ঘৃণায় জয়চাঁদ উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় স্ব-ইচ্ছায় সংযুক্তা পৃথ্বিরাজের গলায় বরমাল্য দান করিয়াছেন, অন্য কোন্ রাজা তাঁহাকে আর বিবাহ করিবেন? জয়চাঁদই বা কোন্ মুখে অন্যের হস্তে সংযুক্তাকে সম্প্রদান করিতে চাহিবেন? সরোষে যথেচ্ছ তিরস্কার করিয়া তিনি সংযুক্তাকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন।

নীরবে সমুদায় নির্য্যাতন সহ্য করিয়া বীরত্বাভিমানিনী সংযুক্তা, পিতৃগৃহে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বীরকেশরী পৃথ্বিরাজ এ সংবাদ শুনিবামাত্র কনোজ আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে জয়চাঁদকে পরাস্ত করিয়া সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।

(৩)

এই ঘটনায় পৃথ্বিরাজের প্রতি জয়চাঁদের বিদ্বেষ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তিনি সর্ব্বদা এই অবমাননার প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী বিপুল বিক্রমে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আক্রমণ করিতেছিলেন। পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়কলঙ্ক জয়চাঁদ, নিজশক্তিবলে পৃথ্বিরাজকে কখনো দমন করিতে পারিবেন না জানিয়া, মহম্মদ ঘোরীর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার প্ররোচনায় এবং গুপ্ত সাহায্য লাভের আশায় মহম্মদ ঘোরী দিল্লীরাজ্য আক্রমণ করিলেন।

পৃথ্বিরাজ রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। পৃথ্বিরাজের পরমবন্ধু ও ভগিনিপতি সমরসিংহ চিতোর হইতে তাঁহার সাহায্যের জন্য সসৈন্যে দিল্লীতে আসিলেন। যুদ্ধযাত্রার সময়, নিজ হস্তে সংযুক্তা, বীর স্বামীকে বীরসাজে সাজাইয়া দিলেন। শেষ বিদায় কালে, স্বামীর চিত্ত পাছে দুর্ব্বল হয়, পাছে প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমের মোহে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ক্ষত্রিয়োচিত

বীরত্ব প্রদর্শনে, রাজার ন্যায় রাজধর্ম্ম পালনে, কুণ্ঠিত হন, তাই সংযুক্তা কহিলেন,—"স্বামিন্! দেশ রক্ষার জন্য, রাজধর্ম্ম পালনের জন্য, ক্ষত্রিয়বীর হইয়া বীরকীর্ত্তি লাভের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইও না। যে কোন অবস্থায়, যে কোন মুহূর্ত্তে তোমার মৃত্যু হইতে পারে। যে কোন মুহূর্ত্তে এই সুন্দর, সুস্থ ও সবল দেহ, এই রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ বিলাস, মৃত্যুর কঠোর ও আকস্মিক আঘাতে তোমার, শেষ হইয়া যাইতে পারে। কেন তবে বীরধর্ম্ম পালনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মরিতে পরাঙ্মুখ হইবে? তোমার রাজ্য, ধন, রূপ, যৌবন প্রভৃতি পার্থিব ভোগ্য যা' কিছু আছে, সব ফুরাইবে, কিন্তু বীরকীর্ত্তি কখনো ফুরাইবে না। নশ্বর কোন পার্থিব সুখ ভোগের আশায় অমর কীর্ত্তি হারাইও না। যাও, প্রশান্ত চিত্তে তেজস্বীহৃদয়ে যুদ্ধে যাও। দেবগণের কৃপায় তোমার অসি শত্রুদেহ খণ্ড খণ্ড করুক, তোমার যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুশোণিতে প্লাবিত হউক, তোমার দেহ হোলি-উৎসবে ফাগের মত শত্রুশোণিতে রঞ্জিত হউক। বিজয়-গৌরবে দীপ্তিমান হইয়া গৃহে ফিরিয়া শত্রুর শোণিতসিক্ত হস্তে কুলদেবতার চরণ বন্দনা কর। শত্রু বিনাশে তুষ্ট কুলদেবতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

পত্নীর জ্বলন্ত উৎসাহ-বাক্যে উদ্দীপিত হইয়া সিংহবিক্রমে পৃথ্বিরাজ, সমরসিংহ সহ রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। বীরদ্বয়ের পরাক্রম ও রণকৌশলে মহম্মদ ঘোরী পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন।

(৪)

পরবৎসর মহম্মদ ঘোরী অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার দিল্লীরাজ্য আক্রমণ করিলেন। আবার সমরসিংহ আসিলেন। আবার সংযুক্তা স্বামীকে বীরবেশে সজ্জিত করিয়া উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বিদায় দিলেন। কিন্তু এবার সংযুক্তার মনে প্রথম হইতেই কেমন অমঙ্গল আশঙ্কা হইতেছিল। ইহা বুঝিতে পারিয়া পাছে স্বামীর কোনরূপ চিত্তবিকার ঘটে, তাই সংযুক্তা মনের ভাব চাপিয়া হাসিমুখে তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছিলেন।

কথা শেষ হইল, কিন্তু মুখের হাসি মুখে থাকিতে থাকিতে এক ফোঁটা অশ্রু, পৃথ্বিরাজের হাতে পড়িল।

চকিত হইয়া পৃথ্বিরাজ সংযুক্তার মুখের দিকে চাহিলেন, সংযুক্তা মুখ ফিরাইলেন। পৃথ্বিরাজও আর অপেক্ষা করিলেন না। সেই মুহূর্ত্তে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে এ জীবনের মত রাজদম্পতি পরস্পরের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংযুক্তা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এই শেষ! এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না—!"

পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও দৃশদ্বতী-তীরে তিরৌরী ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুশলমান সেনা সমবেত হইল। একদিন তুমুল যুদ্ধের পর, কূটনীতি-বিশারদ মহম্মদ ঘোরী, সন্ধির প্রস্তাব করিয়া

অবসর চাহিয়া পাঠাইলেন। সরলপ্রাণ, উদারচেতা রাজপুত বীর, কখনো শত্রুর অনুগ্রহ-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতেন না। পৃথ্বিরাজ, ঘোরীর প্রার্থনাপূরণে অঙ্গীকার করিলেন। নিশ্চিন্ত মনে হিন্দুসেনা বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এমন সময়, সহসা মহম্মদ ঘোরী প্রবল বিক্রমে হিন্দু শিবির আক্রমণ করেন। অসতর্ক হিন্দুরা সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পৃথ্বিরাজ ও সমরসিংহ অতুলনীয় বিক্রমে ও রণকৌশলে আবার যথাসম্ভব ব্যূহরচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হিন্দুসেনাগণ আর তাহাদের সমগ্র শক্তি যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিল না। মহাবীর সমরসিংহ নিহত হইলেন। পৃথ্বিরাজ শত্রুকরে বন্দী হইলেন। নিষ্ঠুর মহম্মদ ঘোরী বন্দী পৃথ্বিরাজকে অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিল।

এইরূপে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, মুশলমান রাজত্বের সূত্রপাত। হিন্দুর গৌরবরবি তিরৌরী ক্ষেত্রে অস্তমিত হইল।

শেষ বিদায়ের পর, যে কয়দিন পৃথ্বিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, সে কয়দিন সংযুক্তা কেবলমাত্র জল পান করিয়া প্রাণধারণ করেন। পরে, স্বামীর পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র, চিতারোহণে, স্বামীগতপ্রাণা সতী, পতির অনুগমন করিলেন।

কর্ম্মদেবী।

(১)

(১)

চিতোর, রাজপুতানার মুকুটমণি—মিবারের জয়কেতন।—চিতোরের রাণা সমরসিংহ একদিকে যেমন বীরত্ব ও রণকৌশলে বিখ্যাত ছিলেন, অপর দিকে তেমনি ধার্ম্মিক ও পবিত্রচরিত্র বলিয়া সকলের অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ধর্ম্মতেজে তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ দেখা যাইত। এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'যোগীন্দ্র' বলিত। মহাবীর যোগীন্দ্র সমরসিংহ, পৃথ্বিরাজের ভগিনী—পৃথাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিরৌরীর যুদ্ধে স্বামী ও ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পৃথা চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কর্ম্মদেবী নামে সমরসিংহের অন্য এক রাণী ছিলেন। যুদ্ধে যাইবার সময় সমরসিংহ কর্ম্মদেবীর পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্ণের উপর রাজ্যভার দিয়া যান। বালকপুত্রের অভিভাবিকা স্বরূপ কর্ম্মদেবীই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সমরসিংহের মৃত্যুসংবাদ আসিলে পৃথা অনুমৃতা হইলেন; কিন্তু রাজধর্ম্মের অনুরোধে কর্ম্মদেবী পতির অনুগামিনী হইতে পারিলেন না। কঠোর বৈধব্যব্রত অবলম্বন করিয়া পুত্রপালন ও রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীজয়ের পর-বৎসর স্বদেশ-বৈরী কনোজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া কনোজ অধিকার করিলেন। ভাই ভাই যতই বিবাদ বিসম্বাদ করুক, বাহিরের শত্রু কেহ গৃহ আক্রমণ করিলে সকলেরই সমান বিপদ। গৃহরক্ষায় সকলেরই তখন আত্ম-কলহ ভুলিয়া একযোগে বাহিরের শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া এক ভাই যদি অন্যকে দমন করিবার জন্য এই বহিঃশত্রুর সহায়তা করেন, অথবা, ভাইয়ের সহায়তায় বিরত থাকেন, তবে সেই শত্রু একটি একটি করিয়া ভাইদের সকলেরই সর্ব্বনাশ করিতে পারে। মুশলমানের ভারতবিজয়ের সময় ভারতের হিন্দুরাজগণ এই অতি সহজ সত্যটিও, যেন, বুঝিতে পারেন নাই। তখন, মুশলমানের জয়ে ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই সর্ব্বনাশ। কিন্তু সকলের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুরাজগণ সকলের সমবেত শক্তি প্রয়োগে সাধারণ-শত্রু মুশলমানের গতিরোধ করিতে কখনো চেষ্টা করেন নাই। বরং একে অন্যের বিপক্ষতা করিয়াছেন। দিল্লীর বিপদে কনোজ তাহার সহায়তা না করিয়া বরং বিপক্ষতা করিল। প্রথমে দিল্লী শত্রুহস্তে পতিত হইল। পরে, কনোজ একা, কনোজও পতিত হইল। এইরূপে অতি সহজে মধ্যভারতবর্ষের দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্য মুশলমানের অধিকৃত হইল। ইহার পর অন্যান্য রাজ্যের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অতি কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও স্বাধীন হিন্দু-রাজ্যগুলি একত্র মিলিত হইতে পারিল না। একটি একটি করিয়া

মহম্মদ ঘোরী ও তাঁহার সেনাপতিগণ বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি উত্তরভারতের প্রায় সমুদয় রাজ্যগুলি অধিকার করিলেন। এইরূপে উত্তরভারতবর্ষ অধিকার করিয়া মহম্মদ ঘোরী সেনাপতি কুতবউদ্দিনের উপর তাহার শাসনভার অর্পণ করিলেন। শাসনকর্ত্তৃত্ব পাইবার অল্প পরেই কুতবউদ্দিন বিপুল সৈন্য সহ বীরভূমি রাজপুতানার অন্তর্গত সর্ব্বপ্রধান রাজ্য মিবার আক্রমণ করিলেন।

মিবাররাজ কর্ণ তখনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া কর্ম্মদেবীই রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। যে প্রবল মুশলমানশক্তিস্রোত সমস্ত উত্তরভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছে, সেই স্রোত আজ ক্ষুদ্র মিবার অভিমুখে ধাবিত। এই স্রোত প্রতিরোধ করিয়া আজ কে মিবার রক্ষা করিবে? মিবারের বীরগণের নেতৃত্বে আজ সমরসিংহ নাই, কে আজ সেই মহাবীর যোগীন্দ্রের কুলগৌরব রক্ষা করিবে? সর্দ্দারগণ ও রাজপুরুষগণ চিন্তায় আকুল হইলেন। কর্ম্মদেবীর নিকট সকলে গিয়া সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"মা, উপায় কি? মিবার ত রক্ষা পায় না!" কর্ম্মদেবী কহিলেন,—"কেন, তোমরা এতগুলি বীর জীবিত থাকিতে মিবার রক্ষার উপায় হইবে না?"

তাঁহারা কহিলেন,—"মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা মরিতে প্রস্তুত। আমরা মরিব, কিন্তু মিবার ত রক্ষা পাইবে না মা!"

কর্ম্মদেবী কহিলেন,—"তোমরা সকলে যদি মৃত্যুপণ করিয়া

যুদ্ধ কর, পাঠানের সাধ্য কি যে, মিবার অধিকার করিতে পারে ?"

সর্দ্দারগণ কহিলেন,—"মা, শুধু মৃত্যুপণে দেশের গৌরব রক্ষা হইতে পারে, দেশরক্ষা হইবে না। দুর্দ্দান্ত পাঠান সমস্ত উত্তরভারতবর্ষ জয় করিয়া মিবারের দিকে আসিতেছে। আমাদের সাধ্য কি মা, যে, প্রাণ দিয়াও মিবার রাখিতে পারি। আজ যদি সমরসিংহ থাকিতেন, সাহসে ও বলে আমরা বুক বাঁধিতে পারিতাম। তাঁর নেতৃত্ব যদি আজ পাইতাম, মিবার রক্ষা করিতে পারিব এ ভরসা আমাদের মনে হইত।"

কর্ম্মদেবী উত্তর করিলেন,—"সমরসিংহ আজ নাই সত্য, কিন্তু তাঁ'র সহধর্ম্মিণী আমি তো রহিয়াছি। আজ তাঁ'র নেতৃত্ব তোমরা হারাইয়াছ সত্য, কিন্তু আমার নেতৃত্বে তো বঞ্চিত হও নাই। আমি নিজে এই যুদ্ধে তোমাদিগকে পরিচালনা করিব।"

বিস্মিত সর্দ্দারগণ নীরবে রহিলেন। কর্ম্মদেবী আবার কহিলেন,—"সর্দ্দারগণ, আমি রমণী বলিয়া কি আমার কথায় তোমাদের ভরসা হইতেছে না ? রমণী হইলেও আমি রাজপুত-রমণী,—বীরেন্দ্র, যোগীন্দ্র, সমরসিংহের সহধর্ম্মিণী। তাঁ'র সহধর্ম্মিণী বলিয়াই তাঁ'রই মত শক্তিতে এতদিন রাজধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছি। তাঁ'র সহধর্ম্মিণী আমি যে হাতে তাঁ'র রাজদণ্ড ধরিয়াছি, সেই হাতে তাঁর রাজ-অসি ধরিয়া মিবারের শত্রু নাশ করিব। যোগীশ্বর মহাতেজস্বী মহাপুরুষ রুদ্রের সহধর্ম্মিণী সিংহবাহিনী দুর্গা যেমন দানব সমরে দানবদলন করিয়া

স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, যোগীন্দ্র বীর সমরসিংহের সহধর্ম্মিণী—আমিও তেমনি আজ পাঠান দলন করিয়া মিবার স্বর্গ রক্ষা করিব। নির্ভয়ে তোমরা আজ এই সমরে আমার সঙ্গী হও। মিবাররক্ষা না-ও যদি হয়, রণরঙ্গিণী রাণীর সঙ্গে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া মিবারের গৌরব রক্ষা কর। পরাধীনতায় জীবনরক্ষা করা অপেক্ষা তা'ও লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ।"

সর্দ্দারগণের নিস্তেজ নিরাশ হৃদয়ে আশার উষ্ণ প্রবাহ ছুটিল। উল্লাসে সকলে কর্ম্মদেবীর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মচারিণী বিধবা, বীরবেশে সজ্জিত হইয়া মিবারের বীরগণ সহ কুতবউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

শক্তিসেবক রাজপুতবীরগণ শক্তিরূপা রণরঙ্গিণী কর্ম্মদেবীর অধীনে অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে বিক্রম মুশলমানেরা সহ্য করিতে পারিলেন না। বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী-পরিচালিত সৈন্যের সম্মুখে কুতবউদ্দিন পরাস্ত হইলেন। ভারতবিজয়ী পাঠানবীর এইরূপে ভারতললনার হস্তে পরাজিত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যোগীন্দ্র নাই, কিন্তু যোগীন্দ্রানী স্বরূপা কর্ম্মদেবীর পরাক্রমে আজ মিবার অজেয় রহিল।

পদ্মিনী।

(১)

পূর্ব্ব আখ্যায়িকায় আমরা মিবাররাজ্ঞী কর্ম্মদেবীর অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী বিবৃত করিয়াছি। বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী কতিপয় আখ্যানে ক্রমে যে সব বীর ও বীরনারীর কীর্ত্তিকাহিনী আলোচিত হইবে, তাহাতে পাঠিকাবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কেন মিবার ভারতীয় বীরধর্ম্মের প্রধান তীর্থ বলিয়া পূজিত হইতে পারে।

সমরসিংহ ও কর্ম্মদেবীর আবির্ভাবের একশত বৎসরের কিছু অধিককাল পরে, লক্ষ্মণ সিংহ চিতোরের রাণা। লক্ষ্মণসিংহ যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তখন তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহ তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্যশাসন করিতেন। সিংহল রাজকন্যা পদ্মিনী এই ভীমসিংহের স্ত্রী। এইস্থানে, হীন বাঙ্গালী আমরাও, চিরগৌরবিনী পদ্মিনীর নামে কিছু গৌরব বোধ করিতে পারি। এক হিসাবে পদ্মিনীকে আমরা বাঙ্গালী কন্যা বলিয়াও ধরিতে পারি, পদ্মিনীর জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, বঙ্গরাজ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ কয়েক শত অনুচরসহ সিংহল দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেই অবধি বিজয়-সিংহের বংশধরগণই সিংহলে রাজত্ব করিতেন। পদ্মিনী, এই রাজবংশীয় কন্যা।

পরম রূপবতী বলিয়া পদ্মিনীর খ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান সম্রাট্ আলা-উদ্দিন খিলিজী, দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন। পদ্মিনীর দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আলা-উদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাজকুল-লক্ষ্মীর সম্মান রক্ষার জন্য রাজপুত বীরগণ অদম্য বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আলাউদ্দিন দিল্লীর সম্রাট্, তাঁহার সৈন্যবল ও অর্থবল অপরিমিত। কিন্তু মিবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও মিবারবাসী রাজপুত যোদ্ধারা অলৌকিক বীরত্ব ও তেজস্বিতার প্রভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত আলাউদ্দিনের বিপুল সেনার গতিরোধ করিয়া রাখিলেন।

ক্রমে উভয়পক্ষই যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আলাউদ্দিন ভীমসিংহকে জানাইলেন,—"আমি পদ্মিনীকে চাই না। শুনিয়াছি তিনি অদ্বিতীয় সুন্দরী। একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিবার বাসনা। তাঁহার মূর্ত্তি একবার দেখিতে পাইলেই, আমি সৈন্য লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যাইব।"

সংবাদ পাইয়া ভীমসিংহ ও চিতোরের প্রধান ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইলেন। আলাউদ্দিনের পাপ-লোলুপ দৃষ্টির সমক্ষে রাজকুললক্ষ্মীর পবিত্র নির্ম্মল সৌন্দর্য্য কি করিয়া ধরিবেন? এ হীনতা স্বীকার করিতে কাহারো মন সরিল না। তখন পদ্মিনী নিজে ভীমসিংহকে কহিলেন,—"আমার এ ছার রূপই চিতোরের কাল হইল। এর জন্য আর চিতোরের এই বীর

শোণিতপাত দেখিতে পারি না। একবার আমার রূপমাত্র দেখিলেই যদি আলাউদ্দিন নিরস্ত হয়, চিতোরের বীরকুল রক্ষা পায়, তাহাতে এমনি কি ক্ষতি? আমি কে, যে, আমার এই টুকু মাত্র অসম্মানের ভয়ে চিতোর বীরশূন্য হইবে? আমি একেবারে আলাউদ্দিনের সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না। মুকুরে আমার ছবি দেখিয়া যদি তার আকাঙ্ক্ষা মিটে, তবে তাহাতে প্রস্তুত আছি। তাহাকে সংবাদ দাও, যদি এ প্রস্তাবে সে সম্মত হয়, তবে রাজপুরীতে তাহাকে একদিন আনাইবার ব্যবস্থা কর।"

অনেক চিন্তা করিয়া পদ্মিনীর কথায় ভীমসিংহ সম্মত হইলেন। আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ গেল। আলাউদ্দিন ইহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আলাউদ্দিন চিতোররাজ-পুরীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। মহাপ্রাণ বীর রাজপুত, একবার কথা দিয়া প্রাণান্তেও তাহার ব্যতিক্রম করে না; শত্রুকে বন্ধু, অতিথিরূপে নিজ গৃহে গ্রহণ করিবে, একবার এই অঙ্গীকার করিলে, তাহা কখনো ভঙ্গ করে না। আলাউদ্দিন ইহা জানিতেন। তাই ভীমসিংহের নিমন্ত্রণে নির্ভয়ে কতিপয় মাত্র অনুচর লইয়াই তিনি শত্রুগৃহে প্রবেশ করিলেন।

মুকুরে আলাউদ্দিন পদ্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেন। কল্পনায় তিনি পদ্মিনীর যত চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন, দেখিলেন, সাক্ষাৎ এই রূপরাশির কাছে সে সব কিছুই নয়। সব যেন এই রূপের প্রভায় ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল। দেখিয়া তাঁর পাপ

আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাক, শতগুণে বাড়িল। কিন্তু পদ্মিনীকে পাইবার উপায় কি? মনে মনে এক ভীষণ দুরভিসন্ধি করিয়া, যাইবার সময় তিনি এই সহৃদয়তার প্রতিদান স্বরূপ ভীমসিংহকে নিজ শিবিরে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সরলহৃদয় ভীমসিংহ আপত্তি না করিয়া আলা-উদ্দিনের শিবিরে গমন করিলেন। আলাউদ্দিন তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঘোষণা করিলেন, পদ্মিনীকে না পাইলে তিনি ভীম-সিংহকে মুক্তি দিবেন না।

(২)

পদ্মিনী যথাসময়ে এ সংবাদ শুনিলেন। চিতোরের রাজ-কুলবধূর সম্মান রক্ষার জন্য চিতোরবাসী প্রাণপণ করিবে তাহা তিনি জানিতেন। চিতোরবাসীর প্রাণপণ চেষ্টা বিফল হই-লেও, চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াও তিনি তাহার নারীধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবেন। সুতরাং এজন্য তাঁহার কোন ভয় নাই। কিন্তু ভীমসিংহকে রক্ষা করার উপায় কি? ধর্ম্মরক্ষার জন্য, দেশরক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রে শত্রুর অসিতে দেহদান ক্ষত্রিয়বীরের শ্রেষ্ঠ গতি। স্বামীর কুলধর্ম্মোচিত এমন গতিলাভে পদ্মিনী কখনো কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। কিন্তু মহাবীর স্বামী যে, বিশ্বাসহন্তা আততায়ীর হস্তে হীনভাবে নিহত হইবেন, এ চিন্তা পদ্মিনীর অসহ্য হইল। সামান্য রমণীর ন্যায়, বিপদে অস্থির না হইয়া ধীরচিত্তে তিনি স্বামীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মনে মনে এক গূঢ় অভিসন্ধি স্থির করিয়া তিনি কতিপয় বিজ্ঞ ও বিশস্ত মন্ত্রী, ও সেনাপতিকে ডাকিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আলাউদ্দিনের শিবিরে এই সংবাদ পাঠাইলেন,—"স্বামীকে উদ্ধারের জন্য দিল্লীর সম্রাট্‌কে আত্মসমর্পণ করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সম্রাট্‌ আমার নিম্নলিখিত কথাগুলি পালন করিবেন। আমি রাজকন্যা ও রাজমহিষী, আমার অনেক সহচরী আছে। তাহাদের মধ্যে সাত শত সহচরী শিবিকায় আমার সঙ্গে পাঠান-শিবিরে যাইবে। কেহ কেহ আমার সঙ্গে থাকিবে, কেহ ফিরিয়া আসিবে। তাহারা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয়া রাজপুত মহিলা; তাহাদের সম্মান রক্ষার্থ পাঠান সেনাকে দূরে থাকিতে হইবে। আর, শিবিরে উপস্থিত হইয়া দিল্লীর সম্রাট্‌কে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে অতি অল্পকালের জন্য স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শেষ বিদায় নিতে চাই। কারাগারের নিকটেও যেন পাঠান সৈন্য অথবা বেসি প্রহরী না থাকে।"

সংবাদ পাইয়া আলাউদ্দিন আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন। পত্রের মধ্যে কোনরূপ চাতুরী বা অন্য অভিসন্ধি থাকিতে পারে, এরূপ বিচার করিবার শক্তি বা অবসর তাঁর হইল না। আনন্দে উন্মত্ত মুগ্ধ সম্রাট্‌ পদ্মিনীর কথা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। পদ্মিনী দিন ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আলাউদ্দিনকে সংবাদ পাঠাইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাত শত শিবিকা ক্রমে পাঠানশিবিরে ভীম-

সিংহের কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাঠান সৈন্য ও প্রহরীরা সব দূরে রহিয়াছে। পদ্মিনী অলক্ষ্যে ভীমসিংহকে নিজ শিবিকায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। রক্ষক স্বরূপ অনেকগুলি শিবিকা তাঁহাদের সঙ্গে গেল। বাকী সব শিবিরে রহিল। আলাউদ্দিন মনে করিলেন, পদ্মিনীর সহচরীদের মধ্যে যাহাদের ফিরিয়া যাইবার কথা, তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে। পদ্মিনী এখনই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে আসিবেন।

অনেকক্ষণ চলিয়া গেল। পদ্মিনী আসেন না। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন,—তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ সাক্ষাতের প্রয়োজন কি? আলাউদ্দিনের মন চঞ্চল হইল, ক্রমে সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। সৈন্যগণসহ তিনি ভীমসিংহের কারাগৃহের সম্মুখে আসিয়া শিবিকার দ্বার খুলিতে আদেশ করিলেন। সহসা ভীষণ হুঙ্কারে সেই শিবিকার মধ্য হইতে সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধৃগণ বহির্গত হইতে লাগিলেন। বাহকগণ ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া অস্ত্র ধরিল। পাঠানে ও রাজপুতে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পদ্মিনী, সহচরী বলিয়া এইরূপ সাত শত রাজপুত বীরকে শিবিকায়, এবং প্রতি শিবিকায়, ছয় ছয় জন রাজপুত যোদ্ধাকে বাহক করিয়া প্রায় ৫ হাজার ছদ্মবেশী রাজপুত লইয়া স্বামীর উদ্ধারের কৌশল করিয়া, শত্রুর শিবিরে গিয়াছিলেন।

দুই স্থানে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদল পাঠান সেনা দ্রুত গমনে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর অনুগামী অন্যান্য রাজপুতগণকে

আক্রমণ করিল। উভয়স্থলেই বহু রাজপুত ও পাঠানের শোণিতে রণক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। কিন্তু ভীমসিংহ ও পদ্মিনী নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

গোরা নামক পদ্মিনীর পিতৃবংশীয় এক মহাবীর এই সময় চিতোরের একজন সেনানায়ক ছিলেন। গোরা এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল এই যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। গোরা এক নিজের অসিতে বহুসংখ্যক পাঠান সেনা বধ করিয়া বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। বালকবীর বাদল অশ্বারোহণে পাঠান সেনার ব্যূহভেদ করিয়া চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিলেন। গোরার পত্নী গোরার যোগ্য সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বাদল গৃহে ফিরিবামাত্র তিনি তাঁহাকে কহিলেন,— "বাদল, তোমার পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদ আমি পাইয়াছি। আমি অনুমৃতা হইব সংকল্প করিয়াছি। কেবল তোমার মুখে একবার তাঁর শেষ বীরত্বের কাহিনী শুনিব বলিয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছি। বল বাদল, তাঁর বীরত্বের কথা সব আমাকে বল। জীবনে শেষ সাধ আমার পূর্ণ হউক। স্বামীর বীরত্ব লীলার কাহিনী শুনিতে শুনিতে, হাসিতে হাসিতে, গৌরবে আমি স্বামীর কাছে চলিয়া যাই।"

বাদল এই শেষ যুদ্ধে গোরার অতুল বিক্রম ও সাহসের কথা সব বলিলেন। গোরার পত্নী হাসিমুখে চিতানলে প্রবেশ করিলেন। এদিকে চিতোর অধিকার করিয়া পদ্মিনীকে লাভ করা অসাধ্য বুঝিয়া আলাউদ্দিন দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।

(৩)

অনেক বৎসর চলিয়া গেল। পদ্মিনীর চাতুরীতে তিনি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন সে কথা আলাউদ্দিন ভুলিতে পারিলেন না। পদ্মিনী, ভীমসিংহ এবং চিতোরের রাজপুতগণের বিরুদ্ধে তিনি মনে প্রবল প্রতিহিংসা পোষণ করিতে লাগিলেন। পরে অবসর মত বহুসৈন্য লইয়া তিনি আবার চিতোর আক্রমণ করিলেন।

চিতোরবাসী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবারও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতসম্রাটের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মিবার কত দিন এইরূপ যুঝিতে পারিবে? মিবারবাসীরা বুঝিলেন, অধিক দিন আর পাঠানের গতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রাণ থাকিতে অন্যের অধীনতা স্বীকার রাজপুতের পক্ষে অসম্ভব। তাই রাজপুত বীরগণ জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একদিন রাণা লক্ষ্মণসিংহ গভীর রাত্রিতে চিতোরের এই অন্তিমদশা সম্বন্ধে একা চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় গম্ভীর-স্বরে "মৈঁ ভুখা হুঁ", এই শব্দ শ্রুত হইল। রাণা চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা দেবী, ভীম মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। রাণা দেবীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"মা, বহুবৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র রাজপুত বীর

রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইঁহাদের এত শোণিতেও কি তোমার তৃপ্তি হইল না মা ?”

দেবী কহিলেন,—“না, আমি রাজ-শোণিত চাই। তোমার দ্বাদশ পুত্র একে একে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া তা'দের উত্তপ্ত শোণিতে আমার তর্পণ করিবে। নহিলে আমার তৃপ্তি হইবে না। চিতোরও রক্ষা পাইবে না।”

দেবীর অন্তর্ধান হইল। পরদিন রাজপুত্র, মন্ত্রী ও সর্দ্দার-গণকে লক্ষ্মণসিংহ এই অলৌকিক ঘটনার কথা জানাইলেন, আবার দেবীর আবির্ভাব ও আদেশের প্রতীক্ষায় সকলে ভক্তি-পূর্ণচিত্তে দেবীর ধ্যানে লক্ষ্মণসিংহের গৃহে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

দেবী আবার আবির্ভূত হইয়া তাঁহার আদেশ সকলকে জানাইলেন। দেশ রক্ষার জন্য দেশের অধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজা দেবী স্বয়ং তাঁহাদের শোণিত চাহিতেছেন, রাজপুতবীর—বিশেষ চিতোরের রাণাবংশীয় রাজপুত্র ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কিছু মনে করিতে পারেন না। আনন্দে ও উৎসাহে রাজপুত্রগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একে একে এগার জন রাজপুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

রাণার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একমাত্র অজয়সিংহ জীবিত। অজয়সিংহের মৃত্যুতে রাণাবংশ নির্ম্মূল হইবে। তাই লক্ষ্মণ-

সিংহ অজয়কে অন্যত্র পাঠাইয়া নিজে তাহার স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে চিতোর প্রায় বীরশূন্য হইয়াছে। এই শেষ যুদ্ধের পর চিতোররমণীর সম্মান রক্ষার জন্য আর কেহ থাকিবে না। দেবীর আদেশে রাজপুত্রগণের প্রাণ বিসর্জ্জনের ফল কবে ফলিবে, দেবীই জানেন; কিন্তু চিতোর যে, পাঠানের অধিকৃত হইবে, এ কথা সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

তখন পদ্মিনী, চিতোরবাসিনী রমণীগণকে সমবেত করিয়া কহিলেন,—"আমাদের স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতারা, অনেকেই বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। বাকী যাঁহারা আছেন তাঁহারাও আজ সেই চিরগৌরবময় শয্যায় শয়ন করিবেন। আমাদের সম্মান রক্ষার ভার আজ আমাদের হাতে। রাজপুতললনা মরিতে ভয় পায় না। অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন রাজপুতবালার অবশ্যম্ভাবী নিয়তি, ধর্ম্মরক্ষার একমাত্র উপায়। রাজপুতবীরগণ প্রশান্তচিত্তে রণক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন করিতেছেন, এস ভগিনীগণ, রাজপুত-বীরের যোগ্য বীরাঙ্গনা আমরাও আজ অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের অনুগামিনী হই। পাঠান দেখুক, তাহাদের পাশব শক্তির উপর আমাদের ধর্ম্মবল কত উচ্চে। জগৎ দেখুক রাজপুত বীরাঙ্গনা ধর্ম্মবলে কেমন করিয়া পাশব শক্তির উপরে আপনার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।"

সমুদায় রাজপুতললনা একবাক্যে পদ্মিনীর কথার অনুমোদন করিলেন। রাজপুরীর মধ্যে একটা গভীর ও বিশাল কূপ

ছিল। তাহার মধ্যে ভীষণ চিতা প্রজ্বালিত হইল। গগন-স্পর্শিনী লক্‌লক শিখা,—সর্ব্বাগ্রে পদ্মিনী! পদ্মিনীর সঙ্গে শত শত জ্যোতির্ম্ময়ী রূপবতী, হাসিমুখে সেই প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন।

চিতার ধূমে চিতোর আচ্ছন্ন হইল। সেই ধূমরাশি ভেদ করিয়া, লক্ষ্মণসিংহ ও ভীমসিংহ অবশিষ্ট রাজপুতবীরগণ সহ ভীম বেগে পাঠান সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। পাঠান-সৈন্য ধ্বংস করিতে করিতে তাহাদের শোণিত-সিক্ত পবিত্র রণভূমিতে বীরগণ একে একে দেহপাত করিলেন।

যুদ্ধে আলাউদ্দিন জয়ী হইলেন; কিন্তু যুদ্ধশেষে, বীর-শোণিতরঞ্জিত পথে, আলাউদ্দিন, বীরাঙ্গনার চিতার ধূমে আবৃত শূন্য চিতোরে প্রবেশ করিলেন।

হামির-মাতা ও হামির-পত্নী।

(১)

চিতোর ধ্বংসের কিছু পূর্ব্বে রাণা লক্ষ্মণসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরিসিংহ, মৃগয়া করিবার জন্য আন্দাবা নামক এক বনপ্রদেশে গমন করেন। অরিসিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ একটি শূকরকে লক্ষ্য করিয়া সশস্ত্র তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। শূকরটি এক জনার * ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল।

বন্য পশু ও পক্ষীরা আসিয়া শস্য নষ্ট না করে, এইজন্য কৃষকেরা ক্ষেত্রের মধ্যে একটা মাচা করিয়া তাহার উপর থাকিয়া ক্ষেত্রে পাহারা দিত। ঐ ক্ষেত্রের স্বামী কৃষকের এক যুবতী কন্যা তখন মাচার উপর থাকিয়া ক্ষেত্রে পাহারা দিতেছিল। শূকর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, রাজপুত্র ও তাঁহার অনুচরগণও যদি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শূকর তাড়না করিতে থাকে, তবে শস্য একেবারে নষ্ট হইবে। কৃষকবালা মাচার উপর হইতে নামিয়া অরিসিংহকে কহিল,—"রাজকুমার, আপনারা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করিবেন না। আমি শূকর মারিয়া দিতেছি।" সকলে বিস্মিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন। কৃষককন্যা একটা জনার গাছ কাটিয়া তার আগাটা সরু করিয়া

(* জনার রাজপুতানার একরূপ শস্য। গাছগুলি বেশ শক্ত এবং ছয় সাত হাত লম্বা হইয়া থাকে)।

লইল। পরে ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ জনারের ভল্ল দিয়া শূকরটাকে বিঁধিয়া অবিলম্বে রাজপুত্রের নিকট লইয়া আসিল। কৃষককুমারীর পুরুষাধিক শক্তি ও বিক্রমে সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

শিবিরে ফিরিয়া রাজপুত্র ও তাঁহার অনুচরগণ নদীর তীরে স্নানাহ্নিক করিতেছেন, এমন সময় প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথর আসিয়া অরিসিংহের ঘোড়ার পায়ের উপর পড়িল। ঘোড়াটি তখনই মাটিতে পড়িয়া গেল। সকলে চাহিয়া দেখিলেন সেই কৃষক-বালা মাচাব উপর হইতে পাথর ছুড়িয়া পশুপক্ষী তাড়াইতেছে, তাহারই একটা পাথর এতদূরে আসিয়া ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়াছে। কৃষকবালার দৈহিক শক্তির দ্বিতীয় পরিচয় পাইয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কুমারীও রাজপুত্রের ঘোড়ার দুর্গতি দেখিয়া লজ্জিত ও ভীত হইয়া নিকটে আসিয়া কহিলেন,—"রাজকুমার, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অসাবধানে আপনার ঘোড়াটির এই দুর্গতি করিয়াছি। আমি স্ত্রীলোক; আপনার প্রজা। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

অরিসিংহ, হাসিয়া কহিলেন,—"ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার শক্তি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। আমরাও তোমার কাছে দাঁড়াইতে পারি না। তোমার মত এমন রমণী যদি আরও এদেশে থাকে, প্রত্যেকের হাতের ঢিলে আমার দশটি করিয়া ঘোড়ার পা ভাঙ্গিলেও তাহাতে দুঃখ নাই! আমার এই

মাত্র দুঃখ, যে, সঙ্গে এমন কিছু নাই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার করিতে পারি।”

কৃষককুমারী কহিল,—“রাজপুত্র, আপনার অনুগ্রহ ও ক্ষমাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আর কোন পুরস্কার আমি চাই না। দীন প্রজাকে স্মরণ রাখিবেন এই প্রার্থনা।” রাজপুত্রকে প্রণাম করিয়া কৃষকবালা নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল।

অরিসিংহ সঙ্গিগণ সহ রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। পথে আবার তাঁহাদের সঙ্গে সেই কৃষকবালার সাক্ষাৎ হইল। মাথায় বড় একটা দুধের কলসী এবং দুই হাতে দড়ি দিয়া বাঁধা দুইটা মহিষ চালাইয়া সে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে। রাজপুত্রের একজন অনুচরের মনে হইল, মেয়েটা আমাদিগকে এত লজ্জা দিয়াছে, এখন সুযোগ মত ইহাকে একটু জব্দ করা যাক্। ভাবিয়া, তিনি এমন ভাবে ঘোড়া চালাইলেন, যাহাতে ঘোড়াটা কৃষককন্যার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে এবং ধাক্কায় তার মাথা হইতে দুধের কলসী পড়িয়া যায়। কন্যাও অনুচরের এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া একটু মুচ্‌কী হাসিয়া তাহার হাতের মহিষের দড়ি এমন ভাবে ঘোড়ার পায়ে জড়াইয়া দিল, যে, কৌতুকপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি অনুচর ঘোড়া লইয়া একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজপুত্রের অনুচর কৌতুক করিতে গিয়া নিজেই সকলের কৌতুকের পাত্র হইলেন! অনুচর ভাঙ্গাপায়ে কষ্টে কৃষকবালার নিকটে আসিয়া

কহিল—"ঠাকুরুণ! তুমি কম পাত্র নও। তুমি আমাদের শিকারী রাজপুত্রের রাণী হও। আর কিছুতে তোমাকে মানাইবে না। ইঁহার সঙ্গে ঘোড়া চড়িয়া শীকার করিও আর লড়াই করিও।"

কৃষকবালা সলজ্জ ভাবে প্রস্থান করিল। অরিসিংহের বাস্তবিকই এই কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইতেছিল। বীরই বীর্য্যবতীর মর্য্যাদা বোঝেন। কোন্ বীর এমন বীর্য্যবতীর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারেন?

তিনি কহিলেন,—"এই যুবতী যদি ক্ষত্রিয়কন্যা হয়, তবে আমি ইহাকে বিবাহ করিব।"

রাজপুত্রের রাজধানী যাওয়া স্থগিত হইল। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন, যুবতী কোন ক্ষত্রিয় কৃষকের কন্যা।

বৃদ্ধ কৃষককে ডাকিয়া রাজপুত্র তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বৃদ্ধ কি বুঝিয়া কি ভাবিল, জানি না। সে এ প্রস্তাবে অসম্মত হইল। রাজপুত্র নিরাশ ও ব্যথিত হৃদয়ে চিতোরে ফিরিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ ঘরে ফিরিয়া তার স্ত্রীর নিকট সকল কথা বলিল। বুড়ী, বুড়ার মত আহাম্মক নয়। এমন রাজজামাতা হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিল ইহাতে বুড়ী স্বামীকে অনেক তাড়না করিয়া কহিল,—"এখনি মেয়ে লইয়া চিতোরে যাও। রাজপুত্রকে অনুনয় করিয়া মেয়ে তাঁহার কাছে বিবাহ দিয়া আইস।"

বৃদ্ধও আপনার ভুল বুঝিল, আর দ্বিধা না করিয়া কন্যা লইয়া চিতোরে গেল। অরিসিংহ এমন বীর্য্যবতী পত্নী পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। এই কৃষকবালার গর্ভে অরি-সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হামিরের জন্ম হয়। যখন আলাউদ্দিনের হস্তে চিতোর ধ্বংস হয়, তখন হামিরের বয়স মাত্র বারবৎসর; তখন তিনি মাতার সঙ্গে মাতামহের গৃহে ছিলেন।

(২)

এমন বীর্য্যবতী মাতার পুত্র হামির কখনো হীনবীর্য্য হইতে পারেন না। হামিরই কালে চিতোর উদ্ধার করিয়া আবার চিতোরের রাণাবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যে পার্ব্বত্য প্রদেশে হামিরের মাতামহের গৃহ ছিল, তাহার নাম কৈলবারা। রাজপুতানার রাজাদের অধীনস্থ ভূস্বামীদিগকে সর্দ্দার বলিত। রাজপুতানার পার্ব্বত্য প্রদেশে ভীল নামে কৃষ্ণবর্ণ একরূপ অনার্য্যজাতি বাস করিত। ভীলেরা বিশেষ সাহসী ও রণ-কৌশলী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ভীল সর্দ্দারেরা চিরদিন রাজ-পুত রাজাদের নিতান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজা ছিলেন। যুদ্ধে ও বিপদে চিরদিন রাজপুত রাজারা তাঁহাদের সহায়তা পাইতেন। এই কৈলবারা প্রদেশে অনেক ভীল সর্দ্দারের বাস ছিল। রাণার বংশধর বলিয়া এই সব ভীলসর্দ্দারেরা হামিরের বিশেষ অনুগত হইয়া উঠিল।

পাঠিকাবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, আলাউদ্দিনের সঙ্গে

শেষ যুদ্ধের সময় রাণা লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার এক মাত্র শেষ পুত্র অজয়সিংহকে অন্যত্র পাঠাইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে নিজে সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আদেশ পালন করেন। এই অজয়সিংহও কৈলবারা প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কতিপয় পার্ব্বত্য রাজপুতসর্দ্দারের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ হয়। এই বিবাদে তাঁহার পুত্রদ্বয় আজিমসিংহ ও সুজনসিংহ তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন না। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হামির তাঁহার শত্রু দমন করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। তাঁহার প্রধান শত্রু মুঞ্জ নামক সর্দ্দারের ছিন্নমস্তক হামির যখন তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন, তখন অজয়সিংহ সেই ছিন্নমস্তকের শোণিত লইয়া হামিরের কপালে রাজটীকা দিয়া হামিরকেই রাণাবংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

চিতোর ও মিবারের সমতল ভূমি আলাউদ্দিনের অধিকারে। আলাউদ্দিনের অধীনে মালদেব নামক এক রাজপুত মিবার শাসন করিতেন। কিন্তু হামির রাণা উপাধি গ্রহণ করিয়া কৈলবারা ও তাহার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে ভীল সর্দ্দার-গণের সাহায্যে আপনার অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতারং মালদেব ও হামিরের মধ্যে বিলক্ষণ শত্রুতার ভাব জন্মিল।

রাজপুতদের মধ্যে এক নিয়ম ছিল যে, কাহারও সঙ্গে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইলে কন্যাকর্ত্তা একটি নারিকেল তাহার নিকট পাঠাইতেন, বরপক্ষ সেই নারিকেল

গ্রহণ করিলেই সেই বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইত। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ বিষম শত্রুতা সত্ত্বেও মালদেব কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া হামিরের নিকট নারিকেল পাঠাইলেন। প্রধান অনুচরবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও হামির নারিকেল গ্রহণ করিলেন। তিনি কহিলেন,—"রাণা-বংশধরের বিপদ চিরসঙ্গী। সে জন্য ভয় পাই না। একমুহূর্ত্তের জন্য হইলেও পিতৃপুরুষের রাজপুরীতে গিয়া কৃতার্থ হইব।"

বিবাহের দিন স্থির হইল। হামির পাঁচশত অশ্বারোহী অনুচর মাত্র লইয়া চিতোরে গেলেন। কিন্তু বিবাহের কোন সমারোহ না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। মাত্র মালদেব ও তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মাত্র তাঁহাদেরই সমক্ষে বিবাহ হইয়া গেল।

রাত্রিতে পিতৃগৃহে বাসর শয্যায় হামির উপবিষ্ট। নববধূ আসিয়া হামিরকে প্রণাম করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। হামির তাঁহাকে নিকটে আসিতে আহ্বান করিলে, বধূ, নত মুখে কহিলেন,—"মহারাণা, দাসীকে মার্জ্জনা করিবেন। স্ত্রীরূপে আপনার শয্যাভাগিনী হইবার যোগ্য আমি নই।"

হামির কহিলেন,—"মালদেব দেশের শত্রু পাঠানের অধীন হইলেও, স্ব-ইচ্ছায় তোমাকে আজ বিবাহ করিয়াছি। স্ত্রী যে কুলেই জন্মুক, যা'র কন্যাই হউক, সর্ব্বথা স্বামীর আদরের ও সম্মানের পাত্রী। কেন তবে এমন কথা বলিতেছ?"

মালদেব-কন্যা কহিলেন,—"মহারাণা, পিতার হীনতায়

আমি চিরদিনই লজ্জিত ও দুঃখিত। পিতা পাঠানের অধীন হইলেও, দেশের শত্রু বলিয়া পাঠান আমার ঘৃণার পাত্র। মিবারের গৌরব রাণা-বংশধরেরা মিবার-বাসিনী আমার চির-পূজ্য। আপনাকেও দেবতা জ্ঞানে নিজের হৃদয়ে পূজা করিয়া আসিতেছি। সুতরাং আপনি পায়ে স্থান দিলে মালদেবের কন্যা বলিয়া আপনার পদ-সেবার অযোগ্য আমি নই। কিন্তু অন্য এমন কারণ আছে, যাহাতে মহারাণার মহিষী পদের গৌরবের অধিকারিণী আমি কি-না, বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাণা বিচার করিয়া আমার সংশয় দূর করুন।”

হামির বলিলেন,—“কি সে কারণ, না বলিলে কিরূপে বিচার করিব?”

মালদেব-কন্যা কহিলেন,—“মহারাণা, আমি বিধবা। অতি শৈশবে ভট্টিবংশীয় কোন সেনানায়কের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই সেই স্বামীর মৃত্যু হয়। বিবাহের কথা, কি, স্বামীর কথা কিছুই আমার স্মরণ নাই। আমার পিতা শত্রুতা বশতঃ আপনার অপমান করিবার জন্যই আপনার সঙ্গে বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। বিধবার সংশ্রবে রাণাবংশ কলঙ্কিত হইবে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বিবাহের পূর্ব্বে এ কথা পাছে প্রচার হয়, তাই আত্মীয় স্বজন কাহাকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ করেন নাই; তাই চিতোরেশ্বর হইয়াও কন্যার বিবাহে কোন সমারোহ করেন নাই।”

হামির স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রোধে ও অভি-

মানে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। মালদেব যদি আততায়ীর ন্যায় রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ করিয়া গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিত, তাহা হইলেও এত ক্ষোভ তাঁহার হইত না।

কিন্তু তাঁহার পরিণীতা মালদেব-কন্যা সম্মুখে দণ্ডায়মানা। মালদেব-কন্যা পরমা সুন্দরী। অতুলনীয় সরলতা, মহাপ্রাণতা ও আত্মত্যাগের মহিমা সে সৌন্দর্য্যে যেন স্বর্গের উজ্জ্বলতা ঢালিয়া দিয়াছে। রমণীসুলভ কোমলতায় চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা মিলিয়া সে মুখে অপূর্ব্ব শ্রীবিকাশ করিয়াছে। হামির চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার প্রাণ মুগ্ধ হইল। রোষ ও অভিমানের আবেগ, ধীরে দমিয়া আসিল। মালদেব-কন্যা আবার কহিলেন,—"মহারাণা, আমাকে আপরাধিনী মনে করিবেন না। বিবাহের মন্ত্র মাত্র উচ্চারিত হইয়াছে; এখনো এই হীন দেহের স্পর্শে আপনার চরণ কলঙ্কিত হয় নাই। সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলাম। এই মুহূর্ত্তেই আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনার মহৎ বংশ আপনি নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন। পূর্ব্বের বিবাহ বা স্বামীর স্মৃতি-মাত্র আমার প্রাণ স্পর্শ করে নাই। কুমারীর ন্যায় চিত্ত আমার নির্ম্মল।"

মালদেব-কন্যা আবার বলিলেন,—"আমার নিজের পক্ষে স্বামী বলিয়া আপনাকে পূজা করিতে আমি অধিকারিণী, তাই এই বিবাহের বাদিনী আমি হই নাই। মনে করিয়াছিলাম, সমস্ত ঘটনা আপনাকে বলিব, যদি ঐ অবস্থায় আপনার

পদসেবার যোগ্য বলিয়া আপনি পায়ে স্থান দেন, আপনার পদসেবায় জীবন ধন্য করিব। যদি না দেন, স্বামী বলিয়া অন্ততঃ প্রাণে আপনাকে পূজা করিবার অধিকারিণী হইব। তাহাও এ অভাগীর পক্ষে যথেষ্ট সুখ—যথেষ্ট গৌরব।"

হামির একেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। পত্নীকে বক্ষে ধরিয়া কহিলেন,—"তোমার মত সরলা, মহাপ্রাণা নারীই চিতোরের রাণার মহিষী হইবার যোগ্য। তোমার মত বধূরত্ন-লাভে রাণাবংশ ধন্য বই কলঙ্কিত হইবে না। মালদেব যে উদ্দেশ্যে যা করুক, আজ এমন রত্নদানে সে আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছে।"

স্বামীর নিকট এত ক্ষমা, এত অনুগ্রহ মালদেবকন্যা আশা করেন নাই। সহসা এই অপ্রত্যাশিত সুখের উচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া তিনি অবসন্নভাবে স্বামীর বক্ষে পড়িয়া রহিলেন। পরে, ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন,—"মহারাণা, রাণাবংশধর চিতোর হইতে তাড়িত, চিতোরের রাজপুত পাঠানের অধীন, এ চিন্তা বরাবরই আমার অসহ্য। আমার পিতা নিজে চিতোরেশ্বর, ইহাতেও কোন সান্ত্বনা আমার হয় নাই। আপনি আবার চিতোর উদ্ধার করিয়া চিতোরবাসীকে আপনদেশে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহাই আমার প্রাণের নিতান্ত বাসনা। সামান্য রমণী হইলেও আজ আমি আপনার অনুগ্রহে আপনার সহধর্ম্মিণীপদে উঠিয়াছি। পদের কর্ত্তব্য পালনে দাসীকে অনুমতি দিবেন কি?"

হামির কহিলেন,—"অবশ্য দিব। তোমার মত যোগ্য সঙ্গিনী যখন পাইয়াছি, আমি নিশ্চিত চিতোর উদ্ধার করিতে পারিব।"

মালদেব-কন্যা কহিলেন,—"জাল নামে আমার পিতার অতি চতুর ও কর্ম্মঠ এক কর্ম্মচারী আছে। রাজ্যরক্ষায় ও রাজ্যশাসনে সে-ই আমার পিতার প্রধান সহায়। আপনি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ পিতার নিকট হইতে তাহাকে চাহিয়া লইবেন। আমার স্থির বিশ্বাস, জালের সহায়তায় আপনি চিতোর উদ্ধারে সমর্থ হইবেন।"

পরদিন, পত্নীর পরামর্শ অনুসারে হামির শ্বশুরের নিকট বিবাহের যৌতুক স্বরূপ জালকে চাহিলেন। মালদেব জামাতার এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বিবাহের কয়েকদিন পর, হামির, পত্নী ও জালকে লইয়া কৈলবারা প্রদেশে গমন করিলেন।

(৩)

কিছুদিন পরে হামিরের এক পুত্র হইল। এই পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কৈলবারা ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ মালদেব যৌতুক স্বরূপ দৌহিত্রকে দান করিলেন।

চিতোরে ক্ষেত্রপাল নামে কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুত্রের কল্যাণের জন্য ক্ষেত্রপালদেবের নিকট আরাধনা করিতে

হইবে এই বলিয়া পিতার অনুমতি লইয়া, জালের সঙ্গে হামির-পত্নী চিতোরে আসিলেন। তিনি চিতোরে আসিয়াই দেখিলেন, মালদেব ও তাঁহার পুত্রগণ সসৈন্যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। চিতোরের উদ্ধারে ইহাই সুযোগ্য অবসর। জালের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হামিরপত্নী চিতোর[illegible]ী প্রধান রাজপুতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"রাজপুতবীরগণ, কত দিন আর আপনারা পাঠানের অধীনে থাকিবেন? আপনাদের সহায়তা পাইলেই রাণা চিতোর উদ্ধার করিতে পারেন। রাজপুত কখনো বিদেশীয়ের অধীনতা সহিতে পারে নাই। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষার জন্য, সহস্র সহস্র রাজপুতবীর সমরক্ষেত্রে, রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ অগ্নিতে, দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

যে পাঠানের অত্যাচারে আপনাদেরই পিতৃগণ এত শোণিত পাত করিয়াছেন, আপনাদেরই জননীগণের পবিত্র জীবন্ত দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে, আজ কোন্‌মুখে আপনারা সেই পাঠানের অধীনে হীন জীবনের বিলাস সম্ভোগে অলসভাবে কালযাপন করিতেছেন? আপনাদের দেহে কি সেই ক্ষত্রিয়শোণিত প্রবাহিত হইতেছে না? আপনাদের প্রাণে কি রাজপুতের মহত্ত্ব, রাজপুতের তেজস্বিতার কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই!—

যদি এমন নিশ্চিন্ত অলসভাবে আপনারা এই অধীনতা পাশ গলায় রাখিতে চান, তবে বীরপিতা, বীরমাতাগণের শোণিতপাতের পাপভাগী আপনাদিগকে হইতে হইবে। এই

পাপের ফলে, ইহকালে নিন্দনীয়, পরকালে নিরয়গামী আপনাদের সকলকেই হইতে হইবে। পাঠান রক্ষিত, পাঠান পরিচালিত, পাঠানের অধীন মালদেব আজ চিতোরে নাই, চিতোর উদ্ধারের আজ যোগ্য অবসর উপস্থিত। দেশের প্রতি, জাতীয় গৌরবের প্রতি, বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্য-বোধ যদি আপনাদের থাকে, পাঠানের অত্যাচারে নিহত স্বর্গগত পিতৃমাতৃগণের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা যদি আপনাদের মনে থাকে, রাজপুতোচিত দৃঢ়তায় আজ চিতোর উদ্ধারের জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন। রাণা সসৈন্যে কৈলবারায় অপেক্ষা করিতেছেন। আপনারা তাঁহার সহায়তায় প্রস্তুত,—এ সংবাদ পাইবামাত্র তিনি এখানে উপস্থিত হইবেন।"

রাজপুতকে ইহার বেসি আর কিছু বলিতে হয় না। হামিরের আগমন-মাত্র তাঁহারা তাঁহার সহায় হইবেন, সকলেই এই অঙ্গীকার করিলেন।

সংবাদ, হামিরের নিকট গেল।

অবিলম্বে হামির সসৈন্যে চিতোর অবরোধ করিলেন। চিতোরবাসী রাজপুতপ্রধানগণের সহায়তায় অবিলম্বে চিতোর হামিরের হস্তগত হইল। আবার চিতোরে চিতোর-রাণার অধিকার স্থাপিত হইল। লক্ষ্মণসিংহ ও তাঁহার একাদশপুত্রের শোণিত দানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পিপাসা-শান্তির ফল এতদিনে ফলিল।

তারাবাই।

(১)

হামির যখন চিতোরের রাণা, তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে, রাণা রায়মল্ল চিতোরে রাজত্ব করেন। রায়মল্লের, সঙ্গ (বা সংগ্রামসিংহ), পৃথ্বিরাজ ও জয়মল্ল এই এই তিন পুত্র ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কিছু উদ্ধত প্রকৃতি হইলেও, পৃথ্বিরাজ বিশেষ সাহসী ও শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে টোডাতঙ্ক নামে একটি ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্য ছিল। রাও শূরতান এই সময়ে টোডাতঙ্কের রাজা ছিলেন। লিল্লা নামে একজন দুর্দ্দান্ত পাঠান রাও শূরতানকে, পরাস্ত করিয়া টোডা অধিকার করিল। রাও শূরতান সপরিবারে মিবার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তারাবাই এই রাও শূরতানের একমাত্র কন্যা। তারাবাই বিশেষ রূপবতী ছিলেন।

এই রূপরাশির অধিকারিণী, অন্তর মধ্যে এক নিদারুণ জ্বালা পোষণ করিতেন। পিতা নির্ব্বাসিত, স্বদেশ বিধর্ম্মী পাঠানের অধীন,—বীর্য্যবতী রাজপুতবালার পক্ষে এ চিন্তা ক্রমে অসহ্য হইল। পিতার পুত্র নাই, তিনিই একমাত্র সন্তান। রমণী হইলেও সন্তানের সকল কর্ত্তব্যের জন্য তিনিই দায়ী। তারা মনে মনে সংকল্প করিলেন,—অন্য কাহারও সহায়তা না পাইলেও নিজেই যুদ্ধ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন

রাজপুত মহিলারা অনেকেই যুদ্ধ করিতেন এবং সে জন্য বাল্যাবধি ব্যায়াম ক্রীড়া, অস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। তারাবাই বিশেষ যত্ন সহকারে এই সমস্ত সামরিক বিদ্যায় বিশেষ শক্তি ও নিপুণতা লাভ করিলেন।

কিন্তু হাজার হইলেও তারাবাই রমণী; রাওশূরতান নিসঃম্বল। কোন যোগ্য রাজপুতবীরের সহায়তা ব্যতীত টোডা উদ্ধারের সম্ভবনা নাই। এদিকে রূপে ও শৌর্য্যে সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী, অসুরনাশিনী, দুর্গারূপিণী তারাবাইকে বিবাহ করিতে রাজপুত বীরমাত্রই উৎসুক হইবেন। রাওশূরতান ঘোষণা করিলেন, যে বীর টোডা উদ্ধার করিতে পারিবেন, তারাবাই তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন।

একদিন তারাবাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে কোথায় যাইতেছিলেন, এমন সময় রাণার কনিষ্ঠপুত্র জয়মল্ল তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু রাওশূরতানের পণ তিনি জানিতেন। সেই পণ রক্ষা করিতে না পারিলে এই রূপবতী রণরঙ্গিণীকে, রাজপুত বীরের যোগ্য বীরাঙ্গনাকে লাভ করিবার উপায় নাই। জয়মল্ল রাওশূরতানকে নিজ বাসনা জানাইয়া সৈন্য সহ টোডা উদ্ধারে গমন করিলেন। পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া নির্ল্লজ্জ জয়মল্ল বলপূর্ব্বক তারাবাইকে হরণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি রাণার পুত্র। রাওশূরতান তাঁহার পিতৃরাজ্যে আশ্রিত। সুতরাং এ সাহস তাঁহার হইবে না কেন? কিন্তু আত্মসম্মান ও কুলগৌরব রক্ষার জন্য রাওশূরতান

আশ্রয়দাতা রাণা বা রাণার পুত্রকে ভয় করিবার পাত্র নহেন। কন্যাহরণে উদ্যত জয়মল্লকে তিনি হত্যা করিলেন।

রাণার নিকট সংবাদ পৌঁছিল। রাণা কহিলেন,—"জয়মল্ল মিবার রাজবংশের, ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক। রাওশূরতান তাহাকে যোগ্য শাস্তি দিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট বই রুষ্ট নই। তাঁহার বীরত্বের ও সৎসাহসের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার বাসভূমি বেদনোর প্রদেশের ভূমিস্বত্ব তাঁহাকে আমি দান করিলাম।"

মিবারের রাণাবংশীয় মহাপুরুষ ব্যতীত আর কাহার মুখে এমন কথার আশা করা যায় ?

(২)

জয়মল্লের ব্যবহারে চিতোরের নিষ্কলঙ্ক রাণাবংশে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে। এখন অন্য স্থানের কোন বীর যদি টোডা উদ্ধার করিয়া তারাবাইকে লাভ করেন, মিবারকে আরও হীন হইতে হইবে। রাণার দ্বিতীয় পুত্র তেজস্বী পৃথ্বিরাজ, টোডা উদ্ধার করিয়া তারাকে বিবাহ করিবেন, না হয়, সেই যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন এই সংকল্প করিয়া বেদনোরে গমন করিলেন।

পৃথ্বিরাজের বীরত্ব ও তেজস্বিতার খ্যাতি তারাবাই পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আজ মূর্ত্তিমান্ ক্ষত্রিয়তেজস্বরূপ বীরযুবককে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এই বীর

নিশ্চয়ই টোডা উদ্ধারে সমর্থ হইবেন। মুগ্ধা বীরাঙ্গনা মনে মনে বীরযুবককে আত্মসমর্পণ করিলেন।

পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন বলিয়া বাল্যাবধি অতি যত্নে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন; আজ এই বীরযুবকের সহায়তা করিয়া তাঁর সকল শিক্ষা সার্থক করিবার, প্রাণের নিতান্ত পোষিত বাসনা পূর্ণ করিবার, যোগ্য অবসর উপস্থিত। তারাবাই পৃথ্বিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে যাইবেন মনস্থ করিয়া পিতৃ। অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাওশূরতান কহিলেন,—"মা, তুমি বীরোচিত অস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ করিয়াছ। তোমার যুদ্ধ গমনে আমার কোন ভয়, চিন্তা বা আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এই বীরযুবকের সঙ্গে থাকিয়া স্বভাবতই তোমার মন ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আমার পণ তুমি জান। যদি ইনি টোডা উদ্ধারে সমর্থ না হন, ইঁহার সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্ভব হইবে না। কেবল তাই নয়, যদি ইহার পর আর কোন বীর টোডা উদ্ধার করিতে পারেন, তবে তাঁহাকেই তোমার পতিত্বে বরণ করিতে হইবে।"

তারা কহিলেন,—"পিতা, আমি এখনই ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট। যাহাতে ইনি টোডা উদ্ধার করিতে পারেন, প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিবার জন্যই ইঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে চাই। যদি তিনি নিতান্তই টোডা উদ্ধারে অসমর্থ হন,তাহাতে আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার পণে আমিও বাধ্য। সেই পণ রক্ষায়, আপনার সম্মানরক্ষার জন্য, স্বদেশের উদ্ধারে আমি কঠোরতম

আত্মবলিদানে প্রস্তুত। যদি ইনি টোডা উদ্ধারে সমর্থ না হন, প্রাণের সকল সাধ, সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিব। ইঁহাকে একেবারে ভুলিতে না পারি, এজীবনে ইঁহাকে স্বামীরূপে লাভ করিবার সকল আকাঙ্ক্ষা দমন করিব। যদি ইনি জয়মল্লের ন্যায় বলপূর্ব্বক আমাকে অধিকার করিবার কখনো চেষ্টা করেন, আপনি জয়মল্লের যে দশা করিয়াছেন, আমার প্রাণভরা প্রেম সত্ত্বেও আপনার পণ রক্ষার জন্য, জন্মভূমি টোডার জন্য; আমিও স্বহস্তে ইঁহার সেই দশা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। সুধু তাই নয়, রাজপুতবালার পক্ষে যাহার চিন্তাও মহাপাপ,— এক পুরুষকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করা—তাহাতেও আমি পরাঙ্মুখ হইব না। ইঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, ইহার পর যে কোন পুরুষ টোডা উদ্ধার করিবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন। ইহাতে যদি পরলোকে আমাকে নিরয়গামিনী হইতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত। পিতা, আপনি চিন্তিত হইবেন না। যুদ্ধে যাইতে আমাকে অনুমতি দিন। আমি আপনার কন্যা, আপনার শোণিত আমার দেহে প্রবাহিত,—আপনার প্রাণের বল আমার প্রাণেও সঞ্চারিত।”

রাওশূরতান আর আপত্তি করিলেন না। সন্তুষ্টচিত্তে কন্যাকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিলেন। পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ পৃথ্বিরাজ ও তারাবাই টোডা উদ্ধারে গমন করিলেন।

এত অল্প সৈন্য লইয়া দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধার করা সহজ নয়। পৃথ্বিরাজ ও তারাবাই পরামর্শ করিয়া স্থির

করিলেন—পাঠান সর্দ্দার লিল্লাকে কৌশলে আগে হত্যা করিতে হইবে।

মহরমের দিন আসিল। টোডার সমস্ত মুশলমান উৎসবে মত্ত। তাজিয়া লইয়া দলে দলে লোক রাজধানীতে প্রবেশ করিতে লাগিল। সৈন্যদিগকে একটু দূরে অন্তরালে রাখিয়া পৃথ্বিরাজ, তারাবাই এবং পৃথ্বিরাজের একজন বিশ্বস্ত অনুচর, এই তিন জনে, ছদ্মবেশে এক তাজিয়ার দলে মিশিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। উৎসবে যোগ দিবার জন্য লিল্লা আপন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পৃথ্বিরাজ ও তারাবাই তাঁহাকে দেখিবামাত্র কয়েকটী তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়িলেন। লিল্লার মৃতদেহ ভূতলে পড়িল। সকলে ভীত হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। এই অবসরে পৃথ্বিরাজ, তারাবাই ও তাঁহাদের অনুচর বেগে অশ্ব চালাইয়া নগরের বাহিরের দিকে চলিলেন। বহু লোক তাঁহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। শত্রুনিক্ষিপ্ত বাণ তাঁহাদের বর্ম্মে ঠেকিয়া মাটিতে পড়িল। নগরদ্বারে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। তারাবাই তরবারি আঘাতে হস্তীর শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন। হাতী দূরে পলাইল। তাঁহারাও মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইলেন।

তাঁহাদের অশ্বারোহী সৈন্য নিকটেই ছিল। পৃথ্বিরাজ ও তারাবাই সৈন্য লইয়া প্রবল বেগে নগর আক্রমণ করিলেন।

যুদ্ধে অপ্রস্তুত নেতৃবিহীন পাঠানসেনা পরাজিত হইল। রাঁও-শূরতানের নামে পৃথ্বিরাজ ও তারাবাই টোডা অধিকার করিলেন। অবিলম্বে টোডাতঙ্কে পৃথ্বিরাজ ও তারার বিবাহ হইল।

(৩)

কমলমীর দুর্গে রাণা রায়মল্ল পুত্র ও পুত্রবধূর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথ্বিরাজ নিতান্ত রণপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিয়তই নানাশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই তাঁহার প্রধান সঙ্গিনী তারাবাই। যুদ্ধেই প্রণয়, যুদ্ধেই বিবাহ, যুদ্ধেই নবদম্পতির প্রথম বিবাহিত জীবন কাটিল। কিন্তু হায়, প্রথম জীবন অতিবাহিত হইতে না হইতেই বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই বীরদম্পতির অপূর্ব্ব বীরত্বলীলার অবসান হইল।

শিরোহী নামক কোন ক্ষুদ্র জনপদের রাজা পাভুরায়ের সঙ্গে পৃথ্বিরাজের এক ভগিনীর বিবাহ হয়। পাভুরায় বড় বেসি অহিফেন খাইত, এবং নেশার ঝোঁকে স্ত্রীর উপর বড় অত্যাচার করিত। স্বামীর অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া পাভুরায়ের স্ত্রী, ভ্রাতা পৃথ্বিরাজের নিকট পত্রে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে স্বামিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে লইয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। পৃথ্বিরাজ অবিলম্বে ভগিনীর গৃহে গমন করিলেন। পাভুরায় পৃথ্বিরাজের ক্ষমতা জানিতেন। পৃথ্বিরাজের তাড়নায় তিনি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পৃথ্বিরাজ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি কহিলেন,— "রাণা রায়মল্লের দুহিতার তুমি এমন অবমাননা করিয়াছ। তার

পায়ে ধরিয়া, তার পাদুকা মাথায় লইয়া তোমাকে তার নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে। নতুবা তোমার নিষ্কৃতি নাই।"

পাভুরায় অগত্যা তাহাই করিলেন। কিন্তু এই অপমানের বিষ তাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। প্রবল প্রতিহিংসা তার হৃদয় অধিকার করিল। অতি নৃশংস উপায়ে পশুপ্রকৃতি পাভুরায় সেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিল।

বিষমিশ্রিত কতকগুলি লাড়ু প্রস্তুত করিয়া, যাইবার সময় পাভুরায় পৃথ্বিরাজের সঙ্গে দিল। পথে পৃথ্বিরাজ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই লাড়ু খাইলেন। তীব্র বিষের জ্বালায় তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। পৃথ্বিরাজ বুঝিলেন, তাঁর আসন্ন কাল উপস্থিত। এক দেবমন্দিরে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তারাবাইএর নিকট সংবাদ গেল। তারাবাই আসিয়া দেবমন্দিরে পৃথ্বিরাজের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন।

ধীরে ধীরে স্বামীর মস্তক কোলে রাখিয়া মৃত স্বামীকে সম্বোধন করিয়া তারা কহিলেন,—"প্রভো, বীর তুমি, যুদ্ধ তোমার জীবনের ব্রত। বীরের শ্রেষ্ঠ নিয়তি - যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মৃত্যু প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমি প্রতীক্ষা করিয়াছি। যুদ্ধক্ষেত্রে না পারি, চিতায় তোমার সহগামিনী হইতে সর্ব্বদা আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আজ বড় দুঃখ,—এমন হীন—কল্পনার অতীত ভাবে তোমার বীরজীবনের শেষ হইল। বড় দুঃখ—শত্রুশোণিতে রঞ্জিত, শত্রুর অসিতে ছিন্ন, পুণ্য রণ-ক্ষেত্রে পতিত তোমার বীরদেহ বুকে করিয়া, তোমার বীরত্ব-

লীলার চিরসঙ্গিনী আমি আজ তোমার চিতায় উঠিতে পারিলাম না। যাক্‌, বিধাতার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছায় যাহা ছিল, হইয়াছে। আজ এই দেবমন্দিরের সম্মুখে তোমারই অধীন এ দেহ, তোমার দেহের সঙ্গে চিতায় ভস্ম হউক। তোমারই এ প্রাণ তোমার সঙ্গে পরলোকে মিলিত হউক।”

অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত হইল। স্বামীর দেহ বুকে করিয়া হাসিমুখে তারাবাই চিতায় শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে অতুল সৌন্দর্য্যরাশি ভস্মসাৎ হইল।

জবহর বাই।

রায়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সংগ্রামসিংহ চিতোরে রাণা হইলেন। সংগ্রামসিংহের রাজত্বকালে দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং বাবর তাহার স্থানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

সংগ্রামসিংহ বিশেষ পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। গুজরাট হইতে যমুনা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে তিনি তাঁহার অধিকার বিস্তার করেন। পাঠান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর, তাঁহার মনে হইল, আবার উত্তর ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই উপযুক্ত অবসর উপস্থিত। পাঠানবিজয়ী মোগলবীর বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তিনি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, উত্তর ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া তিনি আর কখনো মিবারে পদার্পণ করিবেন না। ভারতের সাম্রাজ্য লইয়া মোগল ও রাজপুতে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। আগ্রা হইতে দশ ক্রোশ দূরে, ফতেপুর শিক্রি নামক একটি স্থানে, দুইটি ভীষণ যুদ্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে বাবর পরাস্ত হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে সংগ্রামসিংহের বিপুল সৈন্য একেবারে ধ্বংস হইল। হিন্দুর গৌরব দেশহিতৈষী রাজপুতবীর আর মিবারে ফিরিলেন না। পরাজয়ের অল্প পরেই ভগ্নহৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভারতে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। হিন্দুর আশা ফুরাইল।

সংগ্রামের মৃত্যুর পর চিতোররাজ্য বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই হতবল রাজ্যে সংগ্রামের অযোগ্য পুত্র গর্ব্বিত ও উদ্ধত-স্বভাব তরুণবয়স্ক বিক্রমজিৎ রাজা হইলেন। তিনি নীচবংশীয় মল্ল ও পদাতিক সৈন্যগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া উচ্চবংশীয় সর্দ্দারগণকে সর্ব্বদা অবমাননা করিতেন। মিবারের শ্রেষ্ঠ রাণাগণ কর্ত্তৃক চিরসম্মানিত সর্দ্দারগণ রুষ্ট হইয়া রাজদরবার পরিত্যাগ করিলেন এবং যুদ্ধে, কি রাজ্যশাসনে, বিক্রমজিতের কোন সহায়তা করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

এখন পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাঠান সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক মুশলমান শাসনকর্ত্তারা পাঠান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন। এখনো তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এইরূপ স্বাধীন রাজা ছিলেন। মিবারের নিকটবর্ত্তী গুজরাট্ ও মালবে এইরূপ দুইজন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। মিবারের সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁহাদের যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। সংগ্রামসিংহ মালব ও গুজরাটের রাজাদিগকে বার বার পরাস্ত করেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত উদারচেতা বীর ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন নাই। তাঁহারা তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করায়, নিজ নিজ রাজ্যে তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

কিন্তু এই হীনতা ও অবমাননা তাঁহারা ভুলিতে পারেন

নাই। সংগ্রামসিংহ জীবিত নাই। তাঁহার বিপুল রাজপুত সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে। হতবল চিতোর অন্তর্ব্বিবাদে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। গুজরাটরাজ বাহাদুরসাহ এই সুযোগে মালবরাজের সহায়তায় প্রবলবিক্রমে চিতোর আক্রমণ করিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি বিক্রমজিৎ অসন্তুষ্ট সর্দ্দারগণের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাইলেন না। প্রবল বিদেশী শত্রু দেশে উপস্থিত, রাজা অযোগ্য; সর্দ্দারগণ রাজার সহায় হইতে বিমুখ। এমন দুর্দ্দশা বোধ হয় মিবারে কখনো আসে নাই। বিক্রমজিৎ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, মুশলমান চিতোরে প্রবেশ করিতে উদ্যত। রাজপুতনারীরা জহর ব্রতের (অর্থাৎ সকলে একত্র হইয়া অনলকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার) আয়োজন করিলেন। তখন রাজমহিষী জবহর বাই সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ, আজ এই দুর্দ্দিনে নারীধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য আমরা সকলে অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ইহাতে আমাদের সম্মান রক্ষা হইবে সত্য, কিন্তু দেশের আর কোন হিতসাধন হইবে না। এতগুলি রাজপুতরমণী আমরা যদি মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি, বৃথা কেন মরিব? এ মরণের বিনিময়ে দেশের শত্রুনাশ কি আমরা করিতে পারি না? চিতোর বীরাঙ্গনার বাহুতে কি শক্তি নাই? যে কর আমরা রাজপুত বীরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, সে করে কি রাজপুতবীরের হাতের ভূষণ আমরা ধরিতে পারিব না? কেবল বসনভূষণে সাজাইবার জন্য বিধাতা রাজপুতরমণীর দেহ গঠন

করেন নাই। কেবল ফুলের মালা গাঁথিবার জন্য রাজপুতরমণীর কর সৃষ্ট হয় নাই। রাজপুতরমণী স্বামীর গৃহে গৃহলক্ষ্মী; প্রণয়ে বিলাসিনী বিনোদিনী, রাজত্বে রাজমহিষী, সমরে সমর-রঙ্গিণী! চিরদিন রাজপুত ললনা স্বামীর সঙ্গে দানবদলনী দুর্গার স্বরূপ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আজ কেন আমরা তাহাতে কুণ্ঠিত হইব? আসুন, চিতানলে বৃথা প্রাণ বিসর্জ্জন না করিয়া অসিহস্তে ভীমবেগে রণচণ্ডিকার ন্যায় আমরা শত্রু সংহারে সমর-ক্ষেত্রে ধাবিত হই। আমরা দেশরক্ষা করিতে পারিব না সত্য। কিন্তু আমাদের এক একটি প্রাণবিনিময়ে অন্ততঃ দশটি করিয়াও শত্রুনাশ করিতে পারিব। দেশের শত্রুনাশ করিতে করিতে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সকলে শত্রুর অসিতে মরিব। কেহ বন্দিনী হইব না। বন্দী করিবার আশায়, শত্রু যদি কাহারও দেহে আঘাত না করে, তবে আমাদের নিজের নিজের অসি আমাদের বক্ষ শোণিতে রঞ্জিত হইয়া আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবে।"

রাণীর তেজোময় বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাজপুত বীরাঙ্গনা মধুর কণ্ঠের গম্ভীর হুঙ্কারে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ বাছিয়া বাছিয়া ঢাল, তরোয়াল, ভল্ল, বর্ষা, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্রে শস্ত্রে বীরনারী সুসজ্জিত হইলেন। বর্ম্ম পরিধান করিলেন।

তখন, চিতোরের জয় ঘোষণা করিয়া এই অপূর্ব্ব সৈন্যদল, অশ্বারোহণে, রাণী জবহর বাইএর নেতৃত্বাধীনে, প্রচণ্ডবেগে চিতোর-অবরোধকারী পাঠানসৈন্যের উপর পতিত হইল।

পাঠান সৈন্য স্তম্ভিত হইল। সহসা এই ভীমা রণরঙ্গিণী-গণের ভীম সংঘর্ষে পাঠানব্যূহ বিচলিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই পাঠান সেনাপতিরা চঞ্চল সৈন্যশ্রেণী স্থিরসম্বদ্ধ করিয়া জবহর বাই ও তাঁহার বীরসহচরীগণকে ঘিরিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই অপূর্ব্ব ভীষণ যুদ্ধে বহু পাঠানসৈন্য হত ও আহত হইল। রাণী জবহর বাই ও তাঁহার সঙ্গিনীরা সকলেই কেহ শত্রুর অসিতে, কেহ নিজের অসিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

বাহাদুর সাহ চিতোর অধিকার করিয়াছেন। রাজপুত জাতির মধ্যে এক নিয়ম ছিল, বিপদাপন্না রাজপুতরমণী বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় কখনো কখনো কোন বীরের নিকট 'রাখী' পাঠাইতেন। রাখী গ্রহণ করিলে সেই বীর তাঁহার 'রাখীবন্ধ ভাই' নামে অভিহিত হইতেন এবং প্রাণপণে সেই 'রাখীবন্ধ ভগিনী'কে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে বাধ্য থাকিতেন। রাজমাতা কর্ণবতী এই বিপদে দিল্লীর মোগল সম্রাট্ বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে 'রাখী' পাঠাইলেন।

উদারচেতা হুমায়ুন, রাজপুত মহিলার এই 'রাখী' অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সসৈন্যে চিতোরে আসিয়া বাহাদুর সাহকে পরাজিত করিয়া বিক্রমজিৎকে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন।

পান্না।

বিপদের শিক্ষায় বিক্রমজিতের চরিত্র কিছুই সংশোধিত হইল না। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহার ক্রমে এত বাড়িল, যে, সর্দ্দারগণ আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। বিক্রমজিতকে তাঁহারা পদচ্যুত করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু কে রাণা হইবে? বিক্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়সিংহ এখনো বৎসরের শিশু। রাণাবংশে এমন শক্তিশালী পুরুষ কেহ নাই, যিনি বিক্রম ও বিক্রমের পক্ষীয় যাঁহারা তাঁহাদিগকে দমনে রাখিয়া মিবার শাসন করিতে পারেন।

রাণাবংশীয় ভূতপূর্ব্ব কোন রাজপুত্রের বনবীর নামে দাসী-গর্ভসম্ভূত মহাবীর এক পুত্র ছিল। সর্দ্দারগণ অগত্যা বিক্রমকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উদয়ের বয়োপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত বনবীরকে রাণাপদে অভিষেক করিলেন।

রাণা হইয়া বনবীরের দুরাকাঙ্ক্ষা বাড়িল। আপনাকে এবং আপনার বংশকে রাণাপদে চিরস্থায়ী করিবার অভিলাষে, সে, বিক্রম ও উদয়কেঁ হত্যা করিতে সংকল্প করিল।

পিতৃমাতৃহীন শিশু উদয়কে পান্না নামে রাজপুত বংশীয়া এক ধাত্রী প্রতিপালন করিতেন। চন্দন নামে উদয়ের সমবয়স্ক পান্নার এক পুত্র ছিল। শিশু দুইটিকে পান্না সমান যত্নে

সন্নান স্নেহে পালন করিতেন। ব্যবহারে কেহ বুঝিত না, উদয়, কি, চন্দন, কে পান্নার নিজ পুত্র। শিশু উদয়ও ‘ধাইমা’কেই “মা” বলিয়া জানিত। মাতৃস্নেহের অভাব শিশু কখনো বুঝিত না,—মার কথা কখনো ভাবিত না, মার জন্য কখনো কাঁদিত না।

গভীর রাত্রি। উদয় ও চন্দন বিছানায় শুইয়া আছে। পান্না নিকটে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

সহসা এক নাপিত আসিয়া সংবাদ দিল, বনবীর বিক্রমজিতকে হত্যা করিয়াছে; শীঘ্রই উদয়কে হত্যা করিতে আসিবে।

পান্নার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। উদয়কে রক্ষা করিবার উপায় কি ? এখন, মিবারের গৌরব পবিত্র রাণাবংশের একমাত্র অবলম্বন এই শিশু। এই শিশুর মৃত্যুতে সেই রাণাবংশ—বাপ্পারাও, সমরসিংহ, লক্ষ্মণসিংহ, হামির, রায়মল্ল, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ রাজাদের বংশ—নির্ম্মূল হইবে ? রাজপুতরমণী হইয়া পান্না কিরূপে তাহা চক্ষে দেখিবেন ?—কিরূপে তাহা সহিবেন ?

একমাত্র রাণাবংশধর উদয় আজ পান্নার হস্তে ন্যস্ত। জীবন দিয়াও—জীবন অপেক্ষা সহস্রগুণে প্রিয়তর যাহা—তাহা দিয়াও,—আজ উদয়কে পান্নার রক্ষা করিতে হইবে।

পান্না মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলেন। একটিবার মাত্র, উদয়ের দিকে, আর চন্দনের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই, প্রশান্ত

ললাটে পান্না মুখ তুলিলেন,—তাঁহার মুখে মর্ম্মভেদী যাত্রনার মধ্যে রাজপুতরমণীর ভীষণ দৃঢ়তার ভাব প্রকাশিত হইল। পান্না নাপিতকে কহিলেন,—"বারি, (রাজপুতানায় নাপিত সম্প্রদায়কে বারি বলে) ঐ ঘরে একটি ফলের ঝুড়ী আছে। সেই ঝুড়ীটা শীঘ্র লইয়া আইস,—তার মধ্যে উদয়কে রাখিয়া, ফল পাতা দিয়া ঢাকিয়া উদয়কে লইয়া বীরা নদীর তীরে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।" বারি কহিল,—"তুমিও কেন চন্দনকে লইয়া এক সঙ্গে চল না?" পান্না কহিলেন— "উদয়কে লইয়া এক সঙ্গে সকলে পলাইলে তাকে রক্ষা করিতে পারিব কি? বনবীর আজ চিতোরের রাণা; সে যদি জানে, উদয় পলাইয়াছে, অচিরেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তার প্রাণনাশ করিবে।"

বারি কহিল,—"তুমি থাকিলে কি, তাহা নিবারণ করিতে পারিবে?"

পান্না। পারিব।

বারি। কিসে?

পান্না। বারি, বনবীর যদি জানে উদয় জীবিত আছে, তবে তার নিস্তার নাই। উদয়কে সে হত্যা করিয়া তার পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছে, ইহা তাকে বুঝাইতে হইবে।

বারি। কি করিয়া তাহা করিবে?

পান্না। বারি, আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। সে কথা ভাবিতেও আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বারি, ঐ

আমার প্রাণের ধন চন্দনকে দেখিতেছ। আজ রাণার বংশ রক্ষার জন্য, চিতোর-গৌরবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রক্ষার জন্য,—চন্দনকে আমি বিসর্জ্জন দিব।

বারি। সে কি!—

পান্না। হাঁ।—উদয়ের কাপড় পরাইয়া এখনি চন্দনকে বিছানায় রাখিব, বনবীর আসিলে উহাকেই উদয় বলিয়া দেখাইয়া দিব।

বারি চমকিত হইয়া কহিল,—"ধাইমা, ধাইমা, তুমি রাক্ষসী না মানবী?"

পান্না কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"রাক্ষসী, বারি, আজ আমি রাক্ষসী! জননী হইয়া তাই চন্দনকে মৃত্যুমুখে সঁপিয়া দিতেছি।"

কিন্তু তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া ধীর দৃঢ়কণ্ঠে পান্না আবার কহিলেন,—"বারি, যে রাণাবংশ এতকাল মিবারের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, যে রাণাবংশ ভবিষ্যতে মিবারের গৌবর আরও বাড়াইবেন, যে রাণাবংশের নামে জন্মস্থান ধন্য, ভারত ধন্য, জগত ধন্য হইয়াছে—আরও হইবে, আমি কে, বারি, যে, সেই রাণাবংশ রক্ষার জন্য আমার পুত্রকে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিতে পারিব না? আজ রাণাবংশধর উদয়ের কাছে আমার পুত্র কে, যে, সে তার জীবন রক্ষার জন্য প্রাণ দিবে না? বারি, আমি রাজপুতরমণী; আমার পুত্র রাজপুত। রাণার সহচররূপে রাণার জীবন রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রাণদান তার

জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দুদিন পরে, পরিণত বয়সে আপন ইচ্ছায় যে পরিণামে সে ধন্য হইত, আজ বালকবয়সে মাতার ইচ্ছায় সেই পরিণামে কি তার জীবন ধন্য হইবে না ?—আপনারি ক্ষুদ্র জীবন-বিনিময়ে রাণার বংশ সে আজ পৃথিবীতে অক্ষয় করিতেছে, ইহা অপেক্ষা তার জীবনের আর সার্থকতা, আর গৌরব কি হইতে পারে ? যাও বারি, আর বিলম্ব করিও না। বনবীর হয় তো এখনই আসিয়া পড়িবে। এখনই উদয়কে লইয়া তুমি চলিয়া যাও।”

বারি পান্নাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—“ধাইমা, তোমাকে রাক্ষসী বলিয়াছি, তুমি মানবীও নও, দেবী।”

এই বলিয়া বারি ত্বরিতে ফলের ঝুড়ী লইয়া আসিল। পান্না উদয়কে তুলিয়া তার মধ্যে রাখিয়া ফল-পাতা-লতা দিয়া ঝুড়ীটি ঢাকিয়া দিলেন। বারি ঝুড়ী লইয়া চলিয়া গেল। পান্না উদয়ের কাপড় চোপড় সাবধানে ঘুমন্ত চন্দনকে পরাইয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে বনবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীমকণ্ঠে বনবীর জিজ্ঞাসিল,—“ধাই, উদয় কোথায় ?”

পান্না কথা কহিতে পারিলেন না। আঙ্গুল দিয়া চন্দনকে দেখাইয়া দিলেন। বনবীর তৎক্ষণাৎ ছুরিকাঘাতে চন্দনের বক্ষ বিদীর্ণ করিল। যাতনায় চন্দন ‘মা’ বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। নিশ্চল দেবী প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া পান্না সব দেখিলেন।

বনবীর চলিয়া গেলে, শোণিতাক্ত মৃত পুত্রের দেহ কোলে করিয়া পান্না দ্রুতপদে অন্ধকার রাত্রিতে বীরা নদীর তীরে আসিলেন। নদীর তীরে বারি নিদ্রিত উদয়কে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বারির সাহায্যে কোনও মতে পুত্রের অগ্নি-সংকার করিয়া, উদয়কে লইয়া পান্না চিতোরের দূরে কোন জনপদে চলিয়া গেলেন।

মিবারের প্রান্তভাগে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশা শা নামক কোন সর্দ্দারের গৃহে উদয় আশ্রয় পাইলেন।

নরপিশাচ বনবীরের অত্যাচারে চিতোরের সর্দ্দারগণ ক্রমে যখন বড় বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তখন উদয়ের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা বনবীরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উদয়কে রাজসিংহাসনে আনিয়া বসান।

পান্না তখনো জীবিত ছিলেন।

কর্ম্মদেবী।

(২)

উদয়সিংহের রাজত্বকালে আকবরসাহ তরুণ বয়সে দিল্লীর বাদসাহ হইলেন। দিল্লীতে, কি পাঠান, কি মোগল, যত মুশলমান সম্রাট্ রাজত্ব করিয়াছেন, বীরত্বে, রাজনীতির কৌশলে, মহত্ত্বে ও রাজগৌরবে আকবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া তিনি চিতোর আক্রমণ করেন।

ষোড়শ বর্ষীয় বালক বীর পুত্ত এই সময় কৈলবারা প্রদেশ শাসন করিতেন। পুত্তের জননী কর্ম্মদেবী সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ রাজপুত মহিলা ছিলেন। পুত্ত বয়সে বালক হইলেও, জননীর সহায়তায় নিজের অধীনস্থ প্রদেশ সুশাসনে রাখিয়াছিলেন।

আকবর চিতোর আক্রমণ করিয়াছেন সংবাদ আসিলে, কর্ম্মদেবী পুত্তকে কহিলেন,—"পুত্ত, প্রবল শত্রু মিবারে উপস্থিত। যুদ্ধের আয়োজন কর। সৈন্য লইয়া অবিলম্বে চিতোর রক্ষা করিতে যাও।"

পুত্ত কহিলেন,—"মা, রাণা ত যুদ্ধে আমাকে আহ্বান করেন নাই।"

কর্ম্মদেবী কহিলেন,—"বোধ হয় বালক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি তুমি মিবারবাসী রাজপুত হইয়া মিবারের এই বিপদের সময় ঘরে বসিয়া থাকিবে? রাণার প্রজা হইয়া শত্রুর আক্রমণে তাঁহাকে সাহায্য দানে কুণ্ঠিত হইবে? যাও পুত্ত, সৈন্য লইয়া স্বদেশ রক্ষার্থে স্বদেশের রাজা রাণার সাহায্যে যুদ্ধে যাও। বালক বলিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হইও না। বয়সে বালক হইলেও, বীরত্বে তুমি কোন পরিণত-বয়স্ক রাজপুত বীর অপেক্ষা কম নও। রাণা ডাকেন নাই বলিয়া দ্বিধা করিও না; তোমার জন্মভূমি বিপদে তোমাকে ডাকিতেছেন। এ ডাকের উপরে কি রাণার ডাক? আর, তুমি সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলে, তোমার সহায়তা তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করিবেন না। আর যদি করেনও, রাণার অজ্ঞাতে স্বদেশ রক্ষার্থে স্বদেশের শত্রুনাশে তোমার প্রাণপণ চেষ্টা তুমি করিবে। ভবিষ্যতে রাণার অসন্তোষে যদি ইহাতে তোমার কোন বিপদ হয়, তাও হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া লইবে।"

পুত্ত সৈন্য সহ চিতোরে যাত্রা করিলেন। পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়া, কন্যা কর্ণবতী এবং পুত্রবধূ কমলাবতীকে ডাকিয়া কর্ম্মদেবী কহিলেন,—"মা, পুত্ত আমার এখনো বালক। তাহাকে একা যুদ্ধে পাঠাইয়া ঘরে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। আমিও যুদ্ধে যাইব। যতদূর পারি পুত্তের সহায়তা করিব।"

কর্ণবতী কহিলেন,—"তুমি যদি যাও মা, আমিও যাইব। মা হইয়া তুমি যদি পুত্রের সহায়তায় অস্ত্র ধারণ করিতে পার, ভগিনী হইয়া কি আমি হাতে স্থধু অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া থাকিব ?"

কমলাবতী কহিলেন,—"মা, আমিও যাইব। বীরের সহধর্ম্মিণী আমি, স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার ধর্ম্ম। বালিকা হইলেও, রাজপুত বালা কখনো ধর্ম্ম সাধনে কুণ্ঠিত হয় না। স্বামী যদি যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তাঁর বিজয় গৌরবের সঙ্গিনী হইব। আর এ জীবনের মত বীরশয্যায় যদি তিনি শয়ন করেন, আমি সেই শয্যাভাগিনী হইব।"

কন্যা ও পুত্রবধূর সাহস ও বীরত্বে পরমানন্দিত হৃদয়ে কর্ম্ম-দেবী তাঁহাদিগকে বীরবেশে সজ্জিত করিয়া নিজেও বীরবেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে চিতোরের দিকে চলিলেন।

এই যুদ্ধে অন্যান্য যে সমস্ত সামন্ত রাজা উদয়সিংহের সহায়তায় চিতোরে আসিয়াছিলেন, বেদনোরের অধিপতি জয়মল্লই বীরত্বে ও পরাক্রমে সকলের প্রধান ছিলেন। উদয়সিংহ তাঁহাকেই প্রধান সেনা-নায়কের পদে বরণ করিলেন। জয়মল্ল যুদ্ধে নিহত হইলে পুত্ত তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পদগৌরবে, আপন গৌরবে, পুত্ত চিতোরের গৌরব রক্ষার চিন্তায় উৎফুল্ল হইয়া যুদ্ধে চলিলেন। পুত্তের সঙ্গে আকবরের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সম্রাটের সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্যের সঙ্গে পুত্ত যুদ্ধ করিতেছেন। অপর দল সৈন্য

লইয়া স্বয়ং আকবর সাহ অন্যদিক হইতে পুত্তকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

এইরূপ সময়ে সহসা সম্মুখে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মধ্য হইতে অনবরত গুলি আসিয়া আকবরের সৈন্যগণের উপর পড়িতে লাগিল।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া মোগল দেখিল, তিনটী অশ্বারোহিণী রাজপুতরমণী অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া গিরিপথের মুখে তাহাদের পথ অবরোধ করিয়া তাহাদের বিপুল সৈন্যরাশির উপর দৃঢ় সন্ধানে ক্ষিপ্রহস্তে গুলি চালাইতেছেন। প্রত্যেক গুলিতেই মোগল সৈন্য হত হইতেছে।

এই রাজপুত রমণীত্রয় আর কেহ নহেন,—স্বয়ং কর্ম্মদেবী, তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ।

যুদ্ধের আরম্ভেই কর্ম্মদেবী বুঝিয়াছিলেন, আকবর তাঁহার নিজের সৈন্যদল লইয়া অপরদিক হইতে পুত্তকে আক্রমণ করিবেন। ইহাদের গতিরোধ করিতে পারিলে, পুত্ত প্রথম সৈন্য-দলকে পরাজিত করিতে পারিবেন। এই মনে করিয়া কর্ম্মদেবী গোপনে ঐ গিরিপথে অবস্থান করিতেছিলেন।

আকবরের সৈন্য যেমন অগ্রসর হইয়া গিরিপথের নিকটে আসিয়াছে, অমনি তিনি, কন্যা পুত্রবধূ এবং সঙ্গীয় সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এত অল্প বলে তিনি আকবরের বিশাল সৈন্যদলকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, এ দুরাশা বুদ্ধিমতী কর্ম্মদেবী কখনো মনে স্থান দেন নাই। তবে প্রথমদল মোগল

সৈন্যের উপর পুত্তের জয়লাভ পর্য্যন্ত আকবরের গতিরোধ তিনি করিতে পারিবেন এ ভরসা তাঁহার ছিল।

প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর আকবরের সঙ্গে তিনটি রাজপুত মহিলার এই অপূর্ব্ব সমর প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে কর্ণবতী মোগলের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ধরাশায়িনী হইলেন। কর্ম্মদেবী, একবার,—একবার মাত্র চাহিয়া দেখিলেন,—বালিকা কন্যা মরিল। মরিবার জন্যই আসিয়াছে, মরিয়াছে তায় দুঃখ কি? আর, দুঃখের এ সময় নহে। কর্ম্মদেবী হাতের বন্দুক দৃঢ় করিয়া ধরিয়া দ্বিগুণ বেগে গুলি চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ আর দুইটি মাত্র রমণী অল্প সৈন্য লইয়া এমন প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুঝিতে পারিবেন? কর্ম্মদেবী ও কমলাবতী উভয়েই আহত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

এমন সময় প্রথম দল মোগলসৈন্য পরাজয় করিয়া পুত্ত আকবরকে আক্রমণ করিবার মানসে সেই গিরিপথের সম্মুখে আগমন করিলেন। জননী ভগিনী ও স্ত্রীকে পতিত দেখিয়া সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে বলিয়া তিনি তাঁহাদের নিকটে গমন করিলেন।

কর্ম্মদেবী ও কমলাবতী তখনো জীবিত। পুত্ত দুজনকে তাঁহাদের মাথা কোলে রাখিয়া বসিলেন। কমলাবতী একবার চাহিয়া, একটু হাসিয়া স্বামীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। কর্ম্মদেবী অতিকষ্টে শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন—"পুত্ত,

আমরা চলিলাম। ওই যুদ্ধকোলাহল শুনিতেছি। এখনো বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ ? যাও, যুদ্ধ কর। যদি শত্রুজয় করিয়া দেশ রক্ষা করিতে না পার, প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিও না। ছার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া স্বর্গে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইও। আমরা সেখানে তোমার অপেক্ষা করিব'।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই কর্ম্মদেবীর আত্মা দেহমুক্ত হইল। "হর হর" শব্দে চতুর্দ্দিক গর্জ্জিত করিয়া পুত্ত ছুটিয়া যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোগল সৈন্য ধ্বংস করিতে করিতে তিনিও অবিলম্বে মাতা ভগিনী ও স্ত্রীর অনুগামী হইলেন।

চিতোর ধ্বংস হইল। আকবর চিতোর অধিকার করিলেন। উদয়সিংহ আরাবল্লী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে উদয়পুর নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে তিনি রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, এই যুদ্ধে এত রাজপুতবীর হত হন, যে, তাঁহাদের পৈতা ওজন করিয়া ৭৪॥ মণ হয়। (তখন রাজপুতনায় ৪ সেরে এক মণ হইত।) অনেকে পত্রের শিরোনামার অপর পৃষ্ঠে ৭৪॥ অঙ্কটি লিখিয়া থাকেন। ঐ রূপ অঙ্ক থাকিলে, পত্রের অধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ সেই পত্র খুলিলে, চিতোরধ্বংসের এবং এতগুলি রাজপুতবীরের প্রাণনাশের পাপভাগী তিনি হইবেন, এইরূপ লোকের সংস্কার আছে।

এই ঘটনার পর হইতেই এই নিয়ম ও সংস্কার প্রচারিত হয়।

যোধাবাই।

(১)

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিরস্মরণীয় মহাবীর প্রতাপসিংহ চিতোরের রাণা হন।

রাজনীতিতে সম্রাট্ আকবরের মত দূরদর্শী বিচক্ষণ ও উদারচেতা পুরুষ জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মান্ধ অনেক মুশলমানরাজার ন্যায় তাঁহার কোনরূপ হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল না। তারপর তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, যে, ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ। সাহস, বীরত্ব, বিদ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে হিন্দু অতি শ্রেষ্ঠ। কেবল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বলিয়াই এত মহৎ গুণসম্পন্ন ভারতব্যাপ্ত হিন্দুর উপর মুশলমান জয়লাভ করিতে পারিতেছে।

কিন্তু তথাপি এই বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হিন্দু শক্তিকে কোন মুশলমান সম্রাট্ একেবারে আপনার বশে আনিতে পারেন নাই। মুশলমানের শত্রুতায় যদি কখনো সম্মিলিত হিন্দুশক্তি মুশলমানের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, তবে দুইদিনও মুশলমানশক্তি এদেশে দাঁড়াইতে পারে না। তিনি আরও দেখিলেন, যে, সরলচিত্তে হিন্দু একবার যে রাজবংশের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, পুরুষানুক্রমে প্রাণপণে হিন্দু সেই

রাজবংশের গৌরব রক্ষায় যত্নবান্ থাকে। স্বার্থের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, কোন হিন্দু এই ধর্ম্ম লঙ্ঘন করে না।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতে সম্রাটের অধীনস্থ কোন মুশলমান রাজপুরুষ হিন্দুর ন্যায় এরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দেখান নাই। সম্রাটের দুর্ব্বলতায় যখনই তাঁহারা সুযোগ পাইয়াছেন, সম্রাটের বিরোধী হইয়া তখনই তাঁহারা সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আকবর বুঝিলেন, মোগল সাম্রাজ্য ভারতে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুর সহায়তা আবশ্যক। মোগলের সদ্ব্যবহারে, উদার পক্ষ-পাতশূন্য শাসনে হিন্দু যদি একবার মোগল রাজবংশের অনুগত হয়, তবে তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই রাজবংশের অনুগত থাকিয়া প্রাণপণে, আত্মবলিদানে সেই রাজবংশের শক্তি ও গৌরব রক্ষা করিবে।

তাই আকবরসাহ হিন্দুস্থান জয় করিয়া, উৎপীড়নে হিন্দুকে শত্রু না করিয়া, সদ্ব্যবহারে তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও সহায়তা লাভে মনোযোগী হইলেন।

বহুদর্শী মোগলের এই রাজনীতি-কৌশল সফল হইয়াছিল। হিন্দুস্থানের হিন্দু, ভক্তিভরে আকবরকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" উপাধিতে সম্মানিত করিলেন।

হিন্দুর মধ্যে বীরত্ব ও রাজশক্তিতে রাজস্থানের রাজপুতই তখন এদেশে প্রধান। এমন শক্তিশালী রাজপুতের সহায়তা লাভে সম্রাট্ বিশেষ যত্নবান হইলেন। পরাজিত কোন রাজপুত

রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেই তিনি তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেন। যোগ্যতা অনুসারে শাসন বা সৈনিক বিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মে তাঁহাকে নিয়োগ করিতেন। নিজ রাজ্যে তাঁহার রাজপদ অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

মোগলের সঙ্গে বিবাদে নিষ্ফল যুদ্ধে প্রজাক্ষয় ও রাজ্যনাশ হইবে,নামে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের সংহায় হইলে পুরুষানুক্রমে সসম্মানে নিজ নিজ রাজ্যে সকলে সুখে রাজত্ব করিয়া যাইতে পারিবেন, —বহুকালব্যাপী মুশলমান যুদ্ধে ক্লান্ত রাজপুতগণ শান্তির এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। একে একে সকলেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন। মোগলে ও রাজপুতে এই সম্বন্ধ আরও দৃঢ় করিবার জন্য আকবর নিজে এবং তাহার পুত্র সেলিম, রাজপুত-রাজকন্যা বিবাহ করিলেন।

একমাত্র মিবারেব রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিতে অথবা মোগল বংশের সঙ্গে কোন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না।

লোকের একটা প্রকৃতি আছে, নিজেরা কোনরূপ হীনতার মধ্যে গেলে, অন্য কেহ যে সেই হীনতার উপরে থাকে, তাহা সহিতে পারে না। যে সব রাজপুত রাজারা আকবরের অধীন হইয়া তাঁহার ঘরে কন্যাদান করিয়াছেন, তাঁহারা রাণা প্রতাপের এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান সহিতে পারিলেন না। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য তাঁহারা সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে আকবরকে সাহায্য

করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপের সঙ্গে আকবরের দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

উদয়পুর আকবরের হস্তগত হইল। রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া প্রতাপ সপরিবারে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। আকবরের জিদ, তাঁহার অনুগত রাজপুত রাজগণের জিদ,—প্রতাপকে বশীভূত করিতেই হইবে। বশীভূত হইলে প্রতাপকে তাঁহারা মোগল দরবারে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিতে প্রস্তুত।

কিন্তু প্রতাপ বশীভূত হইবেন না!

নিরন্ন, গৃহহীন, হৃতরাজ্যৈশ্বর্য্য, বনবাসী রাণাপ্রতাপ, সপরিবারে বনে, বনে, পর্ব্বতে, পর্ব্বতে, ঘাসের রুটি খাইয়া, কখনো গাছতলায়, কখনো জীর্ণ গিরিগুহায় দিন কাটাইতেছেন, —আজীবন এমনই কষ্টে দিন কাটাইতে প্রস্তুত,—কিন্তু তথাপি মোগলদরবারে সর্ব্বোচ্চ সম্মান, সকল সম্পদ বা ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষায় মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া মোগলের ঘরে কন্যা দিয়া, পবিত্র রাণাবংশ, ক্ষত্রিয় নাম, রাজপুত নাম,—কখনো কলঙ্কিত করিবেন না। একটি মুখের কথায় প্রতাপ সর্ব্বস্ব ফিরিয়া পাইতেন,—কিন্তু—মহাবংশের গৌরবে, আপনার মনুষ্যত্বের গৌরবে,—দারুণ ঘৃণায় প্রতাপ, সেই কথাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

বহুবৎসর প্রতাপের কঠোর দুঃখে কাটিল। এমনি ঘাসের রুটি খাইয়া, গাছের তলায়—পর্ব্বতের গুহায় থাকিয়া, প্রতাপের

স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার দুঃখের ভাগী হইয়া রহিলেন। সকলেই অচল অটলভাবে প্রশান্ত মনে তাহা সহিলেন।

কিন্তু, শিশু পুত্রকন্যারা মধ্যে মধ্যে বড় কাঁদিত। ক্ষুধার জ্বালায় শিশু পুত্র কন্যার এ রোদন প্রতাপের মর্ম্মে বিঁধিত। তত্রাচ, স্বাধীনতার পরমশ্রেষ্ঠ উপাসক প্রতাপ, তাহাও নীরবে সহ্য করিতেন।

কিন্তু, একদিন আর পারিলেন না। একদিন প্রতাপের মহিষী কয়েকখানি ঘাসের রুটি করিয়া অর্দ্ধেক বালকবালিকা দিগকে দিয়া, বাকী অর্দ্ধেক তাহারা বৈকালে খাইবে বলিয়া রাখিয়া দিলেন। ক্ষুধার জ্বালা বালকবালিকারা অনেক সহিয়াছে। যাহা পাইয়াছে, তাহা খাইতে খাইতে বৈকালে যাহা খাইবে তার দিকে আশা ও আনন্দের সঙ্গে ছোট মেয়েটি চাহিতেছিল। এবেলা খাইল, আবার ওবেলায় খাই-বারও সংস্থান রহিল।

সহসা একটি বন্য বিড়াল আসিয়া সেই রুটিগুলি লইয়া গেল। —শিশু বালিকা বিকট চীৎকারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

প্রতাপ চাহিয়া দেখিলেন। অনেক সহিয়াছেন, কিন্তু আজ আর এ দৃশ্য তাঁহার প্রাণ সহিল না। তিনি তখনই আকবরকে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া আত্মসমর্পণ করিবেন বলিয়া পত্র লিখিলেন।

এই সময়, বিকানীরের রাজা রায়সিংহের ভ্রাতা পৃথ্বিরাজ

দিল্লীতে নজর বন্দী রূপে আকবরের দরবারে ছিলেন। রায়সিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া মোগলদরবারে তাঁহার পারিষদ স্বরূপ ছিলেন। পৃথ্বিরাজ নিতান্ত স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী যুবক। আকবরের হস্তে বন্দী হইয়া তিনি দিল্লীতে নীত হন। বন্দী হইলেও আকবর তাঁহাকে আপন পারিষদের ন্যায় যথাযোগ্য সম্মানে রাখিয়াছিলেন।

প্রতাপের পত্র দিল্লীতে পৌঁছিল। মোগলের রাজমুকুট রাজস্থানের উজ্জ্বলতম রত্নে ভূষিত হইবে, এ আনন্দে, এ গৌরবে আকবর উল্লাসে মত্ত হইলেন। দিল্লীতে আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হইল। কিন্তু পৃথ্বিরাজের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। মোগল বাদসাহ ত সকলকেই কিনিয়াছেন,একমাত্র রাণাবংশধর প্রতাপকে কিনিতে পারেন নাই। সেই প্রতাপ আজ বিক্রীত হইতে চলিলেন? একমাত্র প্রতাপই রাজপুতকুলের গৌরব রাখিয়া আসিতেছেন, আজ প্রতাপের আত্মসমর্পণে রাজপুতকুল চির দিনের মত হীন হইতে চলিল! প্রতাপের মত মহাপুরুষও যদি স্বাধীনতার জন্য দারিদ্র্যের ক্লেশ সহিতে না পারেন, হিন্দুর স্বাধীনতা, হিন্দুর গৌরব আর কে রাখিবে? দারুণ যাতনাময় চিন্তায় পৃথ্বিরাজ জর্জ্জরিত হইলেন।

পৃথ্বিরাজ প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তেজোময়ী ভাষায় স্বাধীনতার মহিমা গাথা লিখিয়া, রাজপুতকুলরবি প্রতাপ যাহাতে স্বাধীনতার সাধনা ছাড়িয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার না করেন, এইরূপ অনুরোধ করিয়া তিনি প্রতাপকে এক পত্র

পাঠাইলেন। পত্র পাইয়া প্রতাপ নিজ দুর্ব্বলতার জন্য বিশেষ ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হইলেন।

প্রতাপ নিজের হীন বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। প্রতাপ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না।

কিছুকাল পরে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ভীমশার নিকট বহু অর্থ সাহায্য পাইয়া, প্রতাপ, উদয়পুর অধিকার করিলেন।

কিন্তু চিতোর উদ্ধার হইল না। চিতোর মোগলের অধীনে রহিল। শেষ জীবনে চিতোরের অধীনতায় দুঃখক্লিষ্ট হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মহাবীর রাণা—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বাধীনপুরুষ- মর দেহ ত্যাগ করিলেন।

(২)

আমরা, পাঠিকাবর্গকে এই সময়ের অবস্থার কিছু পরিচয় দিবার জন্য আকবরের রাজনীতি ও প্রতাপের মহত্ত্বের ইতিহাস একটুকু লিখিলাম। এই আখ্যায়িকার নায়িকা জয়াবতী, প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহের কন্যা,—এবং, পূর্ব্বোল্লিখিত বিকানীর রাজভ্রাতা তেজস্বী কবি বীর পৃথ্বিরাজের স্ত্রী।

পৃথ্বিরাজ যখন বন্দীরূপে দিল্লীতে নীত হইলেন, পতিপ্রাণা সতী জয়াবতী স্বামীর সঙ্গিনী হইবার আকাঙ্ক্ষায় দিল্লী যাইতে উদ্যত হইলেন।

আত্মীয় স্বজন অনেকে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বুঝাইলেন,— "দিল্লীতে তোমার স্বামী বন্দী। অন্যান্য রাজপুত পারিষদগণের

সম্মান আকবর যেরূপ রক্ষা করেন, তাঁহার সম্মান সেইরূপ রক্ষা করিবেন এরূপ বোধ হয় না। তুমি এমন রূপবতী। এই রূপ লইয়া মোগলের রাজধানীতে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবে ?”

জয়াবতী একটু হাসিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া কহিলেন,—“আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মোগলের ভরসা করিয়া আমি দিল্লী যাইতেছি না। প্রয়োজন হইলে আমার এই ছুরী আমার সম্মান রক্ষা করিবে। সম্মান রক্ষার জন্য মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তাই বলিয়া যতদিন জীবিত আছি, স্বামী সেবা হইতে কেন বঞ্চিত থাকিব ?”

আর কেহ আপত্তি করিলেন না। জয়াবতী দিল্লীতে স্বামীর নিকট গমন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকবর পৃথ্বিরাজকে বন্দীর ন্যায় হীন অবস্থায় রাখেন নাই। অন্যান্য রাজপুত পারিষদগণের ন্যায় সসম্মানে তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। জয়াবতীও সেই সব পারিষদপত্নীগণের ন্যায় দিল্লীতে স্বামীর সঙ্গে রহিলেন।

মুশলমানদের মধ্যে নববর্ষের প্রথমে নৌরোজা নামে এক মহোৎসব প্রচলিত ছিল। এই নৌরোজা উৎসবের অনুকরণে আকবর দিল্লীতে ‘খোস্ রোজা’ (বা আমোদের দিন) নামে এক উৎসবের প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ এই উৎসবকেও ‘নৌরোজা’ বলিতেন। এই উৎসবের সময় দিল্লীতে মেয়েদের এক মেলা হইত। বাদসাহের, তাঁহার ওমরাহগণের এবং

রাজপুত পারিষদ ও কর্ম্মচারিগণের পুরমহিলারা এই মেলায় কেনাবেচা করিতেন। অশেষ গুণসম্পন্ন হইয়াও মোগল বাদসাহদের একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা হইতে আকবর একেবারে মুক্ত ছিলেন না। তিনিও রূপলালসা ও ভোগবাসনা দমন করিতে পারিতেন না। এই নৌরোজার মহিলামেলায় আকবর ছদ্মবেশে গোপনে থাকিতেন। কোন সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে তাঁর মন আকৃষ্ট হইলে সম্মান লইয়া সে রমণীর গৃহে ফেরা দুষ্কর হইত।

যাহা হউক, একদিন জয়াবতী এই নৌরোজার বাজারে গিয়াছিলেন। একটি অতি কুটিল পথে বাজার হইতে রমণীদিগকে বাহির হইতে হইত। জয়াবতী যখন এই পথে বাহির হইতেছিলেন, তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে বাদসাহ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে উদ্যত দেখিয়া আকবর সেই কুটিল পথের পাশে গোপনে রহিলেন।

জয়াবতী নিকটে আসিবামাত্র আকবর তাঁহার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা সম্রাট্‌কে এই অবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া জয়াবতী চমকিত হইলেন। জয়াবতী তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন।

ভারতের অধীশ্বর বলিয়া,—স্বামী তাঁহার অধীনে বলিয়া, রাজপুতরমণী তেজস্বিনী সতী কি আততায়ী সম্রাটের সম্মুখে ভীত হইবেন? জয়াবতী একটুও ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। বিদ্যুতের মত, বস্ত্রের মধ্য হইতে তাঁর ধর্ম্মরক্ষার শেষ সম্বল

সেই ছুরিকা বাহির করিয়া বাদসাহের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়-হস্তে ধরিলেন। আলুলায়িতকুন্তলা জয়াবতী ভীষণ মূর্ত্তিতে বজ্রের মত স্বরে কহিলেন,—"কে তুমি পাপিষ্ঠ! তুমিই কি দিল্লীর বাদসাহ? তুমি দিল্লীর বাদসাহই হও আর জগতের অধিপতিই হও, সতী রাজপুত-ললনার ধর্ম্মনাশে যখন উদ্যত হইয়াছ, এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি"—

ছুরী উঠিল,—বিস্মিত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া আকবর তড়িদ্বেগে পিছাইয়া গেলেন।

জয়াবতী আবার কহিলেন,—"তুমি বাদসাহ! তুমি নীচ কুক্কুরের মত পশুপ্রকৃতি!—পিশাচ!—পশুরাও মাতার সম্মান রাখে। যদি পশুরও অধম না হও, মাতার নামে এখনি শপথ কর, আর কখনো কোন কুলললনার ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হইবে না!—নহিলে এই ছুরীতে, এখনি তোমার বাদসাহীলীলা শেষ হইবে।"

আকবর মহৎচরিত্রপুরুষ ছিলেন। কখনো কখনো এইরূপ নীচ ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইলেও মহৎ কখনো মহত্ত্বের অমর্য্যাদা করিতে পারে না। সতীর এই তীব্র তিরস্কারে রুষ্ট না হইয়া বিশেষ লজ্জিত, ক্ষুব্ধ, ও অনুতপ্ত হইলেন। মনে মনে এই মহাপ্রাণা সতীর অশেষ প্রশংসা করিয়া, অবনতমস্তকে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শপথ করিলেন, আর কখনো কোন কুলাঙ্গনার প্রতি এরূপ হীন ব্যবহার করিবেন না।

তেজস্বিনী রাজপুত সতী আপন মহত্ত্ব-গরিমার উজ্জ্বলতর বেশে স্বামি-সকাশে গমন করিলেন।

প্রভাবতী।

(১)

প্রতাপের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের রাজত্বকালে আকবরের পুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীর অনেকবার উদয়পুর আক্রমণ করেন।

বহুবৎসর পর্য্যন্ত অমরসিংহ দিল্লীর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। অনেকবার মোগলসেনা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু হাজার হইলেও মিবার ক্ষুদ্র রাজ্য; এদিকে জাহাঙ্গীর এবং তাঁহার অধীন অন্যান্য রাজপুত রাজগণের দৃঢ় পণ, মিবারের রাণাকে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করাইবেন। মিবারের সাধ্য কি, যে, এই শক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে? প্রতাপ যে, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও দীন ভিখারীর মত কঠোর দারিদ্র্যে বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, সপরিবারে অসহনীয় কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন, তথাপি মোগলের অধীনতা স্বীকারে রাণাকুলে কলঙ্ক আনেন নাই,—বীর হইলেও, অমরসিংহের চরিত্রে পিতার এই দৃঢ়তা ছিল না। যতদিন কোনও মতে সম্ভব ছিল, মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধে যখন তিনি একেবারে শক্তিহীন হইয়া

পড়িলেন, তখন তিনি অধীনতা স্বীকার করিয়া জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সন্ধি করিলেন।

কিন্তু, তিনি নিজে কখনো অন্যান্য রাজপুত রাজগণের ন্যায় দিল্লীর দরবারে যান নাই, কিংবা মোগলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই।

জাহাঙ্গীর ও তাঁহার পুত্র সাহজাহান উভয়েই আকবরের উদারনীতি অনুসারে রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দুরাজগণের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া রাজ্য শাসন করেন। ইঁহাদের সময়ে, অমর-সিংহের পরবর্ত্তী তাঁহার পুত্র কর্ণ ও পৌত্র জগৎসিংহ মিবার শাসন করেন। সম্রাট্‌দ্বয়ও ইঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিতেন।

জগৎসিংহের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর রাজসিংহ রাণা হন। এদিকে, বৃদ্ধ সম্রাট্ সাহজাহানকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

(২)

রূপনগর রাজস্থানের মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রভাবতী, রূপনগররাজ বিক্রম শোলাঙ্কির কন্যা। আক-বরের সময় হইতে মোগলসম্রাট্‌গণ সকলেই রাজপুত-রাজকন্যা বিবাহ করিতেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান উভয়েই রাজপুতনীবেগমের পুত্র। ঔরঙ্গজেবের প্রথমা ও প্রধানা

মহিষীও যোধপুরের এক রাজকন্যা ছিলেন। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও মোগল সম্রাট্‌গণের বিবাহে অরুচি ছিল না। রাজপুত্‌নী বা মুশলমানী কোন স্থানে কোন সুন্দরীর সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে তাঁহারা বিবাহ করিতে প্রয়াসী হইতেন। প্রভাবতীর রূপের খ্যাতি দিল্লীতে পৌঁছিল। সুতরাং বয়োবৃদ্ধ হইলেও সম্রাটের সাধ হইল তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বেগম হইবার জন্য অবিলম্বে দিল্লীতে প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়া ঔবঙ্গজেব রূপনগরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

মারবার অম্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজ্যের রাজাও মোগলের ঘরে কন্যা দিয়াছেন। ইঁহাদের তুলনায় রূপনগরের রাজা বিক্রম শোলাঙ্কি অতি সামান্য রাজা। সুতরাং ইহাতে তাঁহার বিশেষ অবমাননা নাই। মনে মনে কিছু ঘৃণা বোধ করিলেও, আপত্তি করিবার উপায় নাই। কারণ,—মোগলের ক্রোধানলে মুহূর্ত্তে রূপনগর ভস্মীভূত হইবে। বিক্রম দিল্লীতে কন্যা পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু প্রভাবতীর হৃদয় রাজপুতবালার মহত্ব ও তেজস্বিতায় পূর্ণ ছিল। হিন্দুর কন্যা হইয়া, পবিত্র রাজপুতকুলে জন্মিয়া, বিধর্ম্মী মোগলের বিলাসসম্ভোগের জন্য দেহ সমর্পণ করিবেন, এই চিন্তায় ও ঘৃণায় তাঁহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। দিল্লীশ্বরী হইবার প্রলোভনও বিন্দুমাত্রও এই ঘৃণা তাঁহার প্রাণ হইতে দূর করিতে পারিল না। মনে মনে তিনি সংকল্প করিলেন, পিতা যদি নিতান্তই তাঁর মনের দিকে না

চান, নিতান্তই যদি তাঁহাকে দিল্লী যাইতে বাধ্য করেন, তবে তিনি আগুনে ঝাঁপ দিবেন, বিষ খাইবেন, তবু মোগলের বিলাস-সঙ্গিনী হইবেন না।

নির্জ্জনে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভাবতী কহিলেন,—"বাবা, শেষে কি আমার এই গতি হইল? রাজপুত-বীরকুলজাত রাজপুতনীর দেহ লইয়া, রাজপুতনীর প্রাণ লইয়া কি মোগলের বিলাসের দাসী হইব? এ দেহের এই পবিত্র রাজপুত-শোণিত কি মোগলের সংস্পর্শে কলঙ্কিত করিব? রাজপুত-গরিমায় পূর্ণ এই প্রাণে মোগল-দাসীর হীনতা আনিব? দেবপূজার ফুল কি পিশাচের পায়ে দলিত করিব? প্রাণ থাকিতে কখনো তা পারিব না। বিধাতা যদি সত্যই আমাকে রূপ দিয়া থাকেন, এ রূপের ডালি মোগলের নারকীয় লালসায় বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।"—

"রাজপুত কন্যা রাজপুতবীরের সহধর্ম্মিণী হইবে; যদি তার ভাগ্যে তা না থাকে, তবে মরিবে।—তবু বিধর্ম্মী মোগলের পাশব লালসা পরিতৃপ্তির পাত্রী সে কখনো হইতে পারে না। আপনি রাজপুত বীর। রাজপুত বীর, কন্যার সহস্র মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু তার কুলমর্য্যাদা, ধর্ম্মমর্য্যাদার কোন ব্যাঘাত সে সহিতে পারে না। কোন্ প্রাণে আজ জীবিত কন্যাকে আপনি নরকে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? কোন্ প্রাণে আপনি ইহা সহিবেন? পিতা, আমাকে রক্ষা করুন। আমি হাসিতে হাসিতে চিতায় উঠিতে পারিব, কিন্তু দিল্লী যাইতে পারিব না।"

কন্যার কথাগুলি বিক্রম শোলাঙ্কির প্রাণে প্রাণে গিয়া বিঁধিল। কিন্তু উপায় নাই। রূপনগর রক্ষা করিতে হইলে কন্যাকে এ নরকে বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। একটু চিন্তা করিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া তিনি কহিলেন,—“মা, তোমার অপেক্ষা অনেক উচ্চবংশীয় উচ্চপদস্থা রাজপুত কন্যারা মোগলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তোমার ইহাতে এত ঘৃণা কেন মা? বিশেষ, তুমি দিল্লীশ্বরী হইতে যাইতেছ, দিল্লীশ্বরের প্রিয়তমা মহিষী হইবে, বিপুল ভারতসাম্রাজ্য তোমার ইঙ্গিতে, তোমার আদেশে, বসিবে উঠিবে। এ সম্মান, এ গৌরব, তোমার মত কয়জন বালিকার ভাগ্যে ঘটে? কেন ইহাতে এত ক্ষুব্ধ হইতেছ? যোধপুরের রাজকন্যা যে পদে আছেন, সামান্য রূপনগরের রাজকন্যার পক্ষে সে পদ, গৌরবের বই অগৌরবের নয়।”

ঘৃণার স্বরে প্রভাবতী উত্তর করিলেন,—“পিতা, মনে রাখিবেন আমি রাজপুত কন্যা—রাজপুতনী। সামান্য ক্ষেত্র-স্বামীর কন্যা হইলেও কোন রাজপুত-কন্যা অপেক্ষা, বংশে বা পদে আমি হীন হইতাম না। যে রাজপুত, হিন্দুর মর্য্যাদা, রাজপুতের মর্য্যাদা, সকল ভুলিয়া মোগলের ঘরে কন্যা দিতে পারে,—জগতে শ্রেষ্ঠ রাজপুতবীরের সহধর্ম্মিণীর যোগ্য যে রাজপুতনী বিধর্ম্মী মোগলের বিলাস-সঙ্গিনী হইতে পারে,—তাদের অপেক্ষা, দীনকুটীরের সামান্য রাজপুত গৃহস্থ, এবং রাজপুত গৃহলক্ষ্মীরূপিণী তাঁর কন্যা, পদমর্য্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ। অম্বর মারবার যতই বড় হউক, শক্তিতে অম্বররাজ ও

মারবাররাজ যত বড়ই হউন, বাহিরে কুলমর্য্যাদায় তাঁদের ঘরের কন্যারা যতই বড় হউন, যদি আপনি মোগলের ঘরে কন্যা দান না করেন, আপনার শোণিত যদি মোগল সংস্পর্শে কলঙ্কিত না করেন, যদি আপনার কন্যা আমি মোগলের দাসী না হই, তবে আমরা রাজপুতের রাজপুত গৌরবে, হিন্দুর হিন্দু গৌরবে তাঁহাদের অনেক উচ্চে থাকিব।

দিল্লীর সাম্রাজ্য আমি চাই না। সাম্রাজ্যের জন্য, ঐশ্বর্য্যের জন্য, ক্ষমতার জন্য, প্রকৃত রাজপুতনী কেহ ধর্ম্মবিক্রয় করিতে চায় না। রাজপুতনী রাজপুতের ধর্ম্মের সঙ্গিনী, গৃহের গৃহিণী, জীবনযাত্রার অংশভাগিনী। মোগলের বেগম তার বিলাসের দাসী মাত্র। মোগলকন্যা, তাতার কন্যা, তুর্কীকন্যা সেই বেগমরূপ যতই বাঞ্ছনীয় মনে করুক, রাজপুতকন্যা তার অপেক্ষা দীনহীন রাজপুতের কুটীরের গৃহিণীপদও অনেক বেসি গৌরবের বলিয়া মনে করে।"

ধীরে বিক্রম শোলাঙ্কি বলিলেন,—"মা, তোমার কথা সকলই বুঝি। এ বিবাহে আমারও কিছু মাত্র ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই। তোমাকে প্রবোধ দিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছিলাম। কিন্তু উপায় নাই। সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে রূপনগর ধ্বংস হইবে, তোমাকেও বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে।"

প্রভাবতী কহিলেন,—"রাজপুতনীকে বলপূর্ব্বক অধর্ম্মের পথে লইয়া যাইবে, এ সাধ্য দিল্লীশ্বর কেন, সমস্ত পৃথিবীর রাজারও নাই। রাজপুতনী মরিতে ভয় পায় না। আগুন,

বিষ বা তরবারি রাজপুতনীর চিরসহায়। এ সহায় সকল বিপদে রাজপুতনীকে রক্ষা করিয়াছে ও করিবে। মোগলের হাত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি আপনার নাই আমি জানি। আপনি অনুমতি করুন এখনই আমি চিতায় উঠিয়া—কি, বিষ খাইয়া রাজপুতনীর গৌরব রক্ষা করিব।"

পিতা কহিলেন,—"মা, রাজপুত পিতা ধর্ম্মরক্ষার্থ কন্যার মৃত্যুতে দুঃখিত হয় না। আজ মোগল তোমার ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইলে নিজের হাতে তোমাকে মৃত্যুর মুখে সঁপিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তুমি কুমারী, বাদসাহ বিবাহের জন্য তোমাকে চাহিতেছেন। রাজপুতে ও মোগলে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং অন্য কারণে এ বিবাহ যতই ঘৃণনীয় হউক, তোমার নারীধর্ম্মের অমর্য্যাদা ইহাতে হইবে না। তবু এ বিবাহে তোমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হইলে মৃত্যুতেও আমি আপত্তি করিতাম না। দুঃখময় জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল। কিন্তু, তুমি মরিলেও বাদসাহ আমাকে ক্ষমা করিবেন না। তিনি মনে করিবেন, তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিব না বলিয়াই কন্যাকে হত্যা করিয়াছি। তাঁর প্রবল প্রতিহিংসার মুখে রূপনগর থাকিবে না। রূপনগরের কল্যাণের জন্যই এ দুঃখ, এ অবমাননা, তোমাকে সহিতে হইবে। রূপনগরের রাজকন্যা হইয়া রূপনগরের সর্ব্বনাশ করিও না।"

প্রভাবতী আর কিছু কহিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, —"ভাল, তাহাই হউক, পিতা আমাকে দিল্লী পাঠাইয়া রূপনগর

রক্ষা করুন। দিল্লীর পথে বিষ খাইয়া আমি মরিব। মৃত্যু ছাড়া যখন উপায় নাই, তখন এখানে না মরিয়া না হয় দিল্লীর পথেই মরিলাম। তাতে যদি রূপনগর রক্ষা পায়, তবে ক্ষতি কি?" এই চিন্তা করিয়া প্রভাবতী পিতাকে কহিলেন,—"ভাল, তাই হউক। রূপনগরের মঙ্গলের জন্য সবই সহিব। আমাকে দিল্লী পাঠাইবার আয়োজন করুন।"

(৩)

নিজকক্ষে গিয়া প্রভাবতী অনেক কাঁদিলেন। দুঃখের শেষ সম্বল, বিপদের শেষ সহায়, নিরাশার শেষ আশা ভগবান্‌কে ডাকিয়া তিনি কহিলেন,—"পরমেশ্বর! রূপে যদি এই পরিণাম, কেন তবে এই রূপ আমাকে দিয়াছিলে? ফুল ফুটিতে যদি ঝরিয়া পড়িল, দেবপূজায় যদি তার ফুলের জন্ম সার্থক না হইল, কেন তবে তাহাকে ফুল করিয়া পাঠাইয়াছিলে! আমার এই প্রথম যৌবন, প্রাণে কত সাধ কত আশা, কিছুই পূরিল না। সকল সাধ, সকল বাসনা লইয়া প্রথম যৌবনেই এই সুখের পৃথিবী হইতে চলিলাম, কেন তবে বৃথা আসিয়াছিলাম? তোমার রাজ্যে কেন এ অত্যাচার, কেন এ অবিচার? কেন এ ক্ষুদ্র বালিকা আমি, পৃথিবীর এক কোণে নিজের ইচ্ছামত নিজের জীবনটি সার্থক করিতে পারিব না? কেন আমাকে, হয় পিশাচের লালসার আগুনে পড়িতে হইবে, না হয় নিজের হাতে এ সাধের জীবন অকালে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া

দিতে হইবে? যদি ধর্ম্ম রাখিয়া, রাজপুতনীর মর্য্যাদা রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তবে বাঁচিতেই চাই, দেব! দেব, যদি পথ থাকে, দীন বালিকার কাতর প্রার্থনা শোন! সে পথ আমাকে দেখাও!"

প্রভাবতীর প্রার্থনা বিশ্বরাজের চরণতলে পৌঁছিল। বিশ্বপতি পথ দেখাইলেন। ভাবিতে ভাবিতে প্রভার মনে হইল,—এ রাজস্থানে যদি কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারেন, তবে তিনি মিবারের রাণা রাজসিংহ। তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, রাজপুতবালার ধর্ম্মরক্ষা তিনি করিবেনই।

প্রভাবতী ভাবিলেন, "মহারাণা রাজসিংহের বীরত্বের খ্যাতি অনেক শুনিয়াছি। সংগ্রাম ও প্রতাপের যোগ্য বংশধর তিনি। আমাকে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি তাঁর হইবে, শক্তিও তাঁর আছে। এই উপলক্ষ্যে মোগলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হইবেই। সে যুদ্ধে রাজসিংহ মোগলকে পরাভূত করিয়া আবার অধীন রাজস্থানে স্বাধীনতার গৌরব আনিতে পারিবেন। তাঁর শরণাপন্ন আমি হই। সামান্য বালিকা আমি, যদি তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন, আমার আর কিছুই নাই—এই রূপ আর যৌবন তাঁর পায়ে সমর্পণ করিব। যদি ইহার কোন মূল্য থাকে, সেই দেবস্বরূপ বীরের পূজায়—তাহা সার্থক হইবে।"

প্রভাবতীর দারুণ দুঃখময় নিরাশ প্রাণে—সান্ত্বনা ও আশা আসিল। তিনি রাজসিংহের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া কোন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিলেন।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ও এই বিবাহে তাঁহার আপত্তির সমস্ত কারণ বিবৃত করিয়া—তিনি লিখিলেন,—"মহারাণা, সামান্য বালিকা হইলেও আমি রাজপুতকন্যা। আপনি রাজপুতের কুলের গৌরব, মিবারের রাণা। ধর্ম্মরক্ষার জন্য, রাজপুতকুলের গৌরব রক্ষার জন্য, রাজপুতবালা আপনার আশ্রয় প্রার্থিনী। মিবারের রাণা কি এ বিপদে তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিবেন না? যে মিবারের রাণাকুল চিরদিন রাজপুতের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আজ কি সেই রাণাবংশধর হইয়া, রাণার সিংহাসনে বসিয়া আপনি রাজপুতবালার এই অসম্মান নীরবে চক্ষে দেখিবেন? রাজপুতবালার পক্ষে যার উপর বিপদ আর হইতে পারে না, সেই বিপদে রাজপুতবালা আমি আজ আপনার আশ্রয়প্রার্থিনী। রাজপুতশ্রেষ্ঠ মিবারের রাণার অসিও কি তার রক্ষার জন্য কোষমুক্ত হইবে না? রাজপুতের গৌরবরক্ষক মিবারের রাণা জীবিত থাকিতে রাজপুতকুলের কুমারী কি বিধর্ম্মীর উপভোগ্য হইবে? কোমলাঙ্গী পদ্মিনী কি মণ্ডুকের গৃহবাসিনী হইবে? রাজহংসী কি বকের সহচরী হইবে? মহারাজ, দুরাচার মোগলের কবল হইতে যদি আপনি আমাকে রক্ষা না করেন, মিবারের রাণা হইয়া যদি আপনি আর্য্যকুলের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আত্মহত্যা করিয়া আনি আপন ধর্ম্মরক্ষা করিব;—মিবারের রাজ অসি আজ যদি কোষমুক্ত না হয়, আর কখনো হইবে না। চিরদিন কোষ মধ্যেই কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে।—"

রাজসিংহ যথাসময়ে পত্র পাইলেন।

মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব অতি চতুর এবং শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তথাপি নানা কূট বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া তিনি দেশের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রাজপুত জাতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই সময় রাজপুতবালার এ প্রার্থনা রাজসিংহ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সৈন্য সহ তিনি রূপনগরের বাহিরের কোন পার্ব্বত্য পথে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(৪)

পত্র প্রেরণ করিয়া, প্রভাবতী আজ দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। রূপনগর হইতে আজ শেষ বিদায়,—সমুদায় রাজপুতভূমি হইতে আজ শেষ বিদায়,—বুঝি পৃথিবী হইতে আজ শেষ বিদায়!

——কেবল শেষ আশা—ভগবান্। প্রভাবতীর অন্তর-ভরা রাজপুতকুলগরিমা, আর, মনোমন্দির মধ্যে—পূজ্য বীর রাণা রাজসিংহ!

নিঃশ্বাস রোধ করিয়া প্রভাবতী চলিলেন।

সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে, যেখানে রাজসিংহ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, মোগলসৈন্য প্রভাবতীকে লইয়া ক্রমে সেই পথে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ রাজসিংহ, প্রবলবেগে সহসা মোগলবাহিনী আক্রমণ করিলেন। মোগল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

পলায়ন করিল। প্রভাবতীকে লইয়া রাজসিংহ বিজয়গৌরবে উদয়পুরে ফিরিয়া গেলেন।

সংবাদ ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছিল। অনতিবিলম্বে সম্রাটের সহিত রাজার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

এই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব পরাস্ত হন। সমর, সংগ্রাম, প্রতাপের মত, রাজস্থানের মহাপ্রাণ বীর ভারত-গৌরব রাজসিংহ, অতুল বিক্রমে জয়লাভ করিলেন।

জয় শেষে, যদিও রাণা রাজসিংহ তখন পরিণতবয়স্ক, তথাপি আপন প্রতিজ্ঞামত প্রভাবতী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

—যশোবন্ত-মহিষী—

রাণী বিন্দুমতী।

(আমরা এই কল্পিত নাম ব্যবহার করিলাম।)

(১)

রাণা রাজসিংহের সহিত মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবার আরও একটি কারণ ছিলেন,—মারবার-রাজ যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী—রাণী বিন্দুমতী।

ইনি মিবারের রাণাবংশীয়া কন্যা। রাণাবংশের মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা পূর্ণভাবে ইঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল।

যশোবন্তসিংহ প্রথম বয়স হইতেই ঔরঙ্গজেবের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। সম্রাট্ সাহজাহানের, দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ এই চারি পুত্র ছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল রাজ্যেই এইরূপ নিয়ম আছে, যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হন। কিন্তু মোগল বাদসাহদের আমলে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কাজেই কোন সম্রাটের মৃত্যু হইলেই তাঁহার পুত্রদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইত। যে ভ্রাতা অন্য সকলকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন নিতে পারিতেন, তিনিই সম্রাট্ হইতেন।

সম্রাট্ সাহজাহানের পুত্রগণ পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিলেন না। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহারা যুদ্ধ

আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধে অন্য সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যখন তাঁহার ভ্রাতাদের যুদ্ধ হয়, যশোবন্তসিংহ তখন ঔরঙ্গ-জেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার প্রধান সহায় ছিলেন। বস্তুতঃ সাহস, বীর্য্য, বুদ্ধি, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সর্ব্ব বিষয়েই যশো-বন্তসিংহ বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। হিন্দু মুশলমান সকল রাজপুরুষই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

যিনি যেমন বীর, যেমন সেনাপতিই হউক না, যুদ্ধে জয় পরাজয় দুইই ঘটে। কোন এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যশোবন্তসিংহ নিজ রাজধানী যোধপুরে আসিলেন।

তেজস্বিনী রাণী ইহাতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইলেন। তিনি একে রাজপুতরমণী, তায় মিবারের রাণাকুলে জন্মিয়াছেন। রাজপুতরমণী পুরুষের সকল দোষ মার্জ্জনা করিতে পারেন কিন্তু কোনরূপ ভীরুতা বা কাপুরুষতা মার্জ্জনা করিতে পারেন না। স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, বড় স্নেহের, বড় ভালবাসার, বড় আদরের ধন। যে কেহই হউক না, রাজপুতরমণী চায়, এমন প্রাণের যাঁরা আকাঙ্ক্ষ্য, তাঁহারা যুদ্ধে মরিবেন, তবু পরাজিত হইয়া যেন গৃহে ফিরেন না। প্রাণাধিক পুত্র, প্রিয়তম স্বামী, স্নেহের ভ্রাতা, ইঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মৃতদেহ দেখিয়া রাজ-পুতরমণী বিশেষ দুঃখিত হন না, কিন্তু পরাজিত ও গৃহে প্রত্যাগত তাঁহাদিগকে দেখিলে তাঁহারা ঘৃণায় মরিয়া যান, জীবনকে ধিক্কার দেন।

যশোবন্তসিংহ যোধপুরে পৌঁছিবামাত্র, রাণী, দুর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বামীকে সংবাদ দিলেন,—“আমার স্বামী যশোবন্তসিংহ কখনো যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৃহে ফিরিবার পাত্র নহেন। তিনি হয় বিজয় গৌরবে গৃহে ফিরিবেন, না হয় রণক্ষেত্রে শত্রুর অসিতে দেহপাত করিবেন। যিনি দুর্গদ্বারে উপস্থিত, তিনি যশোবন্তসিংহ নহেন; অন্য কেহ ছলে দুর্গ-প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন। যশোবন্তের অনুপস্থিতিতে এ দুর্গের অধিকারিণী আমি। যশোবন্তের নাম ধরিয়া, যশোবন্তের রূপ লইয়া যে প্রতারক দুর্গে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, তাহাকে আমি দুর্গে প্রবেশ করিতে দিব না।”

তেজস্বিনী পত্নীর এই তিরস্কারে যশোবন্ত যার-পর-নাই লজ্জিত হইলেন। পত্নীর উপর রুষ্ট হইলেন না; মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন,—“আমি যুদ্ধে ক্লান্ত, কিছুকাল দুর্গে বিশ্রাম করিয়া আবার যুদ্ধে যাইব! জয়লাভ না করিয়া আর ফিরিব না।”

রাণী দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন। কিন্তু, স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। যশোবন্ত অল্পকাল দুর্গে বিশ্রাম করিয়া আবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

যুদ্ধের শেষে যখন ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন, যশোবন্ত সিংহকে তাঁহারই অধীন হইতে হইল। যোগ্য বলিয়া ঔরঙ্গজেবও তাঁহাকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন

(২)

বিশেষ শক্তি ও প্রতিভাশালী কর্ম্মচারী পাইলে সকল রাজাই আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। রাজ্য-রক্ষণ ও রাজ্যশাসনে এইরূপ কর্ম্মচারীর সহায়তা সর্ব্বথা প্রয়োজন। কোন রাজাই এইরূপ কর্ম্মচারী সহজে হারাইতে চান না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের বুদ্ধি ও প্রকৃতি এ বিষয়ে একেবারে বিপরীত রকমের ছিল। তিনি পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর মধ্যে বিশেষ কোনো শক্তি বা প্রতিভার বিকাশ দেখিলে তাঁহার যারপর নাই ভয় ও ঈর্ষ্যা হইত। তিনি মনে করিতেন, এ ব্যক্তি কবে আমার সিংহাসন কাড়িয়া লইবে!

প্রবল শক্তিশালী যশোবন্তসিংহের উপর বাদসাহের মনোভাব এই প্রকার হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে শত্রুতা সাধন করিবার সাহস নাই। কৌশলে ও গোপনে যশোবন্তকে সবংশে নিধন করিতে যশোবন্তের প্রভু ভারত সম্রাট্ দৃঢ়সংকল্প হইলেন। যেখানে শত্রু প্রবল, যুদ্ধ কঠিন, সেইখানেই ঔরঙ্গজেব যশোবন্তকে পাঠাইতেন। কিন্তু যশোবন্ত মরেন না, জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন!

বাদসাহ রুদ্ধরোষে উন্মত্তের প্রায় হইলেন। অবশেষে কাবুল প্রদেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল। যশোবন্ত কাবুলে প্রেরিত হইলেন। এই অবসরে কৌশলে ঔরঙ্গজেব যশোবন্তের জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথ্বিসিংহকে হত্যা করিলেন।

কথিত আছে, আদর করিয়া বাদসাহ পৃথ্বিসিংহকে একটি পোষাক উপহার দেন। পোষাক পরিয়া গৃহে ফিরিয়াই পৃথ্বিসিংহের সমস্ত শরীর যেন জ্বলিয়া উঠিল। দারুণ জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে রাজপুত্র ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পোষাক বিষাক্ত ছিল।

ইহার অল্প পরেই যশোবন্তের অন্য পুত্রগণের মৃত্যু হইল। পুত্রশোকে ভগ্নহৃদয়ে যশোবন্ত সুদূর কাবুলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অন্যান্য রাণীরা সহমৃতা বা অনুমৃতা হইলেন। কিন্তু বিন্দুমতী তখন সাতমাস গর্ব্ভবতী। যশোবন্তের একমাত্র বংশধর তাঁহার গর্ব্ভে, সুতরাং তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইতে পারিলেন না।

(৩)

দুর্গাদাস নামে এক প্রসিদ্ধ রাঠোর বীর যশোবন্তের অনুচর ছিলেন। বিধবা বিন্দুমতী ও নবজাত শিশুকে লইয়া দুর্গাদাস দিল্লীতে আসিলেন।

এই ক্ষুদ্র শিশুটীও বাঁচে, সম্রাটের এমন অভিপ্রায় ছিল না। দুর্গাদাস বিন্দুমতী ও শিশু অজিতকে লইয়া যোধপুরে যাইবার উদ্যোগ করিলে, ঔরঙ্গজেব তাহার বাদী হইলেন।

সম্রাটের বাধা সত্ত্বেও দুর্গাদাস দিল্লী পরিত্যাগের উদ্যোগ

করিলেন। সম্রাটের সৈন্য যশোবন্তের প্রাসাদ আক্রমণ করিল।

বিন্দুমতী কহিলেন,—"দুর্গাদাস! স্বামীর মৃত্যুতে জীবন রাখিয়াছি। আজ এ বিপদেও জীবন রাখিতে হইবে। স্বামীর একমাত্র বংশধর এই শিশু, ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। ইহার জীবনের জন্য, ইহাকে মানুষ করিবার জন্য, এই বিশ্বাসঘাতকতা ও এই অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য, আমাকেও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। পারিবে কি দুর্গাদাস? যশোবন্তের মহিষী, যশোবন্তের পুত্র, ইহাদের প্রাণ রাখিতে, সম্মান রাখিতে পারিবে?

—মহাবীর যশোবন্তের বংশ আততায়ীর হস্তে পৃথিবী হইতে একেবারে নির্ম্মূল হইবে, ইহা সহ্য করিতে পারিব না। যদি আর কোথাও স্বামীর একটিমাত্র পুত্রও থাকিত, কিছুমাত্র চিন্তা করিতাম না। আজ হাসিতে হাসিতে শিশুকে নিজহস্তে মৃত্যু-মুখে ডালি দিয়া স্বামীর গৌরব রক্ষা করিতাম, তবু বিশ্বাসঘাতক শত্রুর হস্তে তাহাকে সঁপিয়া দিতাম না।"

দুর্গাদাস কহিলেন,—"মা, ভয় নাই, প্রাণপণে তোমাকে আর এই শিশুকে রক্ষা করিব। পুরনারী সকলকে লইয়া পলায়ন সম্ভব হইবে না। তাঁহাদিগকে, সম্মান রক্ষার জন্য, আজ, মরিতে হইবে। কিন্তু তোমাকে আর অজিতকে লইয়া আজ এই মোগল ব্যূহ ভেদ করিয়া যাইব। কিন্তু মা, সাহস রাখিও। হাতের অসি ছাড়িও না, যদি না পারি, যদি তোমার মোগলের

হাতে পড়িবার সম্ভাবনা দেখ, নিজের হাতে, অজিতকে কাটিয়া সেই অসি নিজের বুকে বসাইও।"

বিন্দুমতী কহিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা করিও না দুর্গাদাস। রাজপুত রমণী অসি ধরিতে জানে, সে অসিতে প্রয়োজন হইলে নিজপুত্রের মাথা কাটিতে, নিজের বুকে বিঁধাইতেও সে পারে। আমি যশোবন্তের মহিষী। তাঁর একমাত্র বংশধর আজ আমার হাতে। প্রাণ থাকিতে তাকে এমন অত্যাচারী শত্রুর হাতে দিব না, নিজেও সে শত্রুর করগত হইব না।"

রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে রাশি রাশি বারুদ বোঝাই করা হইল। পুরনারীরা সকলে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। একজন সেই বারুদে আগুন ধরাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে রাজপুত-সতীরা ধর্ম্ম লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আড়াই শত মাত্র অনুচর সহ বিন্দুমতী ও অজিতকে লইয়া দুর্গাদাস মোগল সৈন্যের ব্যূহভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দুর্গাদাসের সঙ্গে রাণী ও অজিত মিবারে আসিয়া রাণা রাজসিংহের শরণাপন্ন হইলেন।

রাণা তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া উদয়পুরে থাকিতে কহিলেন।

কিন্তু বিন্দুমতী কহিলেন,—"মহারাণা! অজিত এখন আপনার আশ্রয় পাইল। ইহার সম্বন্ধে আমি এখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রভাবতীকে উদ্ধার করিয়া, আমাদের আশ্রয় দিয়া, আপনি মোগল সম্রাটের হৃদয়ে যে ঘোর প্রতিহিংসার আগুন

জ্বালাইয়াছেন,তাহা সহজে নিভিবে না। মোগল তা'র সমগ্র শক্তি লইয়া এ আগুনে রাজস্থান পোড়াইয়া ছারখার করিতে চেষ্টা করিবে। রাজস্থানের এমন বিপদে মিবারের রাজকন্যা যশোবন্ত-সিংহের মহিষী আমি কি উদয়পুর-দুর্গে নিশ্চিন্ত নিরাপদে শিশু কোলে করিয়া দিন কাটাইতে পারি? এতদিন স্বামীর একমাত্র বংশধর এই শিশুর জীবন রক্ষাই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। আজ সে কর্ত্তব্যের শেষ হইয়াছে। অজিতকে আপনার হাতে দিয়াছি, সে এখন নিরাপদ। আগত প্রায় ভীষণ মোগল সংঘর্ষে রাজপুতের জাতীয় শক্তি রক্ষা করাই এখন প্রত্যেক রাজপুতপুরুষ ও রাজপুত রমণীর জীবনের সর্ব্ব-প্রধান ব্রত। সেই ব্রত পালন করিতে আমি চলিলাম। আমি মারবারে প্রজাবৃন্দকে উত্তেজিত করিয়া আপনার সহায়তায় নিয়োজিত করিব। তারপর অন্যান্য রাজপুত রাজগণের নিকট গিয়া তাঁহারাও যাহাতে রাজস্থানের এই বিপদে আত্মকলহ ও মোগলভয় সব ভুলিয়া প্রকৃত রাজপুত সন্তানের ন্যায় রাজস্থানের শক্তি ও গৌরব রাখিতে আপনার সহায়তায় সকলে মিলিত হন, তার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিব। আপনার পদধূলি আমায় দিন; আশীর্ব্বাদ করুন, যে সাধনায় চলিলাম তাহাতে যেন সিদ্ধিলাভ করিতে পারি।"

রাজসিংহ কহিলেন,—"যাও মা, ভগবান্ একলিঙ্গ তোমার সহায় হউন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর। রাণাবংশের যোগ্য কন্যা তুমি।

অজিতের জন্য তোমার কোন ভয় নাই। উদয়পুরের গড়ে একখানা পাথর থাকিতেও অজিতের কোন বিপদ হইবে না।”

বিন্দুমতী চলিয়া গেলেন। তেজস্বিনী রাণীর উত্তেজনায় মারবার জাগিল। অন্যান্য অনেক রাজপুত রাজারাও রাজসিংহের সহায়তায় আসিলেন।

(৪)

সাহাজাদা আকবর ও সেনাপতি দিলীর খাঁ বিপুল সৈন্য লইয়া রাজস্থান আক্রমণ করিয়াছেন।

রাজসিংহ, তাঁহার বীর পুত্রদ্বয় ভীমসিংহ ও জয়সিংহ, এবং দুর্গাদাস, বহু রাজপুত সৈন্য লইয়া মোগলের গতি অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুতের বীরত্বে ও রণকৌশলে মোগল সৈন্য ধ্বংস হইল। সাহাজাদা সপরিবারে রাজপুতের হস্তে বন্দী হইলেন।

ঔরঙ্গজেব আবার সৈন্য পাঠাইলেন। বহুদিন ক্রমাগত যুদ্ধ হইতে লাগিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, স্বয়ং বাদসাহ একবার কোন গিরিপথে সসৈন্যে আবদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হন এবং বাদসাহের প্রিয়তমা মহিষী রাজপুতের হস্তে পতিত হন। কিন্তু বিপন্ন শত্রুর প্রতি রাজপুত চিরদিন উদার ও দয়ালু। দয়া করিয়া রাজপুত, রাজপুতের চিরশত্রু ঔরঙ্গজেবকে আহার্য্য পাঠাইয়া দেন এবং শেষে মুক্তি দেন। বেগমকেও, সসম্মানে রাজসিংহ, স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেন।

কৃষ্ণকুমারী।

(১)

মিবার, রাজপুত শক্তির মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। ক্রমাগত পাঁচ ছয় শত বৎসর ধরিয়া পাঠান ও মোগলের সঙ্গে অবিরত সংঘর্ষে, ক্রমে এই মেরুদণ্ড জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রদীপ যেমন নিভিবার আগে একবার বড় বেসি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলে, মরিবার আগে জীবদেহে যেমন জীবনী শক্তির প্রবল বিকাশের লক্ষণ দেখা যায়, তেমনি রাজসিংহের সময় এই মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া শেষ একবার রাজস্থান অপূর্ব্ব শক্তি বিকাশে ভারত স্তম্ভিত করিয়াছিল। কিন্তু সেই বিকাশের মধ্যেই, মেরুদণ্ড মিবার, যেন, একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজপুত জাতিও চিরদিনের মত একেবারে ধরালুণ্ঠিত হইল।

এই সময় নবোত্থিত প্রবল মারাঠা জাতি ভারত ব্যাপিয়া আপনার শক্তি বিস্তার করিতেছিল। মারাঠা শক্তির প্রবল বন্যা ভারতের হিন্দু মুশলমান সকল ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

ভারতের চির দুর্ভাগ্য, হিন্দু কখনো ভারতময় এক জাতীয়ত্বের স্পন্দন অনুভব করে নাই। প্রাচীন ভারতে কুরু শক্তি ছিল, পাঞ্চাল শক্তি ছিল,—কাশী, কোশল প্রভৃতি

সহস্র শক্তি ছিল, কিন্তু একত্র হিন্দু শক্তি কখনো ছিল না। হিন্দু-বিরোধী মুশলমান শক্তি যখন ভারত আচ্ছন্ন করিল, তখনো সেই শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুত শক্তি উঠিল, মারাঠা শক্তি উঠিল, শিখ শক্তি উঠিল, উত্তর দক্ষিণ ভারতে আরও কত ক্ষুদ্রতর শক্তি উঠিল, কিন্তু সমগ্রভারতে এক হিন্দুশক্তি কখনো উঠিল না। রাজপুত বড় ছিল রাজপুত বলিয়া, মারাঠা বড় হইল মারাঠা বলিয়া, শিখ বড় হইল শিখ বলিয়া; কিন্তু রাজপুত, মারাঠা ও শিখ কখনো মিলিল না।—ভারতীয় হিন্দু বলিয়া একে অপরকে আলিঙ্গন করিল না। আত্ম-বিরোধে, আত্ম-বিচ্ছেদে, দুর্ব্বল হইয়া, সকলে একে একে বিদেশী ইংরেজের অতুল শক্তিময় রাজসিংহাসনতলে লুটাইল।

ক্রমাগত মুশলমান-সংঘর্ষে ভগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও, মারাঠা যদি, হিন্দু বলিয়া, ভাই বলিয়া, রাজপুতের হাত ধরিত, —আপনার প্রথম-জীবনের নূতন শক্তিতে যদি জীর্ণ বৃদ্ধ রাজপুতের প্রাণ সঞ্জীবিত করিত, শিখ যদি উত্তর হইতে আসিয়া রাজপুতের আর এক হাত ধরিত,—তিন ভাই যদি এমনি হাতে হাত ধরিয়া মিলিত,—হিন্দু শক্তি আজ ভারতে অটল হইয়া জগৎময় হিন্দুর গৌরব বিস্তার করিত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। তিন ভাই মিলিল না। শিখ নিজের ঘরে বসিয়া নিজের ঘর সাজাইতেই মন দিল, বাহিরের দিকে চাহিল না। মারাঠা আসিয়া রাজপুতের শীর্ণ দেহে আঘাত করিল। এ আঘাত রাজপুত আর সহিতে

পারিল না। একে একে রাজপুতরাজগণ ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রাজপুত জাতির এই হীনতা, দুর্ব্বলতা, বিড়ম্বনার দিনে, একটি রাজপুত-যুবতী অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনে রাজপুত মহত্ত্বের শেষ দৃষ্টান্ত রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় নিলেন। এই যুবতী—মিবারের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী।

(২)

কৃষ্ণকুমারী পরম রূপবতী ছিলেন। রূপবতী বলিয়া লোকে ইঁহাকে "রাজস্থান-কুসুম" বলিত। রাজপুতরমণীর রূপ চিরদিনই রাজপুত জাতির সহস্র বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে; কৃষ্ণকুমারীর রূপও মিবারে তুমুল বিপ্লব আনিয়া উপস্থিত করিল।

মারবারের রাজার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে, জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের সঙ্গে, ভীমসিংহ, কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। তখন মারবারের নূতন রাজা মানসিংহ, বলিয়া পাঠাইলেন, মারবারের ভূতপূর্ব্ব রাজার উত্তরাধিকারী স্বরূপ তিনিই কৃষ্ণকুমারীকে পাইবার অধিকারী।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, এই সময়ে মারাঠাশক্তি ভারতে সর্ব্বপ্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। উড়িষ্যা হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র মধ্যভারত এবং গুজরাটের দক্ষিণ হইতে বরাবর বর্ত্তমান বোম্বে প্রদেশ মারাঠা জাতির শাসনাধীনে ছিল।

ইহা ছাড়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষই মারাঠারা ইচ্ছামত লুণ্ঠন করিত, অথবা, রাজা, নবাব, ও শাসনকর্ত্তাদের নিকট হইতে কর আদায় করিত। মারাঠা সাম্রাজ্য আবার এই সময়ে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সকলের পূর্ব্বে নাগপুরে ভোঁসলা রাজা, তারপর ক্রমে পশ্চিমে গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়া রাজা, ইন্দোরে হোলকার রাজা এবং বরোদায় গুইকোঁয়ার রাজা, রাজত্ব করিতেন। বরোদার দক্ষিণে পুণায় পেশোয়া রাজার রাজধানী ছিল। মাবাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজির বংশধরেরা অতি হীন ভাবে সেতারা ও কোলাপুরে পেশোয়ার অধীন ক্ষুদ্র ভূস্বামীর ন্যায় বাস করিতেন।

এই সব মারাঠা রাজারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় অনেক সময় রাজপুতানাও আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেন। ইঁহাদের পরাক্রমে রাজপুত রাজারা বিশেষ শঙ্কিত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মারাঠা-রাজ সিন্ধিয়ার সঙ্গে জয়পুররাজ জগৎসিংহের বিশেষ শত্রুতা ছিল। তিনি যে 'রাজস্থানকুসুম' কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করিবেন, ইহা সিন্ধিয়ার সহ্য হইল না। তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, জগৎসিংহের পরিবর্ত্তে মানসিংহকে যেন তিনি কন্যাদান করেন।

(৩)

রাণা ইহাতে সম্মত হইলেন না। তখন সিন্ধিয়া বহু সৈন্য সহ মিবার আক্রমণ করিলেন। মিবারের আর সে দিন নাই,

রাণার আর সে বিক্রম নাই। ভীমসিংহ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সিন্ধিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; জয়পুরের দূতগণকে বিদায় করিয়া দিলেন।

জগৎসিংহই বা এ অপমান সহিবেন কেন? তিনিও বহু সৈন্য লইয়া মিবার আক্রমণ করিলেন। এ দিকে মানসিংহও তাঁর সৈন্য লইয়া আসিলেন।

সিন্ধিয়া মানসিংহের সহায়। জগৎসিংহও বিপক্ষের সমকক্ষ হইবার জন্য আমীর খাঁ নামক রাজস্থানের এক দুর্দ্দান্ত পাঠান সর্দ্দারের সহায়তা অবলম্বন করিলেন। মিবারময় তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইল।

মিবারপতি দুর্ব্বল। বিদেশী রাজগণ তাঁহাদের সৈন্য লইয়া মিবার বিধ্বস্ত করিতেছেন, তাঁর সাধ্য নাই—ইহার কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে পারেন। ক্রমে পাঠান আমীর খাঁ, রাণার প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠিল। সে রাণাকে পরামর্শ দিল, কৃষ্ণকুমারীকে লইয়াই যখন মিবারের এ বিপদ, তখন তার মৃত্যু ভিন্ন এ বিপদ দূর হইবে না। কৃষ্ণকুমারী যাঁহাকেই বিবাহ করুন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিহিংসাবশে মিবারকে এইরূপ বিধ্বস্ত করিতে থাকিবে। অতএব রাণা কন্যার প্রাণবধ করিয়া মিবারে শান্তি বিধান করুন।

নিরুপায় রাণা, অগত্যা এই হীন ও নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রাণার ভ্রাতা যৌবনদাস গোপনে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা

করিবার জন্য তরবারি হস্তে তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নিদ্রিত কৃষ্ণার সরল ও সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ গলিয়া গেল, হাতের তরবারি খসিয়া পড়িল; তিনি কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

(৪)

ক্রমে গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হইল। এই ষড়যন্ত্রের কথা অন্তঃপুরে পৌঁছিল। শোকে দুঃখে ও ক্রোধে অধীর হইয়া কৃষ্ণকুমারীর মাতা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য পুরনারীরা কেহ মহিষীকে ধরিয়া, কেহ কৃষ্ণাকে ধরিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নিজে একটুও বিচলিত হইলেন না। সকলের এত কান্না দেখিয়া, তাঁহার হাসি পাইল। হাসিয়া, তাহার পর ঘৃণা, বিরক্তি এবং তেজোব্যঞ্জক স্বরে তিনি পুরনারী-দিগকে কহিলেন,—"ছি, তোমরা কি রাজপুতের মেয়ে নও? দেশরক্ষার জন্য একটা ছার মেয়েকে মরিতে হইবে, এর জন্য এত কান্না? রাজপুতের আজ সে শক্তি সে গৌরব নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়াই কি রাজপুত এমনই হীন হইয়াছে যে, একটা রাজপুতের মেয়ে দেশের জন্য হাসিতে হাসিতে মরিতে পারিবে না, আর, আর সকলে হাসিতে হাসিতে সে মরণ দেখিতে পারিবে না? আজ যদি কোন বিধর্ম্মী শত্রু উদয়পুর জয় করিত, আমাদের সকলকেই যে এখনই আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইত।

সে মরণের কাছে আমার একার এ মরণ ত কিছুই নয়। ছি ছি ছি, তোমরা আর কাঁদিও না, তোমাদের কান্না দেখিয়া, তোমাদের উপর, আমার মনে সহস্র ধিক্কার উঠিতেছে। রাজপুতের আজ এই দুর্ব্বলতার দিনে, হীনতার দীনে, রাজপুতের মেয়ে তোমরা অন্ততঃ একটু বল—একটু মহত্ত্ব দেখাও। আজ মিবারের সম্মান রাখিতে মিবারের একটি বীর যদি না মরিতে পারিল, রাণা বংশের কন্যা আমাকে অন্ততঃ হাসিমুখে মরিয়া মিবারের মান রাখিতে দাও; হাসিমুখে আমার সে সাধের মরণ দেখিয়া তোমরা অন্ততঃ মিবারের মান রাখ।"

পুরনারীরা লজ্জিত হইয়া চুপ করিলেন। তখন কৃষ্ণকুমারী মাতার নিকট গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"মা, তুমি উচ্চবংশে জন্মিয়াছ। বীরশ্রেষ্ঠ রাণাবংশের বধূ হইয়া উদয়পুরে আসিয়াছ। আমিও সেই রাণাবংশে তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি। দেশ রক্ষার জন্য যে মরণ, সে মরণে জীবন ধন্য হয়, জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াও প্রথম বয়সেও যে মরণ কাঁচ ফেলিয়া কৌস্তুভ মণির মত মাথায় তুলিয়া নিতে ইচ্ছা হয়, সেই মরণে কি আমি ভয় পাইব, না, কাতর হইব? মেয়ের এমন মরণে, মা তুমিও কি কাতর হইবে? অসার ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়া কে না দেশ রক্ষা করিতে চায়? জীবনে ছার বিষয়ভোগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া, অক্ষয় স্বর্গ ও অনন্তকীর্ত্তি কে না লাভ করিতে চায়? এ মরণে আজ আমার দুঃখের বা দুর্ভাগ্যের কিছুই নাই,—এ যে, পরম সুখ, পরম

সৌভাগ্যের কারণ। যে রাজপুতের মেয়ে নিজের মান রাখিবার জন্য চিরদিন হাসিতে হাসিতে চিতায় উঠিয়াছে, মেয়েকে হাসিতে হাসিতে নিজের হাতে সাজাইয়া চিতায় তুলিয়া দিয়াছে, সেই রাজপুতের মেয়ে হইয়া, রাজপুত মেয়ের মা হইয়া, আজ তোমার মেয়ের এমন গৌরবের মরণে এত কাতর হইতেছ? ছি, মা! আর কাঁদিও না, ধৈর্য্য ধর, রাজপুত্‌নীর বল দেখাও। মিবারের মহিষী তুমি, মিবারমহিষীর ন্যায় সতেজে সগর্ব্বে মিবার রক্ষার জন্য নিজের কন্যাকে উৎসর্গ কর।”

(৫)

কৃষ্ণার কথায় রাণী উঠিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। কহিলেন,—“মা, আমি কি সাধে কাঁদি মা? কৃষ্ণা, মিবারের এই বিপদে আজ মিবার রাখিতে একটি বীর অসি ধরিল না, একটি বীর একবিন্দু শোণিত পাত করিল না, অনায়াসে কোমল বালিকা তুই, তোকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইল! এ দুঃখ যে রাখিবার স্থান নাই কৃষ্ণা! আজ আগের মত যদি রাণার শোণিতে—মিবারের বীরগণের শোণিতে মিবার সিক্ত হইতে দেখিতাম, আজ যদি মিবার ভরিয়া মিবারবীরগণের অস্ত্রে ঝন্‌ঝনা, বীরকণ্ঠে হুঙ্কার শুনিতাম, প্রাণ নাচিয়া উঠিত, হৃদয়ে শক্তি আসিত, তোকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে আমিও চিতায় উঠিতে পারিতাম। মিবারের রাজপুরুষগণ আজ সকলে আপনা বাঁচাইতে, কোমল

কলিকা কৃষ্ণা! তোকে অকালে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিতেছে, প্রাণে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব কৃষ্ণা?"

এ কথায় কৃষ্ণার চক্ষেও জল আসিল। তিনি কহিলেন,—"মা, ও কথা আর মনে করিয়া, যাইবার সময় প্রাণে ব্যথা দিও না। মিবার ডুবিয়াছে, আর বুঝি উঠিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া মিবার-রমণী আমরা মিবারকে যেটুকু তুলিতে পারি, তাই বা ছাড়িব কেন? মিবার আপন বীরের নামেও যেমন, বীরাঙ্গনার নামেও তেমনি ধন্য। মিবারের বীর বীরধর্ম্ম ভুলিয়াছে বলিয়া, বীরাঙ্গনা আমরা কেন সে ধর্ম্ম ভুলিব? কে জানে মা, বীরাঙ্গনার বীরধর্ম্মে আবার মৃত মিবার জাগিবে না? মৃত্যুকালে জগদীশ্বরের নিকট আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুতে মিবারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক, আমার মৃত্যুসংবাদ মিবারবাসীর প্রাণে আঘাত করিয়া নূতন বীরধর্ম্মে—নূতন মহাপ্রাণতায় সকলকে জাগাইয়া তুলুক।"

রাণার নিকট সংবাদ গেল,—আগুনে হউক, বিষে হউক; তরবারির আঘাতে হউক,—যে বিধান স্থির হয়, কৃষ্ণকুমারী তাহাতেই মরিতে প্রস্তুত।

কেহ কোন শব্দ করিলেন না। বিষ প্রেরিত হইল।

বিষ আসিল। কৃষ্ণা, ঊর্দ্ধনয়নে যুক্তকরে, আপনার মনস্কামনা জগদীশ্বরের পদে নিবেদন করিয়া অম্লান বদনে বিষ পান করিলেন।

বিষে কৃষ্ণার কিছুই হইল না।

তখন আর এক পাত্র বিষ আসিল। কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল। মৃত্যু নিজে যেন, দেবতাতীত মহাপ্রাণতায় অমন উজ্জ্বল দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যরাশির উপর নিজের কাল ছায়া ঢালিতে ভয় পাইল!

কিন্তু মিবাররাজ ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গের প্রতিজ্ঞা অটল। এবার কুসুম্ভ রস নামে অতি তীব্র এক বিষ প্রস্তুত হইল। রাণার কাছে এত বল পাইয়া মৃত্যুর সাহস বাড়িল। দেখিতে দেখিতে, ফুটন্ত ঢল ঢল কৃষ্ণাকুসুমকে করাল হাতে তুলিয়া নিয়া, মৃত্যু আপনার আঁধার রাজ্যে দিব্য জ্যোতিঃ ফুটাইল।

কর্ম্মদেবী।

(৩)

(১)

রাজস্থানের উত্তর ও পশ্চিমভাগ মরুময়। এই মরুময় প্রদেশের স্থানে স্থানে যে সব জনপদ আছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত রাজা বা ভূস্বামিগণ তাহা শাসন করিতেন। মোহিল নামে একটি রাজপুতজাতি ইহার এক জনপদে বাস করিত। রাজধানী অরিন্ত নগরে মোহিলরাজ মাণিকরাও রাজত্ব করিতেন।

কর্ম্মদেবী, এই মহিলরাজ মাণিকরাওয়ের কন্যা।

পুগল নামে আর একটি জনপদ ছিল। ভট্টিবংশীয় রণঙ্গদেব এই সময় পুগল শাসন করিতেন। রণঙ্গদেবের পুত্র সাধু, বিশেষ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত যুবক। একদল বীর সহচর সহ তিনি নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেন। সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদগুলি সাধুর প্রতাপে কাঁপিত। সাধুর বীরত্বের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী, সাধুর বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়া, মনে মনে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

মিবারের রাণারা শিশোদীয় বা গিহ্লোট বংশীয়। এই কুল সূর্য্যবংশের একটি শাখা। মারবারের রাজারাও সূর্য্যবংশের

আর একটি শাখা—রাঠোর কুল জাত। রাজপুতজাতির মধ্যে শিশোদীয় বংশীয়েরাই কুলে শীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের পরেই রাঠোর বংশীয়দের স্থান। এই সময় মুন্দর নগরে মারবারের রাঠোর-রাজগণের রাজধানী ছিল। পরে যোধ নামে একজন রাজা যোধপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। মুন্দররাজ চণ্ডের পুত্র অরণ্যকমলের সঙ্গে, অরিস্তরাজ মাণিকরাও কন্যা কর্ম্মদেবীর বিবাহ সম্বন্ধ করিলেন। রাঠোর বংশে কন্যা দান করিয়া ধন্য হইবেন, তাই কন্যার মতামত কিছু না জানিয়াই তিনি এই সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

এই সময় কোন যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে সাধু অরিস্ত নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মাণিকরাও এই বিখ্যাত বীরের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার জন্য নিজ নগরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

কর্ম্মদেবী পূর্ব্বে কখনো সাধুকে দেখেন নাই। কেবল বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়াই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখন সেই বীরবরকে চক্ষে দেখিয়া, তাঁহার বীরতেজ-উদ্ভাসিত মূর্ত্তি দেখিয়া, একেবারে মুগ্ধ হইলেন। বীরের পদে বীরাঙ্গনা মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

পিতা ইহার পূর্ব্বে রাঠোর-রাজপুত্র অরণ্যকমলের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন; রাঠোর-রাজপুত্র, বংশে সাধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মারবার বৃহৎ পরাক্রান্ত রাজ্য; পুগল, যশল্মীর রাজ্যের অধীন ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র। তারপর এই সম্বন্ধ ভঙ্গ

করিয়া অবমাননা করিলে মারবাররাজ তাহার প্রতিশোধ লইতে কি ছাড়িবেন ? কখনও নয়! তখন, ক্ষুদ্র পুগলের সাধ্য কি, যে, মারবারের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে ? এইরূপ সহচরীরা কর্ম্মদেবীকে অনেক বুঝাইলেন।

কিন্তু কর্ম্মদেবী উত্তর করিলেন,—

"—উচ্চবংশ ও রাজ্যসম্পদ অপেক্ষা, বীরত্ব রাজপুতবালার পক্ষে অনেক বেশী আদরের। সাধুর ন্যায় বীরের সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলে, রাজপুতবালা আমি, পৃথিবীর সাম্রাজ্যও চাই না। রাঠোরকুলের রাজমহিষী হইয়া মুন্দরের ঐশ্বর্য্য ভোগবিলাস আমি চাই না। এই বীরের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে পারিলে আমি অনেক বেশী সুখী হইব। এই বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ইঁহাকেই যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন ইনিই আমার স্বামী। ভয়ে বা লোভে অন্য কোন ব্যক্তিকে কখনো বরমাল্য দিতে পারিব না। এত বীরত্বের অধিকারী হইয়া, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও যদি সাধু, মারবারের রাঠোর-শক্তির প্রতিহিংসা হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারেন, বুঝিব, বিধাতা আমাদের পার্থিব সুখের বাদী। ইঁহার মৃতদেহের সঙ্গে চিতানলে এই পার্থিব দেহ বিসর্জ্জন দিয়া—স্বর্গে ইঁহার সঙ্গে মিলিত হইব।"

সহচরীরা ক্ষান্ত হইল। কন্যার এই দৃঢ় সংকল্পের কথা মাণিকরাও জানিতে পারিলেন। কন্যার মত পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহারও সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অগত্যা মাণিকরাও সাধুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সাধু সকল কথাই শুনিলেন। মারবারের সঙ্গে যে, এই উপলক্ষ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহাও বুঝিলেন। কিন্তু সেই ভয়ে এমন বীরাঙ্গনার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিবার পাত্র তিনি নহেন। সাধু সম্মত হইলেন। যথাসময়ে পিতার অনুমতি লইয়া সাধু কর্ম্মদেবীকে বিবাহ করিলেন।

মারবাররাজ চণ্ড ও তাঁহার পুত্র অরণ্যকমল এই ঘটনায় যার-পর-নাই অবমানিত বোধ করিলেন। তাঁহারাও উপযুক্ত প্রতিশোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

(২)

বিবাহের পর সাধু নববধূসহ পুগলে যাত্রা করিয়াছেন। পথে অরণ্যকমল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারেন, সকলের মনে এই আশঙ্কা হইল। মোহিলরাজ মাণিকরাও চারি পাঁচ হাজার মোহিলসৈন্য জামাতার সঙ্গে দিতে চাহিলেন। কিন্তু আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই স্ত্রী লইয়া পিতৃগৃহে যাইবেন, এই বলিয়া সাধু, শ্বশুরের প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। তথাপি মাণিকরাও, সাধুকে অনেক অনুনয় করিয়া, নিজ পুত্র মেঘরাজ এবং তৎসঙ্গে সাত শত মোহিল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে দিলেন।

পথে, চন্দন নামক কোন স্থানে সাধু বিশ্রাম করিতে বসিলেন। এমন সময়ে অরণ্যকমল ৪।৫ হাজার রাঠোর সৈন্যসহ সাধুর সম্মুখীন হইলেন।

রাজপুতোচিত মহত্বে ও বীরত্বে অরণ্যকমলও হীন ছিলেন না। এ যুদ্ধ রাজ্যলাভ বা রাজ্যরক্ষার জন্য নয়, কেবল আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য। অরণ্যকমলকে বঞ্চিত করিয়া অরণ্য-কমলের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধা কুমারীকে সাধু বিবাহ করিয়াছেন, সুতরাং রাজপুত বলিয়া, বীর বলিয়া, এ অবমাননার প্রতিশোধ অরণ্যকমলকে দিতেই হইবে, নতুবা তাঁহার সম্মান থাকিবে না। আকাঙ্ক্ষিত কুমারী লইয়া সাধুর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ, সমান ক্ষেত্রে তিনি সাধুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সম্মান তিনি রাখিবেন। যেমন করিয়াই হউক সাধুকে তিনি নিহত করিবেনই, এমন নীচ প্রতিহিংসার ভাব অরণ্যকমলের হৃদয়ে ছিল না।

যখন তিনি দেখিলেন, নিজের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা সাধুর-সৈন্যসংখ্যা অনেক কম, তখন তিনি আক্রমণের মুখে রাঠোর সৈন্যকে ক্ষান্ত করিলেন।

সাধু, প্রশংসার চক্ষে ইহা নিরীক্ষণ করিলেন।

তখন, উভয়পক্ষের ইচ্ছামত সৈন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক্রমে দলযুদ্ধে পরিণত হইতে লাগিল। দেখিয়া, উভয়ে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। বিবাদ, সাধু ও অরণ্যকমলের মধ্যে,—নিজ নিজ সম্মান লইয়া। ইহাতে কেন অনর্থক এত লোকক্ষয় হইবে? তাই, বীরদ্বয় স্থির করিলেন, উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ফলাফল নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিবে।

তখন সাধু, স্ত্রীর নিকট একবার বিদায় নিতে গেলেন। কর্ম্মদেবী এতক্ষণ উৎফুল্ল নেত্রে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সাধু বিদায় চাহিলে, তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন,—"যাও, আমি নিজের চক্ষে তোমার বীরত্ব ও রণকৌশল কখনো দেখি নাই, আজ তাহা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব। যাও, বীর তুমি, বীরের মত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় কিম্বা আপনার মান রক্ষা কর। জয় কিম্বা মরণ যাই লাভ কর, তাতেই তোমার বীরের মান থাকিবে। তোমার মৃত্যুতেও আমি কাতর হইব না। আমার কথা ভাবিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিও না। যদি জয় লাভ করিতে না পার, মরিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি তোমার অনুগামিনী হইব।"

(৩)

সাধু ও অরণ্যকমল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বীরের রীতি অনুসারে, প্রথমে উভয়ে পরস্পরকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

তখন, এক সঙ্গে দুই জনে বিশাল তরবারি তুলিয়া, পরস্পরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিয়া আঘাত করিলেন। আঘাতে দুইজনই এক সঙ্গে ভূপতিত হইলেন। কিছুকাল পরে অরণ্যকমলের চেতনা হইল। সাধু আর উঠিলেন না।

কর্ম্মদেবী নিশ্চল ও শান্তভাবে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন।

সাধু পতিত হইলে তিনি কাছে আসিলেন। তাঁহার চক্ষে জল নাই, মুখে বিষাদের চিহ্ন নাই। ইহলোকে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে পারিলেন না, পরলোকে স্বামীর অনুগামিনী হইবেন, তাই, বিবাহের পরেই স্বামীর এই ভীষণ মৃত্যুতে তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না। জীবনে মরণে স্বামীর চিরসঙ্গিনী তিনি, এ পৃথিবীতে আর মিলন না হইলেও, স্বর্গে প্রাণে প্রাণে স্বামীর সঙ্গে তিনি চিরমিলনে মিলিত থাকিবেন,—মৃত্যুর সাধ্য নাই, একদিনের তরেও স্বামীর সঙ্গে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে,—তাই স্বামীর এই বীরবাঞ্ছিত সমরমৃত্যুতে বীরনারী কিছুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইলেন না। অনুচরবর্গকে ডাকিয়া, চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

চিতা প্রস্তুত হইল। স্বামীকে স্বহস্তে, যত্নে, সেই চিতাশয্যায় শোয়াইয়া, কর্ম্মদেবী তাঁহার তরবারি লইলেন। নিজের হাতে এক আঘাতে আপনার এক খানি হাত কাটিয়া স্বামীর এক প্রধান অনুচরকে দিয়া কহিলেন,—"শ্বশুরকে আমার প্রণাম দিও। তাঁহার চরণ-দর্শন অদৃষ্টে হইল না, এই কাটা হাতখানি তাঁকে দিয়া কহিও, তাঁর পুত্রবধু এইরূপ ছিল।"

এই বলিয়া সেই তরবারি তিনি পার্শ্বস্থ একজন অনুচরকে দিয়া কহিলেন,—"এক হাতে হাত কাটা যায় না। আমার এ হাতখানা তুমি কাটিয়া ফেল।"

অনুচর আদেশ মত কার্য্য করিল।

কর্ম্মদেবী কহিলেন,—“এই হাতখানা তুলিয়া লও ইহা মোহিলকুলের ভট্ট-কবিদের দিও।”

এইরূপে দুইখানি হাত কাটিয়া রাখিয়া কর্ম্মদেবী চিতায় স্বামীর পাশে গিয়া শয়ন করিলেন। চিতা জ্বলিল। দেখিতে দেখিতে বীর ও বীরাঙ্গনার অতুলন রূপময় দেহ দুইখানি ভস্মীভূত হইল।

কর্ম্মদেবীর ছিন্ন বাহু পুগলে পৌঁছিল। বৃদ্ধ রণঙ্গদেব পুত্রবধূর ছিন্ন বাহু কোলে লইয়া অনেক কাঁদিলেন। তার পর সজ্জিত চিতায় সেই ছিন্নবাহু দগ্ধ করিয়া সেখানে বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিলেন। পুষ্করিণী ‘কর্ম্মদেবী সরোবর’ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

নীরকী কুমারী।

পূর্ব্বে বিন্দুমতীর গল্পে আমরা মারবারের রাজা যশোবন্তসিংহ এবং তাঁহার পুত্র অজিৎসিংহের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই অজিতের পৌত্র রাজা রামসিংহের সঙ্গে, একবার, অজিতের দ্বিতীয় পুত্র ভক্তসিংহের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মারবারের সর্দ্দারগণ কেহ রামসিংহের পক্ষ এবং কেহ বা ভক্তসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

মেহত্রী সর্দ্দার রাজার পক্ষে ছিলেন। এই সর্দ্দারের এক মহাবীর তেজস্বী পুত্র ছিল। যুদ্ধের ডাক পড়িল, মেহত্রী সর্দ্দার আপন অনুচর ও সৈন্যসহ যুদ্ধে যাইবার আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাঁহার বীর পুত্র তখন অনুপস্থিত। তিনি নীরকী সর্দ্দারের কন্যাকে বিবাহ করিতে সেইস্থানে গিয়াছেন।

বরকন্যা বিবাহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত। পুরোহিত বরকন্যার হাতে হাত মিলাইয়া সম্প্রদানের মন্ত্র পড়িতেছেন। এমন সময় যুদ্ধের ডাক নীরকীতে পৌঁছিল।

বিদ্রোহী পিতৃব্য আজ রাজার বিরুদ্ধে উত্থিত, রাজভক্ত সর্দ্দারগণ অবিলম্বে রাজার সাহায্যে আগমন করিবেন, রাম-সিংহের এই আদেশও, এই সময় পৌঁছিল।

যুদ্ধ উপস্থিত, বিপন্ন রাজা সর্দ্দারগণকে ডাকিতেছেন;—বীর মেহত্রীকুমার নিতান্ত অস্থির ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

বীরযুবক বিবাহের আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে সদ্যপরিণীতা সুন্দরী তরুণী,—এখনো হাতে হাত বাঁধা। কিন্তু, বীরের প্রাণ আর সে দিকে নাই। যুদ্ধ উপস্থিত, রাজার ডাক, পিতা ভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন, আর তিনি কি-না বিবাহের আনন্দে নিশ্চিন্ত? সকলে বর্ম্ম পরিয়া অসি ধরিয়া ঘোড়া চড়িয়া যুদ্ধে যাইতেছে, আর তিনি কি-না কোমল বরবেশে কোমল বরাসনে কোমল রমণীর কর ধরিয়া বসিয়া আছেন? মেহত্রীকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র তিনি অশ্ব আনিতে আদেশ করিলেন। বিবাহ-প্রাঙ্গন হইতে সেই মুহূর্ত্তে —সেই বরবেশেই তিনি পিতার সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

শ্বশুর, পুরোহিত এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলে তাঁহাকে নবপরিণীতা তরুণী ভার্য্যার মুখের দিকে চাহিয়া অন্ততঃ একটি দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে অনেক অনুরোধ ও অনুনয় করিলেন। কিন্তু মেহত্রীকুমার কিছুতেই বিলম্ব করিতে চাহিলেন না। যাইবার সময় তরুণী ভার্য্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন,—“তোমাকে এইমাত্র বিবাহ করিয়াছি, পত্নী বলিয়া একটিবার সম্ভাষণের অবসর হইল না। আমি রাজপুতবীর, পত্নী সম্ভাষণের আশায় ক্ষণকালের জন্যও যুদ্ধের ডাক উপেক্ষা করিতে পারি না। হয় ত আর এজীবনে দেখা হইবে না। তুমি রাজপুতবালা,

ইহাতে দুঃখিত হইও না। প্রশান্ত মনে আমাকে বিদায় দাও। যদি মরি, যদি আর ফিরিয়া না আসি, এ জীবনে যদি মিলন আর না-ও হয়, তাতেও ক্ষুব্ধ হইও না। পর জীবনে আবার আমরা মিলিব। আমাদের এই বিবাহ ইহকালের জন্য নয়, পরকালের জন্য বলিয়া মনে করিবে।"

মুখ তুলিয়া নীরকী-কন্যা কহিলেন,—"তুমি রাজপুতবীর, আমিও রাজপুতবালা, রাজপুতবীরের সহধর্ম্মিণী।—পার্থিব সুখের জন্য স্বামীর বীর-ধর্ম্মে বাদিনী কখনো হইব না। তুমি যাও, আমার জন্য ভাবিও না। আজ যে মিলনে নিরাশ হইলাম, জীবনে যদি সে মিলন আর নাও ঘটে, তোমার বীরত্ব ও ত্যাগের কথা মনে করিয়া তাও সহিব। তোমার অনুগামিনী হইয়া পরলোকে তোমার সঙ্গে মিলিব।"

মেহত্রীকুমার অবিলম্বে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন। তাঁহার পিতা যেখানে সৈন্য সহ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন, সে স্থান নীরকী হইতে প্রায় আশী ক্রোশ দূরে। দুইরাত্রি ও একদিনে এই আশীক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বীর যুবক যুদ্ধে যোগদান করিলেন। বরবেশে তাঁহার এই যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া ভট্টি কবিরা গাইয়াছেন,—

"কাণে মত্তি বল্‌বলা গলে সোণিএ মালা,
আশী কোশ করো হো আয় কোভার মেহত্রীওয়ালা!"

কাণে উজ্জ্বল মতি, গলায় সোণার মালা, এমন বেশে মেহত্রীকুমার আশী ক্রোশ পথ চলিয়া যুদ্ধে আসিলেন।"

(২)

স্বামী চলিয়া আসিলে নীরকীকন্যাও আর পিতৃগৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার শ্বশুর-গৃহে পাঠাবার জন্য পিতা মাতাকে অনুরোধ করিলেন।

এমন সময় যুদ্ধের ফলাফল না জানিয়া, এই যুদ্ধ-সঙ্কুল দীর্ঘ পথে কন্যাকে পাঠাইতে পিতা মাতার বড় ইচ্ছা ছিল না। মাতা অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু কন্যা কহিলেন,—"কেন মা, আর আমাকে এখানে থাকিতে বলিতেছ? স্বামী এমন ভাবে ফেলিয়া যুদ্ধে গিয়াছেন, আমি কি এখানে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমি যাইব। যদি একটি দিনের তরেও জীবিত তাঁ'র দেখা পাই, ইহজীবন আমার সার্থক হইবে। যদি তাঁর মৃত্যু হয়, এক চিতায় তাঁর সঙ্গে চলিয়া যাইতে পারিব। ইহজীবনে যে টুকু সুখের আশা বিধাতা দিয়াছেন, এখানে থাকিয়া তাতেও কেন মা বঞ্চিত হইব?"

মাতা আর আপত্তি করিলেন না। নীরকী-সর্দ্দার অবিলম্বে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইলেন। নীরকী-কন্যা শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়াই দেখিলেন সজ্জিত চিতায়—স্বামীর মৃত দেহ! একটিবার মাত্রও যদি স্বামীকে জীবিত দেখিতে পান, এই ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধিয়া এত পথ তিনি আসিয়াছেন, সে আশা তাঁর পূরিল না। একটিবার মাত্র—মুহূর্ত্তের জন্য যে সাধ মিটিলে ইহজীবন তিনি সার্থক মনে করিতেন, সে সাধেও

তিনি বিধাতার কঠোর বিধানে বঞ্চিত হইলেন। তখন নীরকী-কন্যা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"প্রভু! এ জীবনে তোমাকে পাইলাম না। পরলোক সম্মুখে, সেখানে কে আমাকে তোমার সঙ্গ লাভে বঞ্চিত করিবে ?"

এই বলিয়া গুরুজনদিগের পদধূলি লইয়া নব-বধূ চিতায় স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া স্বামীর পাশে শয়ন করিলেন।

সাশ্রু নয়নে আত্মীয়গণ চিতায় অগ্নি প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে চিতা জ্বলিল।

চিতায় বর-বধূর বাসর শয্যা হইল, সেই শয্যায় অগ্নিদেব বর-বধূর পুণ্যদেহ এক ভস্মরাশিতে মিলাইয়া দিলেন।

দুর্গাবতী।

(৯)

(১)

মধ্যপ্রদেশে গড়মণ্ডল নামে একটি রাজ্য ছিল। রাজ্যটি পর্ব্বতময়। রাজধানী গড়নগর চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত-মালায় বিশেষ সুরক্ষিত ছিল।

মুশলমানেরা উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণভারতের প্রায় সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরসাহের রাজত্বকালের পূর্ব্বে কোন মুশলমান রাজা কি সম্রাট, গড়রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই।

দুর্গাবতী, মধ্যপ্রদেশেরই মহবা নামে একটি রাজ্যের রাজ-কন্যা। গড়মণ্ডলের রাজা দলপৎ সাহ একদিকে যেমন তেজস্বী বীর, অপরদিকে তেমনি সুপুরুষ ছিলেন। বীরত্ব, তেজস্বিতা ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত তাঁহার দেবোপম মূর্ত্তি যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত।

এদিকে দুর্গাবতীও সৌন্দর্য্য ও তেজস্বিতায় সাক্ষাৎ দেবী-রূপিনী ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ দলপৎ ও রমণীশ্রেষ্ঠ দুর্গাবতী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। এমন অবস্থায় এইরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্য। দলপৎ মহবারাজের নিকট দুর্গাবতীকে

বিবাহের প্রার্থনা করিলেন। দলপৎ উচ্চকুলজাত নন বলিয়া মহারাজ এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন।

পিতা বীরত্বের সম্মান বুঝিলেন না, দুর্গাবতী ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন। সখীরা জিজ্ঞাসিল,—"এখন উপায় কি? কি করিবে?"

দুর্গাবতী কহিলেন,—"রূপে ও বীর্য্যে দলপৎ মানবরূপে দেবতা। তাঁর দেবমূর্ত্তি আমি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেছি। তিনিই আমার স্বামী। অন্য পুরুষকে আমি বিবাহ করিব না।"

সখীরা কহিল,—"তোমার পিতা তো সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করিবে?"

দুর্গাবতী কহিলেন,—"নামে যেমন, কাজেও যদি তিনি তেমন বীর হন, পিতার প্রত্যাখ্যানে তিনি নিরস্ত হইবেন না। আমি যে তাঁহাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এ কথা তিনিই জানেন। জানিয়াই আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন। পিতা মত দিলেন না বলিয়াই কি তিনি ফিরিবেন? কোন্ ক্ষত্রিয় বীর বীর্য্যবতী ক্ষত্রিয়বালার প্রেম উপেক্ষা করিতে পারে? কোন্ ক্ষত্রিয় রাজা সহজে আকাঙ্ক্ষিত কুমারীকে পাইবার আশা ত্যাগ করে? অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজও, সংযুক্তা তাঁর প্রতি অনুরাগিণী জানিয়া বলপর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে এরূপ কার্য্য অধর্ম্ম নহে। এরূপ বীরকে কোন ক্ষত্রিয়বালার আত্মদানও অবমাননার কার্য্য নহে। বীরাঙ্গনা বীরত্বের পক্ষপাতিনী। বীর্য্যবলে কোন বীর যদি কোন কন্যাকে হরণ করিতে পারেন, সে কন্যা কেন সেই বীরকে বরণ করিয়া আপনাকে সম্মানিত মনে করিবে না? দলপৎ যদি সত্য সত্যই আমার প্রতি অনুরক্ত হন, বীরমর্য্যাদা যদি তাঁর থাকে, পিতার অমত সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেনই। যদি তিনি তা পারেন, আমিও তাঁর গলে মালা দিয়া কৃতার্থ হইব।"

দুর্গাবতীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। দলপৎ বহু সৈন্য সহ মহবারাজ্য আক্রমণ করিলেন।

মহবারাজ পরাজিত হইলেন। দলপৎ দুর্গাবতীকে লইয়া গড়মণ্ডলে ফিরিয়া গেলেন।

অবিলম্বে দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের রাজমহিষী হইলেন।

(২)

বিবাহের চারি বৎসর পরে একটি শিশুপুত্র রাখিয়া দলপৎ দেহত্যাগ করেন। শিশু বীরনারায়ণের প্রতিনিধি স্বরূপ দুর্গাবতী গড়মণ্ডল শাসন করিতে লাগিলেন। পনর বৎসরে তাঁহার শাসন গুণে গড়মণ্ডল বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় ও অন্যান্য নানাবিধ লোক

হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে, প্রজাবর্গ বিশেষ সুখী হইল। রাণী-মা-দুর্গাবতীকে সকলে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল।

এ দিকে, পাঠান সাম্রাজ্য পতনের পর, বিভিন্ন প্রদেশে দিল্লীর আধিপত্য লুপ্ত হইয়াছিল। মুশলমান শাসনকর্ত্তারা এবং স্বাধীন হিন্দু রাজারা সকলে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মোগল বাবরসাহ দিল্লী জয় করেন বটে, কিন্তু, সাম্রাজ্য মধ্যে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। আকবরসাহ সিংহাসন লাভ করিয়া প্রথমেই এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

যে সব প্রদেশ দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়া দিল্লীর শক্তি খর্ব্ব করিয়াছিল, আবার সেই সব প্রদেশে দিল্লীর আধিপত্য স্থাপনের জন্য, আকবর, যুদ্ধকুশল সেনাপতিসকল পাঠাইতে লাগিলেন। আসফ খাঁ নামক একজন সেনাপতি মধ্যপ্রদেশে প্রেরিত হন।

গড়মণ্ডল এ পর্য্যন্ত কখনো দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া আসফ খাঁর লোভ হইল। বহু সৈন্য লইয়া, আসফ খাঁ গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলেন।

(৩)

এক দিকে দিল্লীর বিপুল শক্তি, অন্য দিকে ক্ষুদ্র গড়রাজ্য। সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারত যে শক্তির নিকট অবনত

হইয়াছে, ক্ষুদ্র গড়রাজ্য কি, সেই শক্তিকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে?

প্রজারা ভীত হইল। দেশের স্বাধীনতা বুঝি আর থাকে না। রাণীমার সোণার রাজ্য বুঝি ছারখারে যায়।

কিন্তু দুর্গাবতী নিজে ভীত হইবার পাত্রী নহেন। তিনি অদম্য উৎসাহে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। রাণী-মার ডাকে, রাণী-মার মান রাখিবার জন্য, প্রজারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র বীরনারায়ণকে লইয়া, রাণী, যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হইলেন।

মাথায় উজ্জ্বল রাজমুকুট, এক হাতে শূল এবং অপর হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া স্বয়ং দানবদলনী কেশরীবাহিনী দুর্গার ন্যায় মোগলদলনী দুর্গাবতী, হস্তীপৃষ্ঠে সমবেত সৈন্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সকলকে সম্বোধন করিয়া তেজোপূর্ণ ভাষায় রাণী কহিলেন,—"সৈন্যগণ! গড়বাসী প্রজাগণ! যে সুন্দর গড়-রাজ্য এতদিন তোমাদের ছিল, আজ তাহা পরে কাড়িয়া নিতে আসিয়াছে! এই সুন্দর দেশের জলে ও ফলে তোমাদের,—তোমাদের পিতৃপুরুষগণের দেহ ও প্রাণ পরিপুষ্ট হইয়াছে। এই সুন্দর দেশের পবিত্র ধূলিতে তোমাদের পিতৃপুরুষগণের অস্থিরেণু, মধুর বাতাসে প্রাণবায়ু, মিশিয়া আছে। এই পবিত্র দেশ তোমাদের জন্মভূমি,—তোমাদের জননী,—ধাত্রী ও পালন-কর্ত্রী; সুতরাং দেবতার ন্যায় তোমাদের সকলের পূজ্য।

আজ তোমাদের এই পবিত্র পূজ্য দেবদেশ দানবের পদাঘাতে

কলঙ্কিত, ব্যথিত ও চূর্ণ হইবে।—প্রাণ থাকিতে কি তাহা মানুষ হইয়া কেহ সহিতে পারিবে ?”

সৈন্যগণ কহিল—“না রাণীমা, কেহ তাহা সহিব না। প্রাণ থাকিতে কেহ দেশের এই দেবদেহ কলঙ্কিত হইতে দিব না !”

রাণী দ্বিগুণ উৎসাহবাক্যে কহিলেন,—“তবে চল সকলে আমার সঙ্গে। গর্ব্বিত মোগলের রণদুন্দুভি বড় গর্ব্বে বাজিতেছে, উহার প্রত্যেক ধ্বনিতে—প্রত্যেক ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে, জানিও, তোমাদের দেবতা অবমানিত ও রুষ্ট হইতেছেন। তোমাদের বিজয় দুন্দুভির গভীর নাদে, রণ-হুঙ্কারের ভীমগর্জ্জনে ওই ধ্বনি ডুবাইয়া দাও! দেবতার প্রাণের ব্যথা মনের হুতাশ দূর কর ;—তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হও।

—গড়বাসি! তোমরা বীরের জাতি, যুদ্ধে ভীত হইও না। জানি মোগল শক্তি প্রবল ও পরাক্রান্ত, গড় ক্ষুদ্ররাজ্য ; জানি মোগলের সেনা অসংখ্য, আমরা মুষ্টিমেয়। কিন্তু, দেশরক্ষার জন্য,—দেবতা জন্মভূমির মানরক্ষার জন্য,—তোমাদের—তোমাদের সন্তানসন্ততিগণের ইহজগতের সুখ সৌভাগ্য ও মানমর্য্যাদা সব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, তোমাদের এক এক জনের প্রাণে সহস্র বীরের তেজ সঞ্চারিত হউক। প্রত্যেকে তোমরা সহস্র বীরের শক্তি লইয়া মোগলের সম্মুখে গড়ের দুর্ভেদ্য অচলরাজির মত দণ্ডায়মান হও! মোগলের সাধ্য হইবে না—সোণার গড়ের তৃণগাছটিও উৎপাটন করে!

আর যদি বিধাতার এমনি ইচ্ছা হয়, যে, অটল অচল-শ্রেণীর ন্যায় গড়ের বীরসৈন্যশ্রেণী—ভগ্ন করিয়া মোগল গড় অধিকার করিবেই, জন্মভূমির জন্য জীবনদানে ইহজগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি, পরলোকে অনন্ত সুখময় স্বর্গের অধিকারী তোমরা হও। গড় ক্ষেত্র তোমাদের যে বীরশোণিতে প্লাবিত হইবে, তাহা কখনো বৃথা যাইবে না। একদিন না একদিন সেই বীরশোণিত প্লাবনে গড়ের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে আবার জগৎ-বিজয়ী বীরবংশের অভ্যুত্থান হইবে। চলহ তবে সৈন্যগণ! তোমাদের রণরঙ্গিনী রাণীমার সঙ্গে রণরঙ্গী সন্তান তোমরা বীরহুঙ্কারে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, অশ্বের পদশব্দে, দিগন্তপ্রসারী উচ্চ গগন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া, মোগলের হৃদয় ত্রাসে কম্পিত করিয়া রণক্ষেত্রে চল। গড়বাসী বীরের বিক্রমে আজ মোগল শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হউক, ভারত স্তম্ভিত হউক।”

ভীম হুঙ্কারে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় দিগন্ত কাঁপাইয়া সৈন্যগণ রাণীর সঙ্গে ছুটিল। প্রবল বিক্রমে দুর্গাবতী মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন। দুইবার মোগল পরাজিত হইল। মোগল সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সমস্ত দিন এইরূপ যুদ্ধে কাটিল। রাত্রিতে দুর্গাবতী সৈন্যদিগকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন।

(৪)

কিছুকাল বিশ্রামের পর, রাত্রিতেই আবার তিনি বিশৃঙ্খল মোগলসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া একেবারে তাহা-

দিগকে নিঃশেষ করিবেন, এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যুদ্ধে ক্লান্ত সৈণ্যগণ সমস্ত রাত্রি বিশ্রামের জন্য তাঁহাকে অনুনয় করিতে লাগিল। প্রজাগণের প্রতি মাতার ন্যায় স্নেহপরায়ণা দুর্গাবতী, সে অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। গড়ের সৈন্য সমস্ত রাত্রি বিশ্রামের আদেশ পাইল। আসফ খাঁ তাঁহার বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে আবার শ্রেণীবদ্ধ করিবার শীঘ্র অবকাশ পাইলেন। গভীর রাত্রিতে আসফ খাঁ ভীমবেগে, বিশ্রামসুখে নিমগ্ন দুর্গাবতীর সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এবারও গড়ের সৈন্যের পরাক্রমে আসফ খাঁ পরাভূত হইলেন।

প্রাতঃকালে আসফ খাঁর আরও নূতন সৈন্য ও কামান আসিয়া উপস্থিত হইল। নূতন শক্তিতে আসফ খাঁ সেই কামান লইয়া আবার দুর্গাবতীকে আক্রমণ করিলেন। গড়ের সৈন্য একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথের সম্মুখে ছিল; সহসা তাহাদের পশ্চাতে একটি শুষ্ক নদী পার্ব্বতীয় প্লাবনে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গড়বাসীরা এই আক্রমণে গিরিপথের আশ্রয় লইতে পারিল না।

কামানের মুখে থাকিয়াই গড়বাসীদিগকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইল। দুর্গাবতী দেখিলেন, এ অবস্থায় জয় বা রক্ষার আশা এক রকম কিছুই নাই। কিন্তু তিনি ভীত বা পশ্চাৎপদ হইলেন না। মোগলের কামানের মুখে যে সৈন্য বাঁচিল, তাই লইয়াই তিনি রণচণ্ডিকার ন্যায় ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সহসা একটী বাণ আসিয়া তাঁহার চক্ষে বিঁধিল। বাণটি টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বাণ উঠাইতে পারিলেন না।

এমন যাতনায়ও রণরঙ্গিণী রাণী কাতর হইলেন না। সেই বিক্রমে, সেই অটল তেজে পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

আর একটি বাণ আসিয়া তাঁহার কণ্ঠবিদ্ধ করিল। এবার দুর্গাবতী যন্ত্রণায় বড় কাতর হইলেন। জয়াশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তখনো হস্তীপৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিয়া অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন। পুত্র বীরনারায়ণ তাঁহারই পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আহত হইয়া বীরনারায়ণ মৃতবৎ ভূতলে পড়িলেন। দুর্গাবতী চাহিয়া দেখিলেন। এমন সময় পুত্রস্নেহও বীরনারীর হৃদয় কাতর করিতে পারে না। তিনি পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া, আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

(৫)

হস্তী-চালক বিচলিত হইল।—রাণীর অবস্থা দেখিয়া, নদীর অপর পারে হস্তী লইয়া যাইবার জন্য বারবার অনুমতি চাহিতে লাগিল। দুর্গাবতী অনুমতি দিলেন না। জয়াশা আর নাই। গড়ের অগণিত সৈন্য মরিয়াছে, পুত্র মৃতবৎ আহত। গড়রাজ্য পরাধিকৃত হইবে। কোন্ সুখের আশায় প্রাণ লইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিবেন? যদি

রাজ্যরক্ষা ও প্রজারক্ষা করিতেই না পারিলেন, রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া ইহলীলা শেষ করিবেন। পরাধীন ছার প্রাণ রাখিয়া কি ফল? তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন না! ক্রমাগত শত্রুর শরাঘাতে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। অবসন্ন ও মূর্চ্ছিত অবস্থায়, পাছে, শত্রুর হস্তে বন্দিনী হন, এই আশঙ্কায় অবশেষে যখন আর শক্তি নাই,—সব —অন্ধকার,—তখন অবশিষ্ট শক্তির শেষ চেষ্টায় মহাপ্রাণা রাণী, নিজের বক্ষে নিজ তরবারি বিদ্ধ করিয়া দিলেন। পবিত্র-রণক্ষেত্রের গৌরবময় মৃত্যুতে বীরাঙ্গণার গৌরবময় জীবনের অবসান হইল।

আহত বীরনারায়ণকে লইয়া কতিপয় সৈন্য অপর এক দুর্গে আশ্রয় লইল। আসফ খাঁ সে দুর্গও আক্রমণ করিলেন। বীরনারায়ণ নিহত হইলেন। কুলনারীরা আগুনে পুড়িয়া মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

গড়মণ্ডলের সেই গিরিপথ এখনো গড়ের লোকেরা অতি পুণ্যস্থান বলিয়া মনে করে। গিরিপথের সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর আছে। লোকে বলে, "দুর্গাবতীর রণডঙ্কা পাথরে পরিণত হইয়া ওইস্থানে আছে।

গড়মণ্ডলের সেই পথ, সেই পাথর, ভারতবাসী মাত্রেরই প্রাণ ভরিয়া দেখিবার এবং পরম গৌরবে পূজিবার জিনিষ।

দুর্গাবতী।

(২)

সাহ হুমায়ুন যখন দিল্লীর সম্রাট, বাহাদুর সাহ নামে একজন স্বাধীন মুসলমান রাজা তখন গুজরাটে রাজত্ব করিতেন। আমরা জবহরবাইএর গল্পে এই বাহাদুর-সাহ এবং তাঁহার মিবার আক্রমণের কথা বলিয়াছি। ইঁহার রাজত্ব কালে গুজরাটের নিকটে রাইসিন দুর্গে শিহ্লাদি নামে একটি ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ছিলেন। এই আখ্যায়িকার নায়িকা দুর্গাবতী এই শিহ্লাদি রাজার পত্নী।

বাহাদুরসাহ রাইসিন দুর্গ আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিহ্লাদি বাহাদুরের হস্তে বন্দী হইলেন। তখন শিহ্লাদির ভ্রাতা লক্ষ্মণের উপর দুর্গরক্ষার ভার পড়িল। যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

কিন্তু মুশলমানেরা দুর্গ হস্তগত করিতে পারিলেন না। তখন বাহাদুরসাহ লক্ষ্মণকে জানাইলেন,—"যদি সহজে দুর্গ ছাড়িয়া দাও, শিহ্লাদিকে মুক্তি দিব এবং দুর্গবাসী স্ত্রী পুরুষ কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার হইবে না। আর যদি সহজে না ছাড়, যুদ্ধ করিয়া যদি দুর্গ লইতে হয়, দুর্গবাসী কাহারও ধন মান প্রাণ রক্ষা হইবে না। শিহ্লাদিরও নিস্তার নাই।"

লক্ষ্মণ ভীত হইয়া দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন।

দুর্গে প্রবেশ করিয়াই মুশলমানেরা প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া দুর্গবাসীদিগকে হত্যা ও অন্যান্য নানারূপে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ দেখিলেন, মুশলমানের ছলে ভুলিয়া তিনি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এখন আর উপায় নাই। মুশলমান যে, কুলনারীগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, সে আশাও আর নাই। যদি তাঁহাদিগকে লইয়া কোনও উপায়ে পলায়ন করিতে পারেন, এই মনে করিয়া তিনি দ্রুত অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দুর্গাবতী কহিলেন,—"মূর্খ কাপুরুষ! শত্রুর হাতে দুর্গ সঁপিয়া দিয়া এখন অন্তঃপুরে পলাইয়া আসিয়াছ?"

ভীত—লজ্জিত—লক্ষ্মণ কহিলেন,—"দেবী, মার্জ্জনা করুন। ভ্রাতার প্রাণ রক্ষার জন্য, দুর্গবাসীদের প্রাণ রক্ষার জন্য, আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই দুর্গ মুশলমানের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছিল, ভ্রাতাকে মুক্তি দিবে, দুর্গবাসীদিগের প্রতি কোন উৎপীড়ন করিবে না।"

দুর্গাবতী কহিলেন,—'মূর্খ বলিয়াই তুমি শত্রুর এই ছলে ভুলিয়াছিলে। কাপুরুষ বলিয়াই সকলের প্রাণ রক্ষার আশায় বিনা যুদ্ধে শত্রুর হাতে দুর্গ সঁপিয়া দিয়াছ! তোমার ভ্রাতা বীর; পিতৃপুরুষের এই দুর্গের বিনিময়ে, রাজ্যের স্বাধীনতার বিনিময়ে, কখনো তিনি নিজ প্রাণ আকাঙ্ক্ষা করিতেন না।

কুণ্ঠিত হইত না। আমরাও ধর্ম্ম রক্ষায় শত্রুর পায়ে দয়া ভিক্ষা করিতাম না। যে ছার প্রাণ রক্ষার আশায় ক্ষত্রিয়-সন্তান হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শত্রুর দয়ার ভিখারী হইয়াছিলে, সেই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেছ কি? ক্ষত্রিয় গৌরবে বীরের মত যারা যুদ্ধে মরিত, তারা আজ হীন শৃগাল কুকুরের মত মরিতেছে! তোমার নেতৃত্বের উপর নির্ভর করিয়া দুর্গে যারা ছিল, তাদের এই দশা দেখিয়া কোন্ লজ্জায় আজ দেহে প্রাণ লইয়া জীবিত আছ? কোন্ মুখে নিজ প্রাণ লইয়া অন্তঃপুরে পলাইয়া আসিয়াছ?"

মরণের অধিক মরিয়া—লক্ষ্মণ কহিলেন,—"দেবী, আমি সহস্রবার আপনার তিরস্কারের যোগ্য। কিন্তু প্রাণভয়ে আমি অন্তঃপুরে আসি নাই। আপনাদিগকে লইয়া নিরাপদে যদি কোন পথে পলাইতে পারি, সেই চেষ্টায় আসিয়াছি। দুর্গে আর বিলম্ব করিলে আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া অসম্ভব হইবে।"

দুর্গাবতী কহিলেন,—"ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় রমণীর পলাইবার প্রয়োজন হয় না। জীবনে আর কোন্ সুখ, কোন্ সম্মানের আশায় পলাইব? রাজ্য গেল, স্বাধীনতা গেল, মান সম্ভ্রম সব গেল; ছার প্রাণ কি এতই বড়, যে, তার আশায় সিংহিনী হইয়া শৃগালীর মত পলাইয়া গিয়া বনে লুকাইয়া থাকিব? ধিক্। ক্ষত্রিয় নারী এমন হীন জীবন চায় না। ইচ্ছা হয়, তুমি পলাও। এই দুর্গ হারাইয়া, দুর্গ

ছাড়িয়া, পলাইয়া প্রাণ রক্ষা আমি করিব না। স্বামী পুত্র হারা অন্যান্য পুরনারীরাও এমন হীন জীবন বহন করিবার জন্য পলাইবেন না। দেখ, ক্ষত্রিয় রমণী কেমন করিয়া আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করে।”

বলিয়া, দুর্গাবতী, আপনার আবাস-গৃহে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। পুরনারীগণকেও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সেই জ্বলন্ত গৃহে আহ্বান করিলেন। সকলেই সে আহ্বানে, অগ্নিময় প্রাণে, অগ্নিময় গৃহে প্রবেশ করিয়া, অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

জিজাবাই।

(১)

এতক্ষণ আমরা কেবল রাজপুত-বীরনারীগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছি। পাঁচ ছয়শত বৎসর যাবত ক্রমাগত পাঠান ও মোগলের সঙ্গে যুঝিয়া রাজপুতজাতি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখন দক্ষিণ-ভারতে মারাঠা নামে আর একটি প্রবল হিন্দু জাতির আবির্ভাব হয়, একথাও পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই মারাঠা জাতিই একসময়ে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি ধ্বংস করিয়া প্রায় সমস্ত ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

যে মহাপুরুষ এই মারাঠা জাতি গঠন করিয়া তাহাকে এমন শক্তিশালী করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শিবাজি।

জিজাবাই ইঁহার গর্ব্ভধারিণী।

মা যেমন ছেলেকে গড়িতে পারেন, মা যেমন ছেলেকে ঠিক পথে রাখিতে ও চালাইতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না। বড় হইবার মত শক্তি ও প্রবৃত্তি যার আছে, মায়ের শিক্ষা, মায়ের উৎসাহ যেমন তার সেই বড় হইবার পথে সহায় হইতে পারে, এমন আর কিছুই নয়। মা যার, হাসি-মুখে উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া সম্মুখে দাঁড়ান, সে যেমন

সাহসে বুক বাঁধিয়া বিপদে ঝাঁপ দিতে পারে, এমন আর কেহ কখনো পারে না। হীনতায় ও কাপুরুষতায় গৃহে মাতার বিরাগ ও ধিক্কার যে পাইবে জানে, হীনতায় ও কাপুরুষতায় তার মত ভয় আর কেহ পায় না।

ধর্ম্মনিষ্ঠায়, মহত্বে ও তেজস্বিতায় জিজাবাই আদর্শরমণী ছিলেন। পুত্র যাহাতে বীরত্বে ও মহত্বে ধর্ম্মনিষ্ঠায় আদর্শ পুরুষ হইয়া ভারতে হিন্দুর লুপ্ত মর্য্যাদা আবার ফিরাইয়া আনিতে পারেন, এ বিষয়ে চিরদিন তিনি শিক্ষা ও উৎসাহদানে পুত্রের সহায়তা করিয়াছেন। এমন জিজার পুত্র বলিয়াই এমন শিবাজি হইয়াছিলেন। কাশীতেই শিবত্ব ঘটে ; গোমুখীতেই গঙ্গা ছোটে ; নন্দনেই পারিজাত ফোটে ; পদ্মরাগের আকরেই পদ্মরাগ জন্মে।

দক্ষিণ ভারতে কখনো একেবারে দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন হয় নাই। যখন পাঠান সম্রাটগণ দিল্লী শাসন করিতেন, তখন দাক্ষিণাত্যে দুইটি প্রধান স্বাধীন রাজ্য ছিল। একটি হিন্দুর, অপরটি মুশলমানের।

হিন্দু রাজ্যটির নাম বিজয়নগর এবং মুশলমান রাজ্যটির নাম বামনী।

ক্রমে বামনী রাজ্য ভাঙ্গিয়া পাঁচটি পৃথক রাজ্য হইল। এই পাঁচ রাজ্যের মুশলমান রাজারা মিলিয়া হিন্দুর বিজয়নগর-রাজ্য ধ্বংস করেন। তারপর এই পাঁচটি রাজ্যের দুইটি লোপ পাইয়া তিনটি রহিল। এই তিনটির নাম আমেদনগর, বিজাপুর

হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হইলেও হিন্দুর শক্তি একেবারে কখনো লোপ পায় নাই। মুশলমান রাজাদের অধীনে শত শত ক্ষুদ্র হিন্দু জমীদার, জায়গীরদার ও দুর্গাধিপতিরা নিজ নিজ অধিকৃত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করিতেন। এই সব হিন্দু ভূস্বামীরাই কি যুদ্ধে, কি রাজ্যশাসনে, আমেদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুশলমান রাজাদের প্রধান সহায় ছিলেন।

এত শক্তি সত্ত্বেও যে হিন্দুরা মুশলমানের অধীন ছিলেন তার প্রধান কারণ এই যে, এই সব হিন্দু ভূস্বামী সকলে মিলিয়া কখনো এক হইতে পারেন নাই, অথবা কেহ এত বড় হইতে পারেন নাই, যে, অন্যান্য সকলকে নিজের অধীনে আনিয়া এক বৃহৎ হিন্দু শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগে মারাঠা দেশ। এ দেশেও অনেক মারাঠা জায়গীরদার ও দুর্গাধিপতি কেহ আমেদনগর, কেহ বিজাপুর এবং কেহ গোলকুণ্ডার সুলতানদের অধীনে কার্য্য করিতেন। শিবাজিই প্রথমে আপন শক্তি-বলে সমস্ত মারাঠা জাতিকে আপন অধীনে আনিয়া এমন এক নূতন শক্তিতে হিন্দুজাতীর জাতীয় জীবন এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণীত করিয়া তুলেন, যাহার প্রচণ্ড আঘাতে কেবল দাক্ষিণাত্য কেন, সমগ্র ভারতের মুশলমান-শক্তি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এই মহাশক্তির জননী, এই নবগঙ্গাপ্লাবনের পুণ্য গোমুখী **জিজাবাই** লুখজি জাধবরাও নামক কোন মারাঠা জায়গীরদারের কন্যা।

লুখজী জাধবরাও আমেদনগরের রাজসরকারে কোন বড় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। মালোজি ভোঁসলে নামক একজন ক্ষুদ্র মারাঠা জমিদার ইঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কথিত আছে, আলাউদ্দিন যখন চিতোর জয় করেন, তখন রাণাবংশীয় একজন রাজপুত্র মারাঠাদেশে পলাইয়া আসেন; মালোজি ইঁহারই বংশধর।

একবার দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে পঞ্চম বর্ষীয় বালকপুত্র সাহজিকে লইয়া মালোজি, লুখজির বাড়ীতে আসেন। বালক সাহজি ও জিজাবাই দু'জনেই বড় সুন্দর। এমন সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে এমন সুন্দর মেয়েটির বিবাহ হইলে বেশ্ মানায়। লুখজি হাসিয়া জিজাকে কহিলেন,—“কেমন জিজা, এই ছেলেটিকে বে কর্‌বি ?”

জিজা কহিল,—“হ্যাঁ কর্‌বো, এই আমার বর।” জিজা তখন তার বরকে লইয়া আবির খেলিতে আরম্ভ করিল।

সকলে হাসিয়া বলিল,—“বেশ্ বেশ্ ! বেশ্ বর বউ !”

বংশে যেমনই হউন, সম্পদে ও পদগৌরবে লুখজি অপেক্ষা মালোজি অনেক ছোট। লুখজির কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহের আশা তাঁর পক্ষে একরূপ দুরাশার মত। কিন্তু এই সুযোগ দেখিয়া তিনি সভাস্থ সকলকে হাসিয়া কহিলেন,— “আপনারা সকলে সাক্ষী, জিজা আজ থেকে আমার পুত্রবধূ, লুখজি আমার বৈবাহিক।”

পরদিন আহারের নিমন্ত্রণ করিলে, মালোজি লুখজিকে

বলিয়া পাঠাইলেন যে, সাহজির সঙ্গে জিজার বিবাহ দিতে স্বীকার করিলে, মালোজি লুখজির গৃহে আহার করিবেন, নচেৎ নহে।

মালোজি একে গরীব, তায় আবার লুখজির অধীন কর্ম্মচারী। তাঁর এমন আস্পর্দ্ধার কথায় লুখজির স্ত্রী বড় কটুবাক্যে মালোজিকে গালি দিলেন। দারুণ অপমান বোধে মালোজি কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিজগ্রামে ফিরিয়া কৃষি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

কিছুকাল পরে, মালোজির ভাগ্য ফিরিল, সহসা তিনি মাটির নীচে অনেকগুলি ধন পাইলেন।

এই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।—

একদিন মালোজি স্বপ্নে দেখিলেন, স্বয়ং দেবী ভগবতী তাঁহার সম্মুখে আর্বিভূত হইয়া বলিতেছেন,—"মালোজি, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার বংশধরগণ রাজা হইয়া ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবে। ঐ স্থানে সাত কলস মোহর মাটিতে পোতা আছে, তুলিয়া লও। ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎ রাজত্বের আয়োজন করিতে থাক।"

দেবী এই বলিয়া অদৃশ্য হইল। মালোজি পরদিন প্রাতে দেবীর নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িয়া সাত কলস মোহর পাইলেন। এইরূপে বহু ধন লাভ করিয়া মালোজি অনেক অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

তাঁহার সাহস ও শক্তির কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল।

ক্রমে আমেদনগরের রাজসরকারে তিনি উচ্চ সম্মান ও উচ্চ পদ পাইলেন।

লুখজি তখন সাহজির সঙ্গে জিজাবাইএর বিবাহ দিলেন।

(২)

কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। সাহজি এখন সাহসী, শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত যুবক। আমেদনগর রাজ্য ক্রমে দুর্ব্বল ও অবনত হইতেছে দেখিতে পাইয়া সাহজি দিল্লীর সরকারে কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন। সাহজির গুণের কথা সম্রাট সাহজাহান পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এমন বহুগুণশালী বীর যুবককে পাইয়া সম্রাট তাঁহাকে ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক নিযুক্ত করিলেন এবং দুইলক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেন।

কিছুকাল পরে আমেদনগরের রাজা বাহাদুরসাহের মৃত্যু হওয়ায়, রাজ্যে নানা গোলযোগ আরম্ভ হইল। সাহজি বাল্যাবধি আমেদনগর রাজ্যে প্রতিপালিত। প্রথম জীবনে আমেদনগরের রাজসরকারেই তিনি কার্য্য করিয়াছেন। এখন সেই রাজ্যের বিপদের কথা জানিতে পারিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্বর দিল্লীর সেনানায়কের পদ পরিত্যাগ করিয়া আমেদনগরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহাদুর-সাহের বেগম সাহজির আগমনে আপনাকে বিপন্মুক্ত মনে করিলেন। অবিলম্বে প্রধান মন্ত্রীর পদে তাঁহাকে বরণ করিয়া শিশু রাজপুত্রগণের রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে দিলেন।

বৃদ্ধ লুখজি এখনো আমেদনগরের রাজসরকারে পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

যে মালোজি একদিন তাঁহারই অধীনে সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, সেই মালোজির পুত্র এখন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। জামাতা হইলেও সাহজির এমন পদোন্নতি লুখজির সহিল না। তিনি দিল্লীর সম্রাট্ সাহজাহানকে সাহায্য করিবেন এই আশ্বাস দিয়া গোপনে তাঁহাকে আমেদনগর আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দিল্লীর সম্রাটগণ অনেকদিন অবধি আমেদনগর জয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন সেই রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহায়তা পাইবেন জানিয়া সাহজাহানের সেনাপতি মীরজুম্লা আমেদনগর আক্রমণ করিলেন।

সাহজি পরাজিত হইলেন। আমেদনগর যায় যায়। সাহজি দেখিলেন, তিনি রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়াই শ্বশুর ঈর্ষ্যা বশতঃ এই বিপদ ঘটাইয়াছেন। তিনি রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিলে হয় তো রাজ্য রক্ষা হইতেও পারে। এই মনে করিয়া তিনি বিজাপুরের রাজসরকারে কর্ম্ম লইয়া সপরিবারে আমেদনগর ত্যাগ করিলেন।

লুখজি তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন।

সাহজি দেখিলেন, সপরিবারে লুখজীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। জিজা হাজার হইলেও লুখজিরই কন্যা।

লুখজির হাতে পড়িলে তিনি অবমানিতা বা উৎপীড়িতা হইবেন না। এই চিন্তা করিয়া একশত সহচরের উপর সাত মাস গর্ব্ভবতী জিজার রক্ষার ভার দিয়া, জ্যেষ্ঠপুত্র শাম্ভাজি ও বাকী সৈন্য লইয়া তিনি দ্রুত পলায়নে বিজাপুরে উপস্থিত হইলেন।

জিজা অচিরে পিতার হস্তে বন্দিনী হইলেন। লুখজি বন্দিনী কন্যাকে শিউনারী দুর্গে পাঠাইলেন।

দেবতায়, দেবসেবায় ও ধর্ম্মে চিরদিনই জিজার প্রগাঢ় ভক্তি। এখন, স্বামী, পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পিতাও শত্রুর পত্নী বলিয়া তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন; সংসার-ধর্ম্ম বলিয়া, জিজার এখন আর কিছুই নাই। একান্ত মনে জিজা সেই দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর আরাধনায় প্রাণ মন সঁপিয়া দিলেন।

কিন্তু সংসারের সুখ সব ফুরাইলেও সন্তানের প্রতি মমতা নারীর কখনো ফুরাইতে পারে না। বন্দিনী অবস্থায় জিজার সংসারের আর কোন বন্ধন ছিল না সত্য, কিন্তু গর্ব্ভস্থ শিশুর প্রতি মাতার স্বাভাবিক মমতার টানে তাঁর সর্ব্বদা প্রাণ টানিত।

সাংসারিক সুখের কোন সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থগত লিপ্সা তাঁহাতে ছিল না। পতিবিরহিতা বন্দিনী জীজা, সেই শিউনারী দুর্গে সন্তান লইয়া নূতন সংসার পাতিয়া সাংসারিক সুখে সুখী হইবেন, এ বাসনাও কখনো মনে করেন নাই। তাঁহার মন কেবল বলিত,—হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি ভারতে ছোট হইয়া আছে; বীর ও ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করিবেন, সেই পুত্র ভারতে

আবার হিন্দুর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবে। এই উচ্চ কামনায় মহাপ্রাণা সাংসারিক সুখ বিচ্ছিন্না জিজার হৃদয় ক্রমে একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই কামনা লইয়া জিজা নিত্য মনে-প্রাণে শিবাই দেবীর অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিতেন।

দেবীর মন্দিরে বসিয়া তদ্গতচিত্তে করজোড়ে জিজা কহিতেন,—

"—মা! সংসারে আমার আর কোন সুখ নাই, কোন সুখের আকাঙ্ক্ষাও রাখি না। গর্ভে তুমি যে সন্তান রাখিয়াছ, সে তোমারি হউক। তোমার দয়ায়, তোমার বরে তোমার শক্তি লইয়া সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হউক। সেই পুত্র হইতে আমি নিজে কোন সুখ চাই না, পুত্রের নিজের ভোগ সুখও আমি বাসনা করি না। একমাত্র তোমার দাস হইয়া তোমার সেবায় তার মানব জীবন সার্থক হউক। মা, নিত্য যে ভক্তি লইয়া তোমাকে ডাকি, তোমাকে পূজা করি, সেই ভক্তি তোমার কৃপায় আমার গর্ব্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক, সেই ভক্তির আশীর্ব্বাদে তোমার বিশ্বজয়িনী বিশ্বপালিনী শক্তিতে তার প্রাণ পূর্ণ হউক;—সেই শক্তিতে ভারতে তোমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। আর আমার কোন বাসনা, কোন প্রার্থনা নাই মা। তোমার দাসী আমি এই একমাত্র বাসনা, একমাত্র প্রার্থনা লইয়া নিত্য তোমার দ্বারে আসিয়া তোমাকে ডাকিতেছি। দাসীর প্রার্থনা কাণে শোন মা; দাসীর বাসনা পূর্ণ কর মা।

—মা! বীরপুত্র—ধার্ম্মিক পুত্র, যে পুত্র হইতে দেবতার গৌরব, ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা পায়—এমন পুত্র প্রসবেই নারী-জীবনের সার্থকতা। আমি অনেক দুঃখ পাইতেছি, অনেক দুঃখ পাইয়া সে দুঃখের শাস্তি তোমার কাছে চাই না মা, তোমার শক্তি তোমার মহিমা জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, এমন ধার্ম্মিক পুত্র দানে আমার নারীজীবন সার্থক কর।"

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, গর্ব্ভাবস্থায় মাতার মানসিক অবস্থা, মাতার সাধনা, মাতার বাসনার ফল পুত্রে সঞ্চারিত হয়। গর্ব্ভের সূচনা হইতেই জিজা যুদ্ধ-কোলাহলের মধ্যেই রহিয়াছেন। বীরাঙ্গনার বীর হৃদয় এই যুদ্ধ কোলাহলে উৎসাহের উল্লাস ব্যতীত ভয়ের চমকে কখঁনো কাঁপে নাই। তার পর যুদ্ধের শেষে বাকী কয়েক মাস জিজা একমনে শক্তিরূপিনী জগন্মাতার অর্চ্চনায়, দেবীর নিকটে বীর ও ধার্ম্মিক পুত্রকামনায় কাটাইয়াছেন। ইহাতে পুত্রের মনে যে স্বভাবতঃই বীরত্বের ও ধর্ম্মের ভাবই প্রবল হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। এমন পুণ্যময় সাধনার ফলে, যথা সময়ে জিজা, সেই শিউনারী দুর্গে বাসনার অনুরূপ জগদুজ্জ্বল পুত্র প্রসব করিলেন। শিবাই দেবীর বরে শিবাই দেবীর সেবক রূপ পুত্র পাইয়াছেন বলিয়া জিজা পুত্রের নাই 'শিবাজী' রাখিলেন।

(৩)

সাহজি, আমেদনগর রাজ্যের প্রদত্ত তাঁহার পিতৃ-

পৈতামহিক জমিদারী ও জায়গীর ভোগ করিতেন। লুখজির চক্রান্তে আমেদনগর ছাড়িয়া বিজাপুরে যাওয়ায় আমেদনগর রাজ্যের অধীনস্থ পৈতৃক জমিদারী ও জায়গীর সমুদয় সাহজিকে হারাইতে হইল। শিবাজির জন্মের কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার সম্পত্তি আবার সব ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু, বিজাপুরের রাজার সেনাপতিরূপে সর্ব্বদা তাঁহাকে কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত বলিয়া নিজে আসিতে পারিলেন না। দাদো কোণ্ডদেব নামক কোন সুবিজ্ঞ উদার ও উন্নতচরিত্র ব্রাহ্মণের হস্তে সাহজি নিজের জমীদারী, জায়গীর এবং স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। দাদোজির অভিভাবকত্বের অধীনে জিজা ও শিবাজি শিউনারী দুর্গেই বাস করিতে লাগিলেন। এ দুর্গও সাহজির জায়গীরের মধ্যেই ছিল।

সাধনাবলে গর্ব্ভাবস্থায় পুত্রের হৃদয়ে জিজা যে মহত্ত্বের বীজ রোপন করিয়াছেন, উপযুক্ত শিক্ষার ও আত্মজীবনের উচ্চ আদর্শে সেই বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি নিজের মন ও সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। যে কামনা করিয়া শিবাই দেবীর নিকট পুত্র চাহিয়াছিলেন, পুত্রের মহত্ত্বে সেই বাসনা পূর্ণ করাই জিজার জীবনের একমাত্র ব্রত হইল। ভবানীর বরে পুত্র পাইয়াছেন, পুত্র যাহাতে ভবানীর পায়ে আত্মদান করিয়া ভবানীর আশীর্ব্বাদে ভবানীর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ভারতে হিন্দুর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত করিতে পারে, পুত্র সম্বন্ধে ইহাই

জিজার সর্ব্বোচ্চ কামনা। শৈশব হইতেই সেইরূপ ভাবে তিনি পুত্রকে দীক্ষিত, তদুপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই তিনি পুত্রকে বলিতেন,—"শিব্বা, ভবানীর পূজা করিয়া ভবানীর বরে, ভবানীর আশীর্ব্বাদে তোমাকে পাইয়াছি। আমার সুখের জন্য নয়, তোমার পিতা বা অন্য কারো সুখের জন্যও নয়, মা ভবানী তাঁর নিজের কার্য্যের জন্য তোমাকে তাঁর এই দাসীর কোলে দিয়াছেন। তুমি আমার নও,—ভবানীর। তুমি তাঁর ধন, তাঁর কার্য্যে তোমাকে সঁপিয়া দিব বলিয়াই তিনি তোমাকে আমার হাতে দিয়াছেন। তিনিই তোমার মা, তিনিই তোমার ইষ্টদেবী। তাঁর পায়ে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া,—তিনি যে পথে চালান, সেই পথে নির্ভয়ে চলিবে। তিনি তোমাকে শক্তি দিবেন, অভয় দিবেন, সকল বিপদে রক্ষা করিবেন। নির্ভয়ে মনপ্রাণ সঁপিয়া পাপময় ভারতে আবার মা ভবানীর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। প্রাচীন কালে ভারতে যে সব মহা-পুরুষ ও মহাবীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতা ও ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব মহাপুরুষের কথা, তাঁহাদের গুণের কথা, মহত্ত্বের কথা, কীর্ত্তির কথা সর্ব্বদা মনে করিবে। তাঁহাদের মত হইয়া দেবতা ও ধর্ম্মের গৌরবে আবার যাহাতে এই হতভাগ্য দেশ গৌরবময় করিতে পার, সর্ব্বদা প্রাণে মনে সেই চেষ্টা করিবে। লক্ষ্মণ ও অর্জ্জুনের মত বীরত্বে ধর্ম্মে ও

প্রতিজ্ঞায় অটল হও। রামের মত ও যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজ্যেশ্বর হইয়া প্রজারঞ্জনে রাজধর্ম্মপালন কর, আমার এই বাসনা, এই আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বদা আমার এই কথাগুলি মনে রাখিবে। এই ধর্ম্ম, এই ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য কর, আমার 'মা' নাম সার্থক কর।"

রাম লক্ষ্মণ, ভীষ্মার্জ্জুন প্রভৃতি রামায়ণ ও মহাভারতের বীর ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণের জীবনের, তাঁহাদের আদর্শ কীর্ত্তির কথা শিবাজি দাদোজির নিকট শুনিতেন। এই সব মহাপুরুষ-গণের কর্ম্মফলে প্রাচীন ভারত কত বড় ছিল, কেমন করিয়া, ভারতবাসীর কি দোষে, হিন্দুর কি কুকর্ম্মের ফলে, ভারত আবার এই সময় কতদূর হীন হইয়া পড়িয়াছিল, এই সকল কথা নিত্য দাদোজি তাঁহাকে বুঝাইতেন। আবার কি আদর্শে জীবন গঠন করিয়া কি প্রকারে শিবাজি ভারতের প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তাহাও তিনি বালকের মানস নয়নের সম্মুখে ধরিয়া ধরিয়া দেখাইতেন। মা'র এক একটি কথায় সেই গুলি শিবাজির মনে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইতেছিল।

কেবল কথা শিখিয়া মানুষ মানুষ হয় না; শিক্ষা মত সাধনা চাই। একে হৃদয়-ভরা আকুলতা, মায়ের অমৃত বাণী, তাহাতে দাদোজির সুবন্দোবস্তে শৈশব হইতেই শিবাজি প্রতিদিনের কার্য্যে এই সব উচ্চ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে শিখিতে লাগিলেন। নানারূপ ব্যায়াম কৌশল ও অস্ত্র চালনায় যাহাতে মনের মত শরীরও সুগঠিত হয়, দাদোজি তাহারও

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাতা ও অভিভাবকের এমন শিক্ষার গুণে, শৈশব হইতেই, একদিকে যেমন ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ, অন্য দিকে দেশের সেই ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মের গৌরব স্থাপনের জন্য শিবাজির হৃদয়ে তেমনি বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার শক্তি বিকশিত হইতে লাগিল। মায়ের সাধনা সফল হইতে চলিল।

(৪)

ক্রমে বড় হইয়া শিবাজির মনে এই ধারণা হইল, ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন ব্যতীত হিন্দুর ধর্ম্ম ও জাতীয় গৌরব রক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। ধীর ভাবে তিনি তাঁহার অধীনস্থ জায়গীরের সমস্ত ধন-বল ও জন-বল লইয়া এই কার্য্যের উপযোগী শক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহজি বিজাপুরের রাজকর্ম্মে দূর কর্ণাট প্রদেশেই সর্ব্বদা থাকিতেন। দাদোজি ও শিবাজির উপরেই পৈতৃক জায়গীরাদির সম্পূর্ণ ভার ছিল। সুতরাং জীবনের ব্রত সাধনে শিবাজির কোনরূপ বাধা বা বিরোধ উপস্থিত হয় নাই।

সাংসারিক সুখভোগে জিজার বিশেষ আসক্তি ছিল না। যে মহৎ ব্রতে পুত্রকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই ব্রত পালনে পুত্রের সহায়তা করাই তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেন, তাই তিনি অধিকাংশ সময় পুত্রের নিকটেই থাকিতেন। স্বামীর সংসারে থাকিয়া স্বামীর সেবা করা যে, নারীর ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম অপেক্ষাও মহৎ ব্রতপরায়ণ পুত্রের মাতৃত্ব-

ধর্ম্ম তিনি বড় মনে করিতেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার অভাবে স্বামীর গৃহধর্ম্ম পালনে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না, কারণ তাঁহার সপত্নী তুকাবাই স্বামীর সঙ্গে আছেন। তুকাবাইএর হাতে স্বামীসেবা ও স্বামীর গৃহ ধর্ম্ম পালনের ভার সন্তুষ্ট চিত্তে সঁপিয়া দিয়া, মহাপ্রাণা জিজা পুত্রের সংসারের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

শিবাজির যখন কুড়ি বৎসর বয়স, তখন দাদোজি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। দাদোজি যে শিবাজির কত বড় সহায়, দাদোজির অভাবে যে আর কাহারো দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইবার নহে, তাহা জিজা জানিতেন। পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দিবা রাত্রি জিজা দাদোজির শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন।

কিন্তু বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ শরীর রোগের এ কঠোর আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। দাদোজিও বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু নিকটে। তিনি শিবাজিকে রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য পালন, রাজ ধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া কহিলেন,—"শিব, আমি চলিলাম বলিয়া দুঃখিত ও নিরাশ হইও না। বাল্যকাল হইতে তোমাকে যাহা শিখাইয়াছি, এখন তোমাকে যাহা বলিলাম, সব যদি তাহা মনে রাখ, যদি কায়মনোবাক্যে সেই শিক্ষা ও উপদেশ অনুসারে চল, তবে আমি মরিয়াও জীবিতের ন্যায় তোমার কাছে রহিব. তারপর, তোমার মা রহিয়াছেন, আমা অপেক্ষা ইনি তোমার কম সহায় নন। গৃহকার্য্যে, ধর্ম্মকার্য্যে ও রাজকার্য্যে ইঁহাকে ঈশ্বরের মত

মানিবে। ইঁহার আশীর্ব্বাদে ও ভবানীর কৃপায় তোমার কোন অমঙ্গল হইবে না।”

কিছুদিন পরে দাদোজির মৃত্যু হইল। মৃত্যুমুখেও দাদোজি অনেক উপদেশ ও উৎসাহ বাক্যে শিবাজিকে প্রবোধিত করিলেন। কথিত আছে, স্বামীর মৃত্যু হইবামাত্র দাদোজির স্ত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং সেই মূর্চ্ছাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৫)

দাদোজির মৃত্যুর পর শিবাজি নিজের হাতে জমীদারী ও জায়গীর শাসনের ভার নিলেন। সাহজি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের উপর পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির ভার রাখিয়া বিজাপুরের রাজকার্য্যে কর্ণাটেই রহিলেন।

দাদোজি এখন নাই। কর্ত্তব্য পথে চলিবার পক্ষে জিজাই এখন শিবাজির প্রধান সহায়। মাতার উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে শিবাজি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আয়োজন বিশেষ ভাবে আরম্ভ করিলেন। মাতার প্রতি শিবাজির এমন ভক্তি ছিল, মাতার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপর তাঁহার এতদূর আস্থা ছিল যে, এই সময় রাজ্য-স্থাপনের আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজ্যস্থাপন এবং তাহার শাসনকালেও, জিজা যতদিন জীবিত ছিলেন, মাতার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া শিবাজি কখনো কোন

কার্য্যে হাত দিতেন না। যুদ্ধ বিগ্রহ বা অন্য কোন প্রয়োজনে শিবাজি কখনো দূরে গেলে, জিজাই তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্য শাসন করিতেন।

মারাঠা দেশে মবালা নামে নীচ জাতীয় এক সম্প্রদায় লোক ছিল। এই মবালারা যার-পর-নাই দৃঢ়, বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। এই সব মবালাদিগকে সদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিয়া ইতিপূর্ব্বেই শিবাজি তাহাদিগকে লইয়া একদল অতি বিশ্বাসী ও সাহসী সৈন্য গঠন করেন। স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে তাঁহার সহায়তা করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত ও বিশ্বস্ত অনুচরগণের উপর এই মবালা সৈন্যের ভার দিয়া, তিনি এখন চারিদিকে রাজ্য বিস্তার ও দুর্গজয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহাতে বিজাপুরের সুলতানের অধীনস্থ অন্যান্য জায়গিরদার ও দুর্গাধিপতিগণের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ক্রমে সুলতানের কাণেও শিবাজির ক্রমাগত এইরূপ যুদ্ধ ও বিজয়ের সংবাদ পৌঁছিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিবাজি কল্যাণ ও কোকন প্রদেশ অধিকার করিলেন।

সুলতান দেখিলেন তাঁহারই অধিকার মধ্যে শিবাজি এত রাজ্য বিস্তারে এরূপ শক্তি গঠন করিতেছেন, যে, অচিরে এই শক্তি দক্ষিণভারতের মুশলমান শক্তিকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। ক্রোধে ও ভয়ে তিনি সাহজিকে ইহার প্রতিকার করিতে আদেশ করিলেন।

সাহজিও পুত্রের এরূপ শক্তি বিকাশে বিস্মিত ও চকিত

হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পুত্র আপন প্রতিভাবলে যাহা করিতেছে, তাহাতে বাধা দিবার শক্তি তাঁহার নাই। এরূপ ইচ্ছাও তাঁহার হইল না। কিন্তু তিনি সুলতানের কর্ম্মচারী, সুলতানের কোপে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাই কিছু ভীত হইলেন। সুলতানকে জানাইলেন, শিবাজি এখন স্বাধীন, তাঁহার পৈতৃক জায়গীরাদি সব শিবাজির হাতে এবং শিবাজির উপর কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব তাঁহার নাই। শিবাজিও এসব কার্য্যে পিতার মত জিজ্ঞাসা বা গ্রহণ করেন না।

সাহজির এ কথা সুলতান বিশ্বাস করিলেন না। তিনি কৌশলে সাহজিকে বন্দী করিয়া ঘোষণা করিলেন, যদি শিবাজি সত্বর তাঁহার বিজিত রাজ্য ফিরাইয়া না দেন তবে তিনি সাহজির কারাগৃহের দ্বার প্রাচীরে গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিবেন এবং আহার ও বায়ুর অভাবে তাঁহাকে মরিতে হইবে।

এই দারুণ সংবাদ পাইয়া শিবাজি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। একদিকে শত্রুর হস্তে পিতার এই ভীষণ মৃত্যু, অপর দিকে হিন্দুরাজ্য স্থাপন রূপ জীবনের ব্রত ত্যাগ। তিনি কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। মাতা এই দারুণ সংবাদে বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারিবেন না ভাবিয়া শিবাজি প্রথমে তাঁহার স্ত্রী সই বাইএর মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

সই বাইও শিবাজির মত মহাপুরুষের যোগ্য সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি কহিলেন,—"তোমার পিতাকে যে উপায়েই হউক, রক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু এ দিকে দেবতা ও ধর্ম্ম

রক্ষার জন্য স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার কোন বিঘ্ন না হয় তাহাও দেখিতে হইবে। যদি কেবল বিষয় ভোগের জন্য রাজ্য জয় করিতে, তবে এই মুহূর্ত্তে তাহা ফিরাইয়া শ্বশুরকে মুক্ত করিয়া আনিতে বলিতাম। কিন্তু এ রাজ্য তোমার নিজের ভোগের জন্য নয়, দেবতা, গো-ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মের মান রক্ষার জন্য। স্বজন যত বড় হউক, যত গুরুই হউক, তাঁর রক্ষার চেষ্টা যত বড় ধর্ম্মই হউক, এ ধর্ম্মের উপরে নয়। তাঁর বক্ষার জন্য এ রাজ্য বিসর্জ্জন দেওয়ার অধিকারও তোমার নাই। আমি আর কি বলিব? চিন্তা কর, কৌশলে সুলতানকে ভুলাইয়া, কি, বাধ্য করিয়া, পিতাকে উদ্ধার কর। ভয় করিও না। মা ভবানী তোমার সহায়, তোমার হাতে এ তাঁরি ধর্ম্মরাজ্য অর্পিত। এ বিপদে তিনিই পথ দেখাইবেন।”

ক্রমে জিজাও এ সংবাদ শুনিলেন। শুনিয়া জিজা বধূর মতে মত দিলেন।

চতুর ও সূক্ষ্মবুদ্ধি শিবাজি চিন্তা করিয়া এক সুন্দর কৌশল স্থির করিলেন এবং এই কৌশলেই সাহজি মুক্তিলাভ করেন।

ভারতের সর্ব্ব প্রধান রাজশক্তি বলিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্রতর স্বাধীন রাজারাও দিল্লীর শক্তিকে একটু ভয় ও খাতির করিয়া চলিতেন। একেবারে তাহাকে অবহেলা করিতে সাহস পাইতেন না। এদিকে দিল্লীর সম্রাটেরাও দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলি যাহাতে তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করে এ বিষয়ে

চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। সুতরাং একদিকে বিজাপুরের সুলতানও যেমন দিল্লীর সম্রাটকে সহজে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিবেন না, অপরদিকে দিল্লীর সম্রাটও যে, কোন বিষয়ে বিজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। চতুর রাজনৈতিক শিবাজি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সাহজাহানকে অতি বিনীত ভাবে এক পত্র লিখিলেন। সাহজি এক সময় সম্রাটের সেনাপতি ছিলেন, এবং সম্রাটও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, এই সব কথা বলিয়া এবং নিজেও যে, সম্রাটের নিতান্ত অনুগত এইরূপ বুঝাইয়া তিনি পিতার মুক্তির আদেশ প্রার্থনা করিলেন। উদারচেতা সাহজাহান শিবাজির পত্রে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া সাহজিকে মুক্তি দিবার জন্য বিজাপুরের সুলতানকে আদেশ করিলেন।

সুলতান এ আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। সাহজি কারামুক্ত হইয়া আবার নিজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বাকী জীবন সাহজি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কর্ণাট প্রদেশের সেনাপতি ও শাসন কর্ত্তার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। পুত্রের রাজ্য-বিস্তারে আপন স্বার্থের জন্য তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুলতানও সাহজির উপর আর কোন উৎপীড়নের চেষ্টা করেন নাই। কারণ, তিনি অনেক দৃষ্টান্তে বুঝিয়াছিলেন যে, শিবাজির সঙ্গে তাঁহার এইরূপ বিরোধ সত্ত্বেও সাহজি অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। সাহজির বিশ্বস্ততা, বীরত্ব ও দক্ষ সেনাপতিত্বের গুণেই কর্ণাট

প্রদেশে বহুকালব্যাপী বিদ্রোহ নিবারিত হইয়া অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

সাহজির ব্যবহারও বাস্তবিক যার-পর-নাই বিস্ময়জনক। পুত্রের প্রতি তিনি নিতান্ত স্নেহশীল ছিলেন, পুত্রও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আজীবন তিনি পুত্রের শত্রুর রাজ্যে সেনাপতিত্ব করিয়াছেন,কিন্তু পুত্রের সঙ্গে তিনি শত্রুতা করেন নাই, অথবা গোপনে নিজ প্রভুর ক্ষতিকর কোন সহায়তাও করেন নাই। পুত্রের কার্য্য, পুত্রের রাজ্য বিস্তারে সম্পূর্ণ উদাসীনতাই তিনি দেখাইয়াছেন। এক দিকে যেমন শেষ জীবনে বিরাম উপভোগের জন্য পুত্রের অধীন কখনো হন নাই, অপর দিকে তেমনি রাজ্য বা ক্ষমতা লোলুপ হইয়া পুত্রের উপর অথবা পুত্রের রাজ্যের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব করিতেও কোনরূপ ইচ্ছা বা আগ্রহ দেখান নাই। এরূপ ত্যাগ ও উদাসীনতা অল্প মহত্বের লক্ষণ নহে।

(৬)

বিজাপুরের সঙ্গে শিবাজির বিরোধ চলিতে লাগিল। শিবাজির শক্তিবৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তার বিজাপুর রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি ও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। এই সময় সুল-তানের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বালকপুত্র সিংহাসনে ছিলেন। বালকের মাতা প্রধান সেনাপতি ও কর্ম্মচারীরূপে আফজল্ খাঁ নামক কোন সম্ভ্রান্ত মুশলমানের হাতেই রাজ্যভার

দিয়াছিলেন। শিবাজির ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবেন বলিয়া বহু সৈন্য লইয়া আফজল্ খাঁ শিবাজির রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পথে তিনি তুলজাপুর নামক কোন তীর্থ স্থানে ভবানীর মন্দির ধ্বংস করিয়া অনেক তীর্থযাত্রীকে হত্যা করিলেন। তারপর সে স্থান হইতে পণ্ডরপুর নামক আর এক তীর্থে গিয়াও অনেক দেবমন্দির নষ্ট করিলেন।

শিবাজি যথাসময়ে এই ভীষণ ও নিদারুণ সংবাদ পাইলেন। ভগবতী ভবানী তাঁর ইষ্টদেবী। হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য স্বাধীন হিন্দুশক্তি স্থাপন তাঁর জীবনের ব্রত। আজ বিধর্ম্মী শত্রুর হাতে ইষ্টদেবীর মন্দির ধ্বংস হইল, হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মের এমন অবমাননা হইল, এই চিন্তায় সহস্র বিষময় শেলে শিবাজির মর্ম্ম বিদ্ধ হইতে লাগিল। দেশে হিন্দু থাকিতে, হিন্দুর নেতৃত্বে ভবানীর বরপুত্র, ভবানীর চরণে আত্মবিক্রীত দাস তিনি জীবিত থাকিতে, আজ ভবানীর এই অবমাননা, হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মের এই লাঞ্ছনা! ধিক্ তাঁহার জীবনে! ধিক্ হিন্দুর ধর্ম্ম গৌরবে! এই অবমাননার প্রতিশোধের জন্য প্রত্যেক হিন্দুর সহস্র মরণ কি বাঞ্ছনীয় নয়? হিন্দুর হৃদয়-শোণিতের উষ্ণ তর্পণ ব্যতীত অবমানিত দেবতার রোষ, লাঞ্ছিত দেবতার অভিশাপ কি আর কিছুতে দূর হইতে পারে? চিন্তার তরঙ্গাভিঘাতে শিবাজির হৃদয়ে যেন মহাপ্রলয়ের কালাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নি তাঁহার সহচর ও সৈন্যগণের হৃদয়ও প্রচণ্ডবেগে স্পর্শ করিল।

এই আগুন বুকে লইয়া সকলে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে শিবাজি জননীর নিকটে গিয়া তাহার চরণে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

জিজা কহিলেন,—"যাও শিব্বা, ভবানীর পুত্র তুমি, ভবানীর চরণসেবায় দীক্ষিত। ভবানীর ইচ্ছায়, ভবানীর আশীর্ব্বাদে হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মরক্ষা তোমার জীবনের ব্রত। তোমার সমক্ষে, তোমার শত্রু আজ ভবানীর এমন অবমাননা, হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মের এমন লাঞ্ছনা করিয়াছে, যদি ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধে দেবতা ও ধর্ম্মের নষ্ট সম্মান আবার ফিরাইয়া না আনিতে পার, তবে বৃথা আমার সাধনা, বৃথা তোমার জন্ম জীবন, বৃথা তোমার শিক্ষা দীক্ষা, বৃথা তোমার জীবনের ব্রত, বৃথা তোমার রাজধর্ম্ম। যাও শিব্বা, মনে প্রাণে যদি ভবানীর সেবক হও, হৃদয়ের শোণিত দানে, সর্ব্বস্ব ত্যাগে যদি ভবানীর মান রাখিতে সত্যই প্রস্তুত হও, ভবানীর আশীর্ব্বাদ ভবানীর এই ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে জয়যুক্ত করিবে। যাও শিব্বা, ভবানীর পায়ে মন প্রাণ সঁপিয়া বীররঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যুদ্ধে যাও, ভবানীর দানবদলনী ত্রিলোকত্রাসিনী, বিশ্ববিজয়িনী শক্তি তোমার ও তোমার সহচরগণের হৃদয়ে ও অসিতে সঞ্চারিত হউক।"

শিবাজি যুদ্ধে গেলেন।

শিবাজির কৌশলে আফজল খাঁ নিহত ও তাঁহার সৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হইল।

বিজয় গৌরবে বীর বীরমাতার চরণে ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দের অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে জিজা বিজয়ীপুত্র ও তাঁহার সহচরগণকে নিজে আসিয়া বিজয়মাল্য দানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

শিবাজির বিজয়গৌরব ও রাজ্যবিস্তারের কথা সাহজি সকলই শুনিতেছিলেন। তাঁর বড় ইচ্ছা হইত, বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরবস্বরূপ এমন পুত্রকে একবার চক্ষে দেখেন, বুকে ধরেন! কিন্তু নানারূপ বিবেচনায় প্রাণের এ বাসনা তিনি বহুদিন দমন করিয়া রাখেন। বিজাপুরের রাজকর্ম্ম ছাড়িয়া তিনি একেবারে পুত্রের নিকট গিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ, তিনি জানিতেন, তাঁহার উপস্থিতিতে শিবাজির স্বাধীন শক্তি বিকাশে কিছু বাধা হইতে পারে। আর, বিজাপুরের রাজকর্ম্মে থাকিয়াও বিজাপুরের শত্রু পুত্রের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ দূরের কথা, কোন সম্বন্ধ পর্য্যন্ত রাখাও বিশেষ সন্দেহের কারণ হইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে সাহজি নিতান্ত সতর্কতার সঙ্গে চলিতেন। মহৎ হৃদয় সাহজি এমন বিশ্বস্তভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, যে, বিজাপুররাজ কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া প্রথম সেই কারামুক্তির পর বরাবর তাঁহাকে কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতির পদে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।

এইবার সাহজির মনোবাসনা সিদ্ধির বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। বিজাপুররাজ শিবাজির সঙ্গে ক্রমে যুদ্ধ চালাইতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় সন্ধির প্রস্তাব লইয়া সাহজি শিবাজির নিকট গমন করিলেন।

বিপুল আয়োজনে শিবাজি পিতার অভ্যর্থনা করিলেন। বিজাপুরের রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার অর্জ্জিত রাজ্যের রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকিতে তিনি পিতাকে অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনরূপ যে মহাব্রত শিবাজি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তার যোগ্য, সাহজি নন, এই বলিয়া উদার ও মহাপ্রাণ সাহজি পুত্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিছুদিন পত্নী ও পুত্রের নিকট থাকিয়া, শেষে, বিজাপুরের সঙ্গে আর শত্রুতা না করেন, এই বিষয়ে পুত্রকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া তিনি নিজ কর্ম্মে ফিরিয়া গেলেন। পিতার অনুরোধ মত শিবাজি বিজাপুররাজের সঙ্গে সন্ধি করিলেন।

(৭)

শিবাজির প্রতাপে দুর্ব্বল বিজাপুরের সঙ্গে শিবাজির বিবাদ মিটিল বটে, কিন্তু প্রবল মোগল-শক্তির সঙ্গে এখন তাঁহার ভীষণ ও বহুকালব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ঔরংজেব এখন দিল্লীর সম্রাট্। শিবাজিকে দমন করিবার জন্য তিনি সেনাপতি সায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজির কৌশলে ও বীরত্বে সায়েস্তা খাঁ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে সাহজির মৃত্যু হইল। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া জিজা সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু স্বামীর জীবিতকাল হইতেই পুত্রের জন্য যিনি একরূপ

স্বামীত্যাগিনী হইয়াছিলেন, যে মহৎ কর্ত্তব্যের জন্য আজীবন নারীজীবনে অসাধ্য এমন কঠোর ত্যাগ দেখাইয়াছিলেন, স্বামীর মৃত্যুতে, শোকে অধীর হইয়া স্বামীর অনুগমনে সেই কর্ত্তব্য তিনি বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ? তাঁহার মত ধর্ম্মশীলা ত্যাগশীলা ও তেজস্বিনী নারীর কি শোকে এমন আত্মবিস্মৃতি শোভা পায় ? পুত্রের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ও ধর্ম্মরাজ্য পালনের সহায়তা করাই তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা, একমাত্র ব্রত ;—আজ স্বামীর শোকে আত্মহারা হইয়া যদি তিনি এই সাধনা, এই ব্রত ত্যাগ করেন, তবে এতদিন এ কঠোর সন্ন্যাসের সার্থকতা কি হইল ? যে শক্তিবলে শিবাজি আজ এত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, সে শক্তির মূলে তিনি ;—তিনি চলিয়া গেলে, কি অবলম্বন করিয়া সেই শক্তি মোগল সংঘর্ষের ভীষণ বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইবে ? শিবাজি ও অন্যান্য সকলে জিজাকে এইরূপ অনেক বুঝাইলেন। জিজাও অনেক চিন্তা করিয়া ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন, সহমরণের সংকল্প ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী বিধবা, পুত্রের বীরধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম পালনের সহায়তায় জীবন সমর্পণ করিলেন।

শিবাজি রাজ্যজয় করিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন, রাজার ন্যায় প্রজা শাসন করিতেছেন, কিন্তু রাজা নাম এখনো গ্রহণ করেন নাই। কারণ, পিতা এতদিন জীবিত ছিলেন। পিতা রাজ্য গ্রহণ করিয়া রাজা উপাধি নিতে অনিচ্ছুক ; পুত্র কি প্রকারে তাঁহার সমক্ষে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন ? শিবাজির

ন্যায় মহাপুরুষ পিতার এরূপ অবমাননা করিতে পারেন না। এখন পিতা স্বর্গগত, রাজ্যও তাঁহাকে রাজারূপে—রাজ-উপাধিতে ভূষিত দেখিতে চাহে ; সুতরাং শিবাজি রায়গড় দুর্গে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। শিবাজির নামে রাজ্যে মুদ্রা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল।

মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছে। শিবাজি বার বার মোগলরাজ্য আক্রমণ করিয়া সুরাট ও অন্যান্য অনেক নগর লুণ্ঠন করিলেন। ঔরংজেব অম্বররাজ জয়সিংহ ও দিলির খাঁ নামক তাঁহার দুই জন প্রধান সেনাপতিকে শিবাজির বিরুদ্ধে পাঠাইলেন।

হাজার হইলেও জয়সিংহ হিন্দু ও রাজপুত। তিনি শিবাজির বীরত্বে মুগ্ধ ও গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন। কিছুকাল যুদ্ধের পর তাঁহার চেষ্টায় শিবাজি বিজিত মোগল প্রদেশসমূহ ফিয়াইয়া দিয়া, ঔরংজেবের সঙ্গে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন। আরো কথা হইল, শিবাজি দিল্লীতে গিয়া ঔরংজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

শিবাজি, পুত্র শম্ভাজীকে লইয়া দিল্লীযাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালের জন্য জিজাবাই রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া রহিলেন। কতিপয় দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জিজাবাইএর অধীনে রাজকার্য্য চালাইবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

দিল্লীতে পৌছিয়া শিবাজি দরবারে ঔরংজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দরবারে ঔরংজেব শিবাজির উপযুক্ত সম্মান

করিলেন না। তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের মধ্যে তিনি শিবাজির বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট করেন। এই অবমাননায় ক্রুদ্ধ শিবাজি দরবার হইতে বাসগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাদসাহের আদেশে সেই গৃহের চারিদিকে মোগল-প্রহরী বসিল। মোগলের বিশ্বাসঘাতকতায় শিবাজি বন্দী হইলেন।

মারাঠারা এই দারুণ দুঃসংবাদে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। জিজাবাই ইস্টদেবী ভবানীর আরাধনা করিয়া কহিলেন,—"মা, তোমার ইচ্ছা তুমিই জান। শিব্বা আমার নয়, তোমার। যে বিপদেই সে পড়ুক, তোমার কার্য্য সাধনে যদি তোমার দাসের প্রয়োজন থাকে, তুমি তাকে রক্ষা করিবেই। কিন্তু মা, আমি দুর্ব্বল রমণী। শিব্বা আমার জীবনসর্ব্বস্ব। এই দারুণ বিপদের ভার সহিতে তোমার এ দাসীকে বল দাও মা! আমার হাতে শিব্বা তার ধর্ম্মরাজ্যের ভার রাখিয়া গিয়াছে, শক্তি দাও মা, যেন তার রাজশক্তি আমি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। তোমার কৃপায় শিব্বা যখন ফিরিয়া আসিবে, যেন সে দেখিতে পায়, তার বিপদে রাজ্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই।"

দেবীর ধ্যানে ও আরাধনায় জিজার হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল। ধীর ও শান্ত চিত্তে তিনি কর্ম্মচারিগণকে ডাকিয়া উৎসাহবাক্যে তাঁহাদের মন হইতে ভয় ও অবসন্নতা দূর করিলেন এবং রাজার বিপদে ও অনুপস্থিতিতে রাজ্যের যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট না হইতে পারে, তাহার জন্য সকল প্রকার সুব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে শিবাজি দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় আছেন। তিনি বুঝিলেন, চাতুরী ভিন্ন ঔরংজেবের হাত হইতে মুক্তি পাইবার আর কোন উপায় নাই। তখন কিছুদিন এইরূপ ভাব দেখাইলেন, যেন, বন্দী অবস্থায় তিনি বেশ সুখে ও সন্তুষ্ট চিত্তে আছেন, এবং মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার কোন বিশেষ আগ্রহ নাই। তার পর সহসা কঠিন পীড়ার ভাণ করিয়া, পীড়া আরোগ্যের জন্য ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে এবং নানা দেবালয়ে বড় বড় ঝুড়ী করিয়া মিষ্টান্ন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিনই ঝুড়ী ঝুড়ী মিষ্টান্ন বাহিরে যায়, প্রহরীরা ক্রমে অসতর্ক হইল, আর মিষ্টান্নের ঝুড়ী পরীক্ষা করিত না। শেষে একদিন শিবাজি পুত্র শম্ভাজিকে এক ঝুড়ীতে বসাইলেন এবং নিজে আর এক ঝুড়ীতে বসিলেন। উপরে মিষ্টান্ন দিয়া ঝুড়ী ঢাকা হইল। অনুচরগণ ঝুড়ী লইয়া দিল্লীর বাহিরে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া শিবাজি ও শম্ভাজি দুইজন অনুচর সহ মথুরা এবং অন্যান্য তীর্থ ঘুরিয়া রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন।

কর্ম্মচারিগণ সন্ন্যাসীবেশধারী শিবাজি এবং তাঁহার পুত্র ও অনুচর দ্বয়কে চিনিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীরা কেন আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় শিবাজি কহিলেন,—"আমি শিবাজির জননী এই দুর্গের শাসনকর্ত্রী জিজাবাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই। আমাদের বাসনা আমি তাঁর কাছেই জানাইব।"

জিজা সন্ন্যাসীকে অন্তঃপুরে আনিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী আসিলে জিজা তাঁহাকে প্রণাম করিতে উঠিয়াছেন এমন সময় সন্ন্যাসীই জিজার পায়ে লুটিয়া প্রণাম করিলেন। জিজা চমকিত হইয়া সরিয়া কহিলেন,—"একি ঠাকুর? আপনি সন্ন্যাসী. কেন আমাকে এমন পাপের ভাগী করিলেন? আমি একেই বড় বিপদে আছি। জীবনসর্ব্বস্ব শিব্বা আমার দিল্লীতে কারাবন্দী; অমঙ্গলে কেন আপনি অমঙ্গল বাড়াইতেছেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—"মা, চিনিতে পারিতেছ না? আমিই যে তোমার শিব্বা, আবার তোমার কোলে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে জিজা সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন। তাই তো, সন্ন্যাসী তো সত্যই তাঁর শিব্বা! সহসা আশার অতিরিক্ত এ আনন্দে, এত কাল রাত্রিদিন আকুল প্রার্থনার সহসা এই সফলতায়—জিজা আত্মহারা হইয়া কাঁদিয়া পুত্রকে বুকে ধরিলেন। মাতাপুত্র আনন্দের অশ্রুতে আনন্দের অশ্রু মিলাইয়া নির্ব্বাক্ নিঃশব্দ অবস্থায় পরস্পরের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া কিছুকাল রহিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া আবার মাতার চরণে প্রণাম করিয়া শিবাজি তাঁহার পলায়নের সকল ঘটনা বলিলেন।

রাজপুরীতে ও রাজ্যময় শিবাজির নিরাপদে আগমন সংবাদ প্রচারিত হইল। গৃহে গৃহে আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হইল।

(৮)

শিবাজি ফিরিয়া আসিবার পর ঔরংজেব তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধ অনেক সেনাপতিকে দক্ষিণ ভারতে পাঠাইলেন। কিন্তু কেহই শিবাজির রাজ্যের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। বরং শিবাজিই অনেক দুর্গজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ় করেন। কিছুকাল পরে গার্গভট্ট নামক একজন প্রসিদ্ধ কাশীবাসী মারাঠা ব্রাহ্মণপণ্ডিত শিবাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শিবাজি রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অভিষেক তাঁহার হয় নাই। গার্গভট্ট তাঁহাকে অভিষিক্ত হইতে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ অনুসারে মাতার আদেশ লইয়া শিবাজি মহাসমারোহে অভিষেক-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, জিজার জীবনের সাধনার আজ পূর্ণ সিদ্ধি হইল। জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য যেন তাঁর পূর্ণ হইল। এইরূপে ইহজীবনের সকল সাধ, সকল সাধনা পূর্ণ হইবার অল্প পরেই, বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-পৌত্রাদির সমক্ষে পুণ্যময়ী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারত্নগর্ভা জিজা স্বর্গারোহণ করিলেন।

জননীর প্রাণঢালা সাধনায় গঠিত শিবাজি, জননীর প্রাণের কতখানি মহত্ত্ব পাইয়াছিলেন, কত মহৎ হইতে পারিয়াছিলেন, এবং জিজার ধীরকর্ত্তব্যবুদ্ধি কতদূর ছিল, তৎসম্বন্ধে আর দুইটি উদাহরণ দিয়া আমরা এ আখ্যান সমাপ্ত করিব।

শিবাজির নেতৃত্বাধীনে যখন মারাঠাজাতির অভ্যুদয়, সেই

সময় সে দেশে অনেক সংসারত্যাগী সাধুপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, যাহাতে হিন্দুর মধ্যে স্বাধীন জাতীয় শক্তির অভ্যুত্থান হয়, এই উদ্দেশ্যে হিন্দুর মনে জাতীয় জীবনের উদ্দীপনাই সন্ন্যাস-জীবনের মুখ্যব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। মাহাত্মা রামদাস স্বামী ইঁহাদের মধ্যে প্রধান। শিবাজি ইঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাসীর, ভিক্ষাই উপজীবিকা। শিষ্য রাজা হইলেও কোন মূল্যবান্ উপহার বা দক্ষিণা শিষ্যের নিকট সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করেন না। ভিক্ষা করিতে একবার রামদাস স্বামী শিবাজির রাজধানীতে আসেন। দীক্ষাগুরু ভিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত, শিবাজি তাঁহার সমস্ত রাজ্য ভিক্ষাস্বরূপ স্বামীজিকে দান করিলেন। স্বামী কহিলেন,—"শিববা এ কি করিতেছ ? রাজ্য দিয়া আমি কি করিব ? তোমার রাজ্য তুমি ফিরিয়া লও। আমি সন্ন্যাসী ; দিনের অন্ন দিনে ভিক্ষা করি। আজ-কার মত অন্ন মাত্র আমাকে দাও।"

শিবাজি রাজ্য ফিরাইয়া লইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। বরং সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর সন্ন্যাসীশিষ্য হইবেন এরূপ ইচ্ছা জানাইলেন। হিন্দুর মধ্যে স্বাধীন জাতীয় শক্তির জাগরণই রামদাসের সন্ন্যাসীজীবনের প্রধান ব্রত। সেই জাতীয় শক্তি জাগরিত হইয়াছে, শিবাজিই তাহার অধিষ্ঠাতা। শিবাজি সংসার ত্যাগ করিলে, এই নূতন উত্থিত শক্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে !

এদিকে শিবাজিকে সংকল্পবিচ্যুত করাও সহজ নহে। একটু চিন্তা করিয়া স্বামীজি কহিলেন,—"ভাল তাহাই হউক্ শিবা, তোমার রাজ্য গ্রহণ করিলাম! তুমি আমার শিষ্য, আমি আদেশ করিতেছি, আমার কর্ম্মচারীরূপে রাজা নামে রাজ-গৌরবে এ রাজ্য তুমি শাসন কর।"

শিবাজি ইহার পর আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। ভোগলিপ্সা একেবারে ত্যাগ করিয়া, গৃহধর্ম্মে ও রাজধর্ম্মে নিষ্কাম গৃহী ও রাজার ন্যায় তিনি গুরুর গচ্ছিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

আর একবার তুকারাম নামে আর একজন বিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রাণ ভক্ত সাধুপুরুষ এই সময়ে মারাঠাদেশে আবির্ভূত হন। ইঁহার কবিত্ব শক্তিও বিশেষ প্রবল ছিল। অনেক ভজন ও কীর্ত্তন নিজে রচনা করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ ভাবে ইনি গান করিতেন। অনেক লোক ইঁহার ভজনে ও কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তুকারামের অনেক প্রশংসার কথা শুনিয়া শিবাজি রাজ-ধানীতে ইঁহাকে আনিতে পাঠান। কিন্তু সাধুপুরুষ তাঁহার শান্তি-ময় নির্জ্জন সাধনাশ্রম্ ছাড়িয়া রাজপুরীতে যাইতে চাহিলেন না। শিবাজি নিজেই তাঁহার কুটীরে আসিলেন। তুকারামের ভজনে কীর্ত্তনে এবং ধর্ম্মোপদেশে শিবাজির এতদূর সংসার-বৈরাগ্য জন্মিল, যে; তিনি গৃহে না ফিরিয়া বনে ধর্ম্ম চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। এই সংবাদ পাইয়া জিজাবাই নিজে তুকারামের

কুটীরে গিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, তুমি এ কি করিলে? সন্ন্যাসই মানবের একমাত্র জীবনের ব্রত নয়। ভগবানের ইচ্ছাও এরূপ নয়। মানবসমাজের কর্ত্তা তিনি। মানবসমাজ রক্ষার জন্য রাজার রাজধর্ম্মও তাঁহারি বিধান। তাঁহার বিধানে হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য শিবা রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তদনুযায়ী শক্তি প্রবৃত্তি, শিক্ষা ও দীক্ষা সকলই সে ভগবানের বিধানেই পাইয়াছে। আজ রাজধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া সন্ন্যাসে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইয়া তুমি কি ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করিতেছ না? তোমার এই কার্য্যের ফলে হিন্দুর জাতি ও ধর্ম্মের অনিষ্ট হইলে, তুমি কি তার জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবে না? তোমাকে মিনতি করি ঠাকুর, এর প্রতিকার তুমি কর। হিন্দুর রাজাকে তার রাজধর্ম্মে ফিরাইয়া আন। কর্ম্মযোগীকে তার কর্ম্মে নিয়োগ কর। যে ঈশ্বরের ভক্তি-সাধক তুমি, শিবা সেই ঈশ্বরেরই কর্ম্ম-সাধক। ভক্ত হইয়া তাঁর কর্ম্মে বাধা দিও না; সাধু হইয়া পাপের ভাগী হইও না।"

তুকারাম জিজার কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝিলেন। বুঝিয়া, শিবাজিকে ডাকিয়া সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া রাজধর্ম্ম পালনে মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিলেন।

রাজমাতা আপনার কর্ম্মী সন্তানকে লইয়া রাজপুরে ফিরিলেন।

মলবাই দেসাইন্।

সমস্ত মারাঠা দেশ এক হিন্দুরাজার হাতে একই শাসন প্রণালীর অধীন হয়, শিবাজির এই লক্ষ্য ছিল। বস্তুতঃ এরূপ না হইলে মারাঠাদেশবাসী সকল প্রজা এক জাতীয়ত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক বলিয়াই শিবাজি মারাঠাজাতি গঠনের জন্য এই লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন এবং কখনো কোন অবস্থায় এই লক্ষ্য হইতে বিচলিত হন নাই। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য মারাঠা দেশের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দুদুর্গাধিপতির দুর্গ ও দুর্গের অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহাকে জয় করিয়া নিজের রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এরূপ কোন যুদ্ধে কোনরূপ অন্যায় ও অযথা উৎপীড়ন তিনি কোন হিন্দু বা মুশলমান, কাহারো উপর করেন নাই। বিজিত কোন দুর্গাধিপতি বা ভূস্বামী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেই তিনি তাঁহাকে যোগ্য সম্মানে ও সদ্ব্যবহারে তুষ্ট করিয়া নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই সব দুর্গের মধ্যে বল্লারীদুর্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই দুর্গে থাকিয়া বল্লারীরাজ স্বাধীন ভাবে আপনার ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। রাজার মৃত্যু হইলে, বিধবা রাণী মলবাই দেসাইন্ দুর্গ ও দুর্গের অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

অন্যান্য অনেক দুর্গ জয় করিয়া শিবাজি অনেক সৈন্য সহ এই বল্লারী দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মলবাইও ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনা। শিবাজির রাজনৈতিক আদর্শ যতই উচ্চ হউক, যে লক্ষ্য সাধনের জন্য তিনি এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন, সে লক্ষ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনা জীবিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে শত্রুর হাতে নিজের স্বাধীনতা, নিজের স্বাধীন শক্তিতে শাসিত দুর্গ ও রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তারপর, যিনি মারাঠার জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠাতারূপে শিবাজিকে দেখেন নাই, তাঁহার নিকট শিবাজি তাঁহার রাজ্য-আক্রমণকারী, তাঁহার স্বাধীনতাহরণপ্রয়াসী প্রবল শত্রু মাত্র। শত্রু প্রবল, জয়ের আশাও কম, কিন্তু স্বাধীনতাও অমূল্য ধন। স্বাধীনতার জন্য মারাঠা বীরাঙ্গনা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভীত সৈন্যগণকে উৎসাহ দিয়া তিনি কহিলেন,—"সৈন্যগণ! তোমরা আমার পুত্রতুল্য। কিন্তু তোমাদের ও আমার স্বাধীনতার জন্য এই ভীষণ সমরে তোমাদিগকে বলি দিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি। মানুষ কাঁদিয়া জন্মে, জীবন ভরিয়া অনেক দুঃখে তাহাকে কাঁদিতে হয়, আবার মৃত্যুকালেও কাঁদিয়াই মরে। স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব ও মহত্বই এমন দুঃখময় জীবনের একমাত্র কাম্য। তার জন্য এই অসার জীবন পাত করিতে কি তোমরা প্রস্তুত হইবে না? আজ প্রবল শত্রু তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য তোমাদের দ্বারে উপস্থিত। তোমরা মানুষ,

তোমরা ক্ষত্রিয়, অসার জীবনের মায়ায় তোমরা পরের অধীন হইবে? দুঃখের জীবন কি আরো দুঃখময় করিবে? ভয় পাইও না, ভাবিও না। মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে শত্রু মারিতে মারিতে শত্রুর অসিতে যে মরিতে পারে, মরণ তাহারই সার্থক। মরণে সে-ই ইহলোকে অনন্ত কীর্ত্তি, পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। আমি তোমাদের মা, আমি তোমাদের রাণী। অসি ধরিয়া রণরঙ্গিণী বেশে আমি নিজে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইব, যদি মাতৃভক্ত রাজভক্ত কেহ থাক, আমার মান রাখিতে, দেশের মান রাখিতে, বীরদর্পে আমার সঙ্গে যুদ্ধে চল। ক্ষুদ্র বল্লারীর বীরত্বে মারাঠারাজকে স্তম্ভিত কর।”

রাণীর বীরত্বময় বাক্যে বীরমদে ও রণমদে মত্ত হইয়া সৈন্যগণ অদম্য উৎসাহে রাণীর নেতৃত্বে দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হইল। রাণী নিজে সৈন্য চালনা করিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধে সাতাইশ দিন পর্য্যন্ত শিবাজির সৈন্য পরাভূত করিয়া দুর্গরক্ষা করিলেন। কিন্তু আর পারিলেন না। যে শিবাজির শক্তির সঙ্গে দিল্লীর মোগল পর্য্যন্ত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই শক্তির সঙ্গে এমন ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া মলবাই আর কতদিন যুঝিবেন? এতদিন যে যুঝিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয়। শেষদিনে মারাঠা সেনার প্রবল আক্রমণে বল্লারী দুর্গের প্রাচীরের এক ধার ভাঙ্গিয়া পড়িল। বর্ষার প্রবল প্লাবনের বেগে সেই ভগ্নপথে মারাঠা সেনা দুর্গে প্রবেশ করিল। দুর্গ শিবাজির হস্তগত হইল। মলবাই

নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন, হিন্দুবীরের নিকট তাঁর নারীমর্য্যাদার কোন হানি হইবে না।

মলবাইএর বীরত্বে বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজি পূর্ব্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বীরাঙ্গনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। মলবাইকে যখন তাঁহার সম্মুখে আনা হইল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মলবাই কহিলেন,—"মারাঠারাজ, আপনি রাজা, আমিও রাণী। আপনিও স্বাধীন ভাবে আপনার রাজ্য শাসন করিতেছেন, আমিও এতদিন স্বাধীন ভাবেই আমার রাজ্য শাসন করিয়াছি। আপনার শক্তি প্রবল; সেই প্রবল শক্তি লইয়া আমার ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল শক্তিকে আপনি গ্রাস করিতে আসিয়াছেন। সেই গ্রাস হইতে আমার ক্ষুদ্রশক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য যুঝিয়াছি। আজ আর পারিলাম না; আপনার প্রবল শক্তিতে অভিভূত হইয়া আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। আপনি রাজা, রাজধর্ম্ম কি, জানেন। আপনার সঙ্গে যুদ্ধে আমি রাজধর্ম্মই পালন করিয়াছি। আর আমার বলিবার কিছুই নাই। আপনার নিকট কোন অনুগ্রহ-প্রার্থিনী আমি নই। আমার সম্বন্ধে আপনার যেরূপ অভিরুচি, ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

শিবাজি কহিলেন,—"মা, আপনি রাণী, রাণীর যোগ্য, রাণীই থাকিবেন।—আমার জননী জিজাবাই ব্যতীত আপনার মত তেজস্বিনী, বীরত্ব ও রাজধর্ম্মের মহিমায় মহিমময়ী নারী

বোধ হয় এ মারাঠা দেশে আর নাই। জিজাবাইএর গর্ভে আমার জন্ম, আপনার মত বীরাঙ্গনার মর্য্যাদা রাখিতে আমি জানি। আজ হইতে আপনি আমার মাতৃস্বরূপা। বল্লারীদুর্গে ও বল্লারী রাজ্যে পূর্ব্বের ন্যায় এখনো আপনার স্বাধীন ক্ষমতাই থাকিবে। জীবন থাকিতে আপনার ও আপনার রাজ্যের স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করিব না। আমি সন্তান, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।”

মলবাই কহিলেন,—“মারাঠারাজ, আপনিই হিন্দুরাজ্যের যথার্থ রাজা।—আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়া আপনি ভারতময় হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করুন। আপনি আমার স্বাধীনতা হরণ করিলেন না, আপনার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আমার যতই প্রবল হউক, কোন মূল্যেই সে স্বাধীনতা আমি বিক্রয় করিতে চাই না। স্বাধীনতা অমূল্য, অবিক্রেয়। কিন্তু জানিবেন, আমার ও আমার এ রাজ্য কার্য্যতঃ আপনারই। বল্লারীর ক্ষুদ্রশক্তি আপনার নিজ শক্তির মতই আপনার সকল কার্য্যে সহায়তা করিবে।”

শিবাজির বিজয়-পতাকা বল্লারীর দুর্গে উড়িল না। মলবাই দেসাইন্ বল্লারীর যেমন রাণী ছিলেন, তেমনি রাণীই রহিলেন। কিন্তু তিনি আর শিবাজির শত্রু নন্, পরম মিত্র, মিত্রেরও বেসি।—কার্য্যতঃ বল্লারী শিবাজির নিজেরি রাজ্যের মত হইল। কিন্তু, বল্লারীবাসী বল্লারীশ্বরীর অপূর্ব্ব বিক্রমে ও মহিমায় পূর্ব্ববৎ স্বাধীনই রহিল।

তারাবাই।

(২)

(১)

শিবাজির মৃত্যুর পর ঔরংজেব তাঁহার বিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে যত সৈন্য সংগ্রহ হইতে পারে সকল একত্র করিয়া তাঁহার প্রধান প্রধান যত সেনাপতি ছিল সকলকে লইয়া, নিজে দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করিবার আয়োজন করিলেন।

দক্ষিণ ভারতের মাত্র আমেদনগর রাজ্য সাহজাহানের সময় দিল্লীর অধীন হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য এখনও স্বাধীন। ইহা ছাড়া, শিবাজির প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন হিন্দু মারাঠারাজ্যও ক্রমে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

এই তিনটি রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত দক্ষিণ ভারত আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন, ঔরংজেবের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল।

শিবাজি জানিতেন যে, ঔরংজেব তাঁহার সকল শক্তি লইয়া দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা লোপ করিতে চেষ্টা করিবেন। জানিয়া, জীবনের শেষভাগে শিবাজি এই ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সকল দিকে আপনার শক্তি দৃঢ় করিতে বিশেষ যত্ন করেন। অতি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বলে তিনি আরো বুঝিতে পারিলেন

যে, জাতিগত ও ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ও বিরোধ ভুলিয়া বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার রাজাদের সঙ্গে তাঁহার এখন দৃঢ় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রয়োজন। মুশলমান হইলেও, এই দুই মুশলমান রাজার প্রতি ঔরংজেবের যে, কোন বন্ধুতার ভাব ছিল, তাহা নয়। হিন্দু শিবাজির রাজ্যের ন্যায় ইঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া নেওয়াও তাঁহার অভিপ্রায়। সুতরাং বিপদ শিবাজির অপেক্ষা ইঁহাদের কম নয়। সকলের সমান বিপদে সকলে এক হইয়া দাঁড়াইলে রক্ষার যত সম্ভাবনা, পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে ততদূর কখনো হইতে পারে না। তার পর গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের শক্তি মুশলমান শক্তি হইলেও, ইঁহাদের সঙ্গে তিনি আপন শক্তি রক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন ; এমন কি, ইঁহাদের উপর আপন শক্তির প্রাধান্যও তিনি স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু একবার যদি এই দুইটি বিস্তীর্ণ রাজ্য মোগলের হয়, একবার যদি মোগল এই দুইটি রাজ্য জুড়িয়া বসিতে পারে, তবে মোগলের সঙ্গে যুঝিয়া আপন শক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা কঠিন হইবে।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারাও সমান বিপদে একতা ও পরস্পরের সহায়তা যে কত প্রয়োজন তাহা বুঝিলেন। পূর্ব্বশত্রুতা ভুলিয়া শিবাজিকে তাঁহারা এখন আপনাদের সমান জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। সাহস, পরাক্রম ও রণ-কৌশলে যে, শিবাজি কত শ্রেষ্ঠ, তাহাও তাঁহারা বুঝিতেন। সুতরাং শিবাজির সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনায় তাঁহারা বিশেষ আশ্বস্ত হইলেন। সকল প্রকার যুদ্ধে ও বিপদে পরস্পরকে

সহায়তা করিবেন এই মর্ম্মে শিবাজির সঙ্গে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

কিন্তু সহসা, শিবাজির মৃত্যু হইল। রাজ্য রক্ষার সকল ব্যবস্থাই অপূর্ণ রহিল। এমন কি, এই আসন্ন বিপদে মারাঠা রাজ্যের রাজপদে—মারাঠা জাতির নায়কের পদে,—কে বসিবে, তাহারো কোন পাকা বন্দোবস্ত তিনি করিয়া যাইতে পারিলেন না।

শিবাজির জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজি একমাত্র সাহস ও রণকৌশল ব্যতীত পিতার আর কোন গুণের বিন্দুমাত্রও পান নাই। পিতার শাসনে ও তাড়নায় শম্ভাজি একবার পিতার বিরুদ্ধে মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর সঙ্গে যোগ দেন। পরে পলাইয়া আবার পিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতার মার্জ্জনা পাইয়াও শম্ভাজির চরিত্র সংশোধন হইল না। অবশেষে শিবাজি পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিতে বাধ্য হন। শিবাজির মৃত্যুকালেও শম্ভাজি বন্দী অবস্থায় ছিলেন।

যাহা হউক, মৃত্যুকালে শিবাজি বলিয়া যান—যে, রাজ্য দুই ভাগ করিয়া দক্ষিণ ভাগ শম্ভাজি এবং উত্তর ভাগ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম গ্রহণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু শম্ভাজি যে তাঁহার এ ব্যবস্থা মানিবে না, শম্ভাজির দুশ্চরিত্রতা হইতে যে রাজ্যের বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা তাহাও তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন, যে, শম্ভাজি এবং ঔরংজেব দুইজনেই রাজ্যের সমান শত্রু। কিন্তু মন্ত্রিগণ ও সেনাপতিগণ সকলে

একমত হইয়া প্রাণপণে রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করিলে সকল বিপদ দূর হইবে।

শিবাজির মৃত্যুর পর মন্ত্রিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শম্ভাজি আপন চরিত্রদোষে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। রাজ্য ভাগ করিলেও বিরোধ চলিবে। বিভেদের ও বিরোধের অবশ্যম্ভাবী ফল বিশৃঙ্খলা ও দুর্ব্বলতা। এ দিকে রাজারাম এখনো বালক মাত্র। আপাততঃ রাজ্য শাসনের ভার তাঁহাদেরই হাতে থাকিবে। পরে রাজারামকেও তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা দানে উচ্চ আদর্শে গড়িয়া নিতে পারিবেন। সুতরাং রাজারামকেই তাঁহারা রায়গড়ের সিংহাসনে বসাইবেন, এই সংকল্প করিলেন।

কিন্তু তাঁহারা একটি বড় ভুল করিলেন। সেনাপতিকে আপনাদের পরামর্শে ডাকিলেন না। এদিকে শম্ভাজি কৌশলে কারামুক্ত হইয়া সকলের আগে সেনাপতির সঙ্গে যোগ দিলেন। সেনাপতির সাহায্যে অতি সত্বর রায়গড়ের সিংহাসন তাঁহারই অধিকৃত হইল এবং তাঁহার বিরোধী মন্ত্রিগণ কেহ কারারুদ্ধ এবং কেহ নিহত হইলেন।

শম্ভাজির বিমাতা রাজারামের জননী মন্ত্রীদের পরামর্শের মধ্যে ছিলেন। লিখিতে লজ্জা হয়, মহাপুরুষ শিবাজির কুলাঙ্গার পুত্র নিষ্ঠুর শম্ভাজি শিবাজির এই বিধবা মহিষীকে কারাগারে অনাহারে শুষ্ক করিয়া হত্যা করে। বালক রাজারাম বন্দী অবস্থায় রহিলেন।

ভবিষ্যতে রাজারামের যিনি সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, তিনিই আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়িকা—তারাবাই।

সাহসে, বীরত্বে, রাজনীতিকৌশলে, চরিত্রের দৃঢ়তায় এবং সাধারণ মানসিক শক্তিতে তারাবাইএর ন্যায় রমণী সে সময় মারাঠা দেশে অল্পই দেখা যাইত। যুদ্ধে এবং অন্যান্য সহস্র বিশৃঙ্খলা ও বিপদের মধ্যেও আপন শক্তি রক্ষায় ও রাজ্য শাসনে ভারতনারীরাও যে কতদূর উচ্চ মানসিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন, তারাবাইএর জীবন তাহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত।

(২)

ঔরংজেব তাঁহার বিপুল সৈন্য লইয়া দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছেন। তখন শম্ভাজির অত্যাচার ও কু-শাসনে মারাঠা-রাজ্যময় কেবল বিশৃঙ্খলা। তিনি নিজে দুশ্চরিত্র; সঙ্গীদিগকে লইয়া, রাত্রিদিন ভোগ বিলাসেই বিভোর হইয়া আছেন! এই বিপদে মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিগণের কোন উপদেশই তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।

সে সময় শম্ভাজি অপেক্ষা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা ঔরংজেবের প্রবলতর শত্রু ছিলেন। ঔরংজেব প্রথমেই মহারাষ্ট্র আক্রমণ না করিয়া আগে ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে দুইটি রাজ্যই ধ্বংস হইল। শিবাজির সন্ধির কথা মত শম্ভাজি ইঁহাদিগকে কোন সাহায্যই করিলেন

না। দক্ষিণভারতে বিস্তীর্ণ মোগল প্রদেশ স্থাপিত হইল। *

এইবার ঔরংজেব মারাঠাদেশ আক্রমণ করিলেন। বিশৃঙ্খল ও কু-শাসনে দুর্ব্বল মারাঠা দেশে দুর্গের পর দুর্গ ঔরংজেবের হাতে পতিত হইতে লাগিল। শেষে দুর্ভাগ্য শম্ভাজিও সপরিবারে ঔরংজেবের হাতে বন্দী হইলেন।

ঔরংজেব শম্ভাজিকে মুশলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন। সম্ভবতঃ মুশলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ঔরংজেবের অধীনে কোন জায়গীর বা উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইয়া ভোগ বিলাসেই তিনি বাকী জীবন কাটাইতে পারিতেন। কিন্তু হাজার হইলেও শিবাজির শোণিতেই তাঁহার জন্ম। রাজপুত্র ও রাজা শম্ভাজি যে মহত্ত্ব কখনো দেখাইতে পারেন নাই, রাজ্যহারা বন্দী শম্ভাজি আজ সেই মহত্ত্ব দেখাইলেন। অতি কঠোর শাস্তিতে তাঁহার মরিতে হইবে জানিয়াও তেজস্বী শম্ভাজি অতি ঘৃণার সহিত ঔরংজেবকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অবিলম্বে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

জল্লাদরা তপ্ত লোহার শলায় আগে তাঁহার চক্ষু বিঁধিল; তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল, তারপর তাঁহার প্রাণনাশ করিল। বীরভাবে নীরবে সব সহ্য করিয়া, জীবন-ভরা পাপের

* মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় এই প্রদেশ হইতেই নিজাম-রাজ্য গঠিত হয়। বর্ত্তমান ভারতে ইংরেজের করদ রাজ্যগুলির মধ্যে নিজাম-রাজ্য সর্ব্বপ্রধান।

এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শম্ভাজি লোকান্তরে পিতার নিকট চলিয়া গেলেন।

শম্ভাজির শিশুপুত্রকে ঔরংজেব নিজের কাছে রাখিয়া যত্নে প্রতিপালন করেন। এই বালকের নাম সাহু (অর্থাৎ সাধু)। ঔরংজেবই তাহাকে সাহু নাম দেন।

মারাঠা রাজ্য যায় যায়। নূতন জীবনে নূতন বলে জাগিয়া উঠিয়াই মারাঠাজাতি বুঝি চিরদিনের জন্যই পড়িয়া যায়। জিজাবাই ও শিবাজির সকল সাধনাই বুঝি বিফল হয়! কিন্তু এ সাধনা যদি নিষ্ফল হইতে পারে, তবে জগতে সাধনার কোনই সার্থকতা নাই। শিবাজি মারাঠাজাতির মধ্যে যে জীবন আনিয়াছিলেন, সে বড় শক্তিপূর্ণ জীবন, সে আলো সহস্র ঝঞ্ঝা-বাতেও সহজে নিভিবার নয়। সে জীবন, সে জাতীয় শক্তি শম্ভাজির পাপে কিছুকাল অভিভূত হইয়াছিল মাত্র। প্রায়শ্চিত্তে পাপের প্রভাব কাটিয়া গেল। আবার সে শক্তি সহস্র বিক্রমে জাগিয়া উঠিল।

শিবাজির হাতে গড়া মহাপ্রাণ বীরগণ এখনো জীবিত। শিবাজির স্বহস্তে পরিচালিত মারাঠা সৈন্যগণের হৃদয়ে শিবাজি হইতে সঞ্চারিত সাহস, বীরত্ব ও রণ-কৌশল এখনো জাগ্রত। মারাঠা দেশময় আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুন ক্রমে ভারতময় বিস্তৃত হইল। তাহাতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ছারখার হইল।

(৩)

রাজারাম এখন বিংশতি বর্ষীয় যুবক। অশেষ গুণে তিনি পিতার যোগ্য পুত্র। তেজস্বিনী তারাবাই তাঁহার সহধর্ম্মিণী। মারাঠা বীরগণ, সকলে এই বীরযুবক ও বীরাঙ্গনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

মারাঠা দেশের উত্তর ভাগ মোগলরা ছাইয়া ফেলিয়াছে। রাজধানী রায়গড়ে মোগলপতাকা উড়িতেছে। মারাঠা বীরগণ রাজারামকে লইয়া দক্ষিণে সাহজির জায়গীর তাঞ্জোর প্রদেশে জিঞ্জি দুর্গে গমন করিলেন। ধর্ম্ম ও ন্যায়ের বিধানে ঔরংজেবের শিবিরে বন্দী শম্ভাজির শিশু পুত্র সাহুই মারাঠা রাজ্যের অধিকারী। সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ রাজারাম নিজে রাজার পদ গ্রহণ করিলেন না। সাহুর প্রতিভূস্বরূপ তিনি বিপন্ন মারাঠা জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

রাজারাম ও অন্যান্য মারাঠা নেতারা জিঞ্জিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সেখানে থাকিয়া কোন মতে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন মোটের উপর রাজ্য রক্ষা ও শাসন প্রভৃতির কোনরূপ ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে একরূপ অসাধ্য হইল।

শত্রু-বিজিত রাজ্য ও রাজধানী ছাড়িয়া তাঁহারা সুদূর জিঞ্জি দুর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে অর্থ নাই, সুগঠিত সৈন্যবল নাই, রাজস্ব সংগ্রহের কোন উপায় পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু নেতৃগণের হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ ও শক্তি ছিল, মারাঠা জাতির মধ্যে প্রাণ ছিল; তাই সকল অভাবে আবার পূর্ণতা

আসিল,—ভাটার শুষ্ক নদী জোয়ারের বন্যায় ভরিয়া ছাপিয়া উঠিল।

মারাঠা দেশ বিধ্বস্ত করিয়া বিপুল মোগল সাম্রাজ্যের সকল সৈন্য সকল সেনাপতি লইয়া স্বয়ং ঔরংজেব মারাঠা দেশে; কিন্তু তার মধ্যেও মারাঠা নেতারা দেশময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য দল সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। এই মারাঠা সৈন্যগণ যার-পর-নাই লঘু ও দৃঢ়দেহ, সাহসী, ক্ষিপ্রগতি ও কষ্টসহিষ্ণু। তাহাদের তাঁবু লাগিত না, রসদ লাগিত না, বিছানা ও বাসন পত্র প্রভৃতি কোন আস্‌বাব পত্রের প্রয়োজন হইত না, ঘোড়ার পিঠে তাহারা জিন পর্য্যন্ত চাহিত না। তাহাদেরই মত দৃঢ় লঘু ও ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ার খালি পিঠে তারা চড়িত, কাপড়ে ছোলা বাঁধা থাকিত, ক্ষুধা পাইলে তাই খাইত; ঘুম পাইলে গাছের তলায় ঘুমাইত। এ দিকে মোগলসৈন্য যেখানে ছাউনি ফেলিত, সেখানে যেন এক রাজার রাজধানী বসিত! রাজধানীতে শান্তির সময় সৈন্য ও সেনাপতিরা যে সব ভোগ বিলাসে দিন কাটাইতেন, যুদ্ধের সময় তাঁবুতেও তাহার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হইত। তাঁবুতেও রাজভোগে আহার বিহার সকলই চলিত। তাঁবুর সঙ্গে গাড়ী গাড়ী রসদ চলিত, বণিকের বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ দোকান পসরা চলিত, ইহা ছাড়া গায়ক, বাদক, নর্ত্তকী ইত্যাদিও দলে দলে চলিত। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মোগল-তাঁবুর সঙ্গে যত সৈন্য চলিত, তার চারি গুণ সৈন্যদের সেবক ইত্যাদি চলিত। এ অবস্থায় তাহাদের পক্ষে

ছাউনি ফেলা, ছাউনি তোলা ও চলা ফেরা করা যে কত বড় একটা হাঙ্গামের ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এসব যাই হউক, বিপুল মোগল সৈন্য একবার সাজিয়া দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারিলে, সম্মুখ যুদ্ধে তাহাদের কাছে আসিতে পারে এমন শক্তি মারাঠা সৈন্যের ছিল না। মারাঠাও তাহা বুঝিত; তারা সম্মুখ যুদ্ধে কখনো অগ্রসর হইত না। দেশময় ছোট ছোট দলে তারা মোগল সৈন্যকে সুযোগ মত লাঞ্ছনা ও তাড়না করিত। মোগল সৈন্য যেদিকে অগ্রসর হইত, তারা সেদিক হইতে সরিয়া, ঘুরিয়া মোগলের পিছনে আসিয়া পড়িত। সুযোগ মত মোগলদের রসদ লুঠিত; বিচ্ছিন্ন ছোট কোন মোগল সৈন্যদল পাইলে সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, মারিয়া কাটিয়া লুঠিয়া দ্রুত পলায়ন করিত। মোগলদের চেষ্টা ছিল, কোনও মতে একবার মারাঠা সৈন্যদের একস্থানে ধরিতে পারিলে একেবারে পিষিয়া মারিবেন। ধরিতে পারিলে যে তাহা হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মারাঠারা এরূপ ধরা কখনো দিল না। ঔরংজেব তাঁহার বিপুল মোগল সৈন্য,—সঙ্গে অসংখ্য লোকজন, দোকান পসরা, রসদ ও অন্যান্য স্তূপ স্তূপ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া মারাঠাদের ধরিবার জন্য এস্থান হইতে ওস্থানে যাতায়াত করিতেন, আর মারাঠারা ছোট ছোট দলে ফাঁকে ফাঁকে ফিরিয়া তাঁদের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার একশেষ করিত। এইরূপে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ঔরংজেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। যে

মারাঠাকে হাসিয়া খেলিয়া, দলিয়া পিষিয়া মারিতে আসিয়াছিলেন, সেই মারাঠার রণকৌশলে ও ক্ষিপ্রকারিতায় মোগলসৈন্যও ভয়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এদিকে সেনাপতি জুল্‌ফিকার খাঁ জিঞ্জি অবরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সাত বৎসর পর্য্যন্ত রাজারাম ও তাঁহার সহচর বীরগণ অতুল বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিলেন। ঔরংজেব নিজে তাঁহার বিশাল সৈন্য লইয়া মারাঠাদের জ্বালায় এত বিব্রত, যে, সহজে আর জুলফিকার খাঁকে বেসি সৈন্য সাহায্য করিতে পারিলেন না। সাত বৎসর পরে জিঞ্জির পতন হইল বটে, কিন্তু রাজারাম ও সহচর বীরগণ সকলে পূর্ব্বেই দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। মোগল সেনাপতি শূন্য দুর্গ অধিকার করিলেন।

রাজারাম ও সহচরগণ মারাঠা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। যে সব মারাঠা বীরগণ ছোট ছোট সৈন্যদল লইয়া মোগল সৈন্যের লাঞ্ছনা করিতেছিলেন, রাজারাম এখন তাঁহাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং রাজারামের সহায়তা পাইয়া সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে এই অদ্ভুত যুদ্ধ চালাইয়া মোগলকে দ্বিগুণ বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

দশবারো বৎসর এইরূপ যুদ্ধের পর সহসা অকালে রাজারামের মৃত্যু হইল। মন্ত্রিগণ রাজারামের বালকপুত্র দ্বিতীয় শিবাজিকে রাজা করিয়া বালকের জননী তারাবাইএর হস্তে রাজ্য রক্ষা ও শাসনের ভার দিলেন।

বালকপুত্র আজ মারাঠারাজ,—বিপন্ন মারাঠাজাতির অধীশ্বর।

প্রবল শত্রু আজ দেশে বসিয়া দেশের মধ্যে আপন অধিকার বিস্তার করিতেছে। এই শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিয়া পুত্রের রাজত্ব রক্ষা এবং মারাঠাজাতির জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার কঠোর ও গুরুতর দায়িত্বের ভার আজ তারাবাইএর স্কন্ধে। তারাবাই টলিলেন না ; তারাবাই প্রকৃত তেজে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী হইয়াও, যৌবনে এমন দেবতুল্য শক্তিশালী স্বামী হারাইয়াও, দু'দিনও তারাবাই শোকে অধীর হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া রহিলেন না। সকল শোক সকল দুঃখ বুকে চাপিয়া ধীর ও দৃঢ়চিত্তে তিনি এই ভীষণ বিপ্লবের মধ্যে মারাঠাজাতির জাতীয় শক্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রিগণ ও বীরগণ এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, পুরুষাতীত শক্তিময়ী তেজস্বিনী বীরাঙ্গনার নেতৃত্বাধীনে পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তারাবাইএর অপূর্ব্ব শক্তিতে রাজারামের অভাব কেহ বোধ করিতে পারিলেন না।

আরও প্রায় দশ বৎসরকাল অবিশ্রান্ত ভাবে এইরূপ যুদ্ধ চলিল। মোটের উপর কুড়ি বৎসরের অধিককাল স্বয়ং ঔরংজেব তাঁর সকল সৈন্য লইয়া মারাঠাদেশে থাকিয়াও মারাঠা শক্তিকে দমন করিতে পারিলেন না। অবশেষে, মারাঠাদের সাহস, চতুরতা ও ক্ষিপ্রকারিতায় বৎসরের পর বৎসর অশেষ লাঞ্ছনায় বিব্রত ও ক্লান্ত হইয়া সসৈন্যে আমেদনগরে ফিরিয়া হতাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রগণের

মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে পরাজিত ও সপরিবারে নিহত করিয়া জ্যেষ্ঠ মোয়াজেম বাহাদুরসাহ নামে দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন।

মারাঠা-যুদ্ধ একেবারে থামিল না। কিন্তু মোগল পক্ষের সে শক্তি আর নাই, সুতরাং মারাঠারা ক্রমে নিজেদের আধিপত্য দৃঢ় করিতে লাগিল।

(৪)

সাহু এতদিন মোগল শিবিরেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন। তিনি এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক। দুইজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মারাঠা রমণীর সঙ্গে ঔরংজেব তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

বাল্যাবধি সাহু মোগল শিবিরের ভোগবিলাসমধ্যে যত্নে প্রতিপালিত সুতরাং কঠোর সামরিক শক্তির বিন্দুমাত্রও তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। মোটের উপর তিনি নিতান্ত বিলাস-পরায়ণ কোমলপ্রকৃতির যুবক হইয়া উঠিয়াছেন। তার পর ঔরংজেব স্নেহে ও যত্নে তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে মোগলের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা ব্যতীত দেশের ও জাতির শত্রু বলিয়া কোনরূপ বিদ্বেষভাব জন্মিতে পারে নাই।

বাহাদুরসাহ দেখিলেন, যুদ্ধে মারাঠাজাতিকে দমন করা অসম্ভব। সাহুকে যদি তিনি মারাঠাদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া মুক্তি দেন, তবে সাহু সহজেই তাঁহার অধীন

থাকিবেন, তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা কখনো করিতে চাহিবেন না। মারাঠা নেতাগণ সকলে যদি এ অধীনতা না চান, তবে অন্ততঃ অনেকে সাহুর পক্ষ অবলম্বন করিবেনই। গৃহবিবাদে মারাঠারা দুর্ব্বল হইয়া সহজেই তাঁহার বশীভূত হইবে।

বাহাদুরসাহ সাহুকে মুক্তি দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও সফল হইল। সাহু শিবাজির জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজির পুত্র; সুতরাং ন্যায় ও ধর্ম্মের বিধানে তিনিই মারাঠারাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। তাঁহার অধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়াই রাজারাম রাজা উপাধি কখনো গ্রহণ করেন নাই। এখন মারাঠা নেতাদের মধ্যেও কেহ কেহ তারাবাই ও তাঁহার পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষে আসিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে বলজি বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান।

সাহু যখন মোগল শিবিরে বন্দী, রাজারাম তখন আপন শক্তিতে মারাঠা দেশ রক্ষা করিয়াছেন। রাজারামের মৃত্যুর পর রাজারামের গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্রকে মারাঠা নেতাগণ রাজা করিয়াছেন, পুত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি এতদিন অশেষ বিশৃঙ্খলার মধ্যে আপন শক্তিতে মারাঠা রাজ্য রক্ষা ও শাসন করিয়াছেন; এখনো তিনি সেই রাজ্যের নেত্রীর পদে, সে রাজ্য তাঁর প্রাণের জিনিষ, সেই রাজ্য যে এখন তিনি মোগলের প্রতিপালিত মোগলের প্রতি স্নেহশীল আপন জাতীয়গৌরব-বোধহীন কোমলপ্রাণ দুর্ব্বলচিত্ত বিলাসপরায়ণ সাহুর হাতে সঁপিয়া দিবেন, একথা তেজস্বিনী স্বাধীন শক্তির

সাধিকা তারাবাই মনেও করিতে পারিলেন না। সাহুর হাতে মারাঠা রাজ্য সঁপিয়া দেওয়া আর মোগলের হাতে সঁপিয়া দেওয়া একই কথা। এই ভাবিয়া তারাবাই আপন জাতির জাতীয়ত্বের গৌরবে দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

বলজিবিশ্বনাথকে তিনি প্রতিভাশালী পুরুষ বলিয়া জানিতেন; সাহুকে যদি বলজিবিশ্বনাথ আপনার হাতে রাখিতে পারেন, তবে তার শক্তির প্রভাবে দেশ মোগলের হাতে না-ও যাইতে পারে; কিন্তু, বলজিবিশ্বনাথের নিজের হাতে যাইবে। সাহু রাজা হইলে, দেশ, হয় মোগলের, নয় পেশোয়ার শক্তির অধীন হইবে। শিবাজির প্রতিষ্ঠিত শিবাজির পুত্র রাজারামের রক্ষিত ও শাসিত দেশে শিবাজির বংশধরগণের আধিপত্য আর থাকিবে না। এমন অবস্থায় শিবাজির পুত্রবধূ, রাজারামের সহধর্ম্মিণী, মারাঠারাজ্যের বর্ত্তমান নেত্রী, তিনি কোন্ প্রাণে অক্ষম সাহুর হাতে রাজ্য সঁপিয়া দিতে পারেন? তারাবাই আপনার পক্ষ সুগঠিত করিয়া অদম্য তেজে ও বিক্রমে সাহু ও বলজিবিশ্বনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

সাহু সেতারায় এবং দ্বিতীয় শিবাজিকে লইয়া তারাবাই কোহ্লাপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

বলজিবিশ্বনাথের কৌশলে একটি একটি করিয়া তারাবাই-এর পক্ষীয় মারাঠা নেতাগণ, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে এইরূপ ক্ষীণবল হইয়াও তারাবাই অর্দ্ধ মহারাষ্ট্রে আপন শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। কিন্তু সহসা

তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শিবাজির মৃত্যু হইল। মন্ত্রিগণ রাজারামের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র শাম্বজিকে কোহ্লাপুরের সিংহাসনে বসাইলেন।

রাজমাতারূপে তারাবাইএর আধিপত্য ও রাজ্যশাসনে যে অধিকার ছিল, তাহা গেল। সাহুর পেশোয়া বলজি বিশ্বনাথের বিপক্ষে আর আপন শক্তি রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। কোহ্লাপুরের শক্তি ক্ষীণ হইল। পেশোয়ার প্রতিভাবলে সেতারায় সাহুই মারাঠা দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন।

সকল শক্তি হারাইয়া কোনোমতে তারাবাই জীবন ভার বহন করিতে লাগিলেন।

(৫)

পেশোয়ার হাতেই সকল ভার সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আমোদ-প্রমোদে দুর্ব্বল সাহু জীবন কাটাইতেন। তারাবাই যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ক্রমে কার্য্যতও পেশোয়াই মারাঠা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

বলজিবিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাজিরাও পেশোয়া হইলেন। শিবাজির পর বোধ হয় বাজিরাওএর মত প্রতিভাশালী পুরুষ আর মারাঠা দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। শিবাজি মারাঠা জাতিকে গঠন করিয়া মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, রাজারাম ও তাঁহার সমসাময়িক বীরগণ ভীষণ মোগল

বিপ্লবে মারাঠা রাজ্য রক্ষা করেন, বাজিরাও ভারতময় মারাঠা-শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের সূত্রপাত করেন।

মোগল শক্তি এই সময় পতনের মুখে চলিয়াছিল। বাজিরাও দেখিলেন, ভারতে হিন্দুশক্তি প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ। গুজরাট ও মালব হইতে পূর্ব্বে প্রায় উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র মধ্যভারতে মারাঠারাজ্য বিস্তৃত হইল। দক্ষিণ ভারতের নিজাম রাজ্য এবং উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশ মারাঠাদিগকে কর দিতে বাধ্য হইল। বাজিরাও মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার লোকাতীত প্রতিভাবলে ভারতে মারাঠা শক্তিই প্রধান হইয়া উঠিল।

বাজিরাওএর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলজি বাজিরাও পেশোয়া হইলেন। সাহু এখন বৃদ্ধ এবং নিঃসন্তান বলিয়া তাঁহার পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইল। কিন্তু রাজার পোষ্যপুত্র, রাজাসনে বসিবে, সুতরাং সে পুত্র নিজ বংশীয় কেহ হওয়া চাই। কোহ্লাপুরের বর্ত্তমান রাজা সাহুর নিকটতম জ্ঞাতি। সুতরাং সাহুর স্ত্রী সাবিত্রীবাইএর ইচ্ছা হইল, ইঁহাকেই পোষ্যপুত্র রাখা হয়।

কিন্তু পেশোয়ার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। রাজ্যে যে পেশোয়া-দের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সাবিত্রীবাই যে বড় পছন্দ করিতেন না, রাজা পেশোয়ার বশীভূত না হইয়া পেশোয়াকে আপন বশে রাখেন, এ জন্য আজীবন তিনি অনেক

চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সাহুর দুর্ব্বলতায় তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে,—পেশোয়া সাবিত্রীবাইএর বিরুদ্ধতার এই সকল কথাই জানিতেন। তিনি মনে করিলেন, যদি সাবিত্রীবাইএর ইচ্ছামত কোহ্লাপুরের রাজাকে সাহু পোষ্যপুত্র ও উত্তরাধিকারী-রূপে গ্রহণ করেন, তবে সে রাজা সাবিত্রীর ইচ্ছামতই চলিবেন এবং তাঁহার নিজের প্রভুত্ব সব লোপ পাইবে।

বৃদ্ধা তারাবাই এখনো জীবিতা। বার্দ্ধক্যেও তাঁহার তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল ছিল। শিবাজির রাজ্যে শিবাজির বংশধরগণের প্রভুত্ব লোপ পাইল, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তিনি সে প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না, এই চিন্তার যাতনায়, দারুণ জ্বালাময় রোষে পিঞ্জরাবদ্ধ বৃদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় তিনি শেষ জীবন কাটাইতেছিলেন। সাবিত্রী-বাইএর বিরুদ্ধতা হইতে আত্ম প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য পেশোয়া বলজি বাজিরাও এখন তারাবাইএর শরণাপন্ন হইলেন।

রামরাজা নামে তারাবাইএর একটি পৌত্র জীবিত ছিল। পোশোয়া গোপনে এই প্রস্তাব করিলেন, সাহু ইঁহাকে উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিবেন। সাহুর মৃত্যুর পর রাজার উপাধি ও সম্মান ইনি ভোগ করিবেন; কিন্তু, রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পেশোয়ার হাতে থাকিবে, সাহু এইরূপ লিখিয়া দিবেন।

পেশোয়ার হাতের পুতুল সাহু সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তারাবাই দেখিলেন, পোশোয়াকে দমন করিয়া

আবার শিবাজির বংশধরের হাতে রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ফিরিয়া আনিবার এই সুযোগ। একবার তাঁহার প্রতিপালিত তাঁহার অনুগত তাঁহারি পৌত্র রামরাজা যদি রাজপদের অধিকারী হন, তবে পেশোয়ার সাধ্য হইবে না, যে, মারাঠা রাজ্যে নিজের প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারেন। পেশোয়ার জালে তিনি পেশোয়াকেই বাঁধিবেন এই মনে করিয়া তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

সাহুর মৃত্যু হইল। সাহুর স্বাক্ষরিত উত্তরাধিকার পত্র অনুসারে তারাবাইএর কর্ত্তৃত্বাধীনে রামরাজা সেতারায় রাজা হইলেন। পেশোয়া সেতারা ত্যাগ করিয়া পুনায় আপনার শাসন-শক্তির কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শাসনের কেন্দ্র সেতারায় থাকিলে তেজস্বিনী ও দৃঢ়চরিত্রা তারাবাইএর রাজনৈতিক শক্তি ও কৌশল হইতে আত্ম-প্রভুত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে।

কিছুকাল পরেই পেশোয়া কোন যুদ্ধে গমন করেন। এই সুযোগ হারাইলে আর এমন সুযোগ না ঘটিতে পারে, ভাবিয়া তারাবাই অবিলম্বে বরদার শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি দামাজি গাইকোয়ারকে নিজের পক্ষে আনিলেন। এইরূপে সৈন্যবল হাতে করিয়া তিনি রামরাজাকে কহিলেন,—"রাম! মহাপুরুষ শিবাজির রাজ্যে শিবাজির বংশধরের কোন প্রভুত্ব নাই। সাহুর দুর্ব্বলতায় পেশোয়াই এখন এ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। শিবাজির বংশধরের অধিকার লোপ করিয়া পেশোয়া এ রাজ্য

গ্রাস করিতে না পারে, আজীবন এজন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কোন চেষ্টাই আমার সফল হয় নাই। আজ বৃদ্ধকালে মা ভবানী বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন! জীবন ভরিয়া যে আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়িয়াছি, বার্দ্ধক্যে তাহা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত। পেশোয়া তার সৈন্যবল লইয়া শত্রুর রাজ্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত। মহাবীর দামাজি গাইকোয়ার তোমার সহায়। এ সুযোগ অবহেলা করিও না। রাজ-সিংহাসনে রাজা নামে সাজানো পুতুল হইয়া আর থাকিও না, শিবাজির প্রপৌত্র, রাজারামের পৌত্রের যোগ্য গৌরবে রাজ-শক্তি আপনার হাতে তুলিয়া নাও। আজ ঘোষণা প্রচার কর, পেশোয়া কেউ নয়,—তোমার ইচ্ছার দাস মন্ত্রী মাত্র, তুমি রাজা। আজ হইতে রাজশক্তি তুমিই পরিচালনা করিবে।"

কিন্তু ভীত ও কোমলপ্রকৃতি রামরাজা পিতামহীর কথা পালন করিতে সাহসী হইলেন না। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তারাবাই কহিলেন,—"কাপুরুষ! কুলাঙ্গার! শিবাজি ও রাজা-রামের সাহস, শক্তি ও তেজস্বিতা যখন তুই কিছুই পাস্ নাই, তাঁদের বংশধর নাম গ্রহণ করিবার যোগ্য তুই ন'স্। আজ আমি ঘোষণা করিব, তুই এ বংশের কেউ ন'স্, নীচকুল হইতে আসিয়া মিথ্যা শিবাজির বংশধর নাম ধরিয়াছিস্। পৌত্র বলিয়া আমি আর তোকে কখনো স্বীকার করিব না। আজ হইতে রাজা নামে রাজ-সিংহাসনেও তোকে আমি বসিতে দিব না। আজ হইতে শিবাজির পুত্রবধূ, রাজারামের সহধর্ম্মিণী

আমিই এ রাজ্যের রাণী। আজ হইতে এ রাজ্যের শাসন ভার আমিই নিজের হাতে নিব। কুলাঙ্গার! কাপুরুষ! এই বীরবংশের কলঙ্ক তুই, আজ হইতে আমার আদেশে কারাগারে বন্দী থাকিবি।"

রামরাজাকে কারাগারে বন্দী করিয়া তেজস্বিনী বৃদ্ধা আপনার হাতে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন।

পেশোয়া এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মারাঠা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তারাবাইএর একমাত্র সহায় দামাজি। কিন্তু চতুর পেশোয়ার কৌশলে দামাজি বন্দী হইলেন; তাঁর সৈন্য বিধ্বস্ত হইল। পেশোয়ার বিরুদ্ধে আর আত্মশক্তি রক্ষা করা তারাবাইএর পক্ষে সুসাধ্য হইল না। পেশোয়ার হাতে রাজশক্তি ছাড়িয়া দিতে তিনি বাধ্য হইলেন।

পেশোয়া বন্দী রামরাজাকে কারামুক্ত করিয়া নাম মাত্র সেতারার রাজ পদে তাঁহাকে রাখিলেন। পুনায় রাজধানী স্থাপন করিয়া আপন শক্তিতে তিনি এখন মারাঠা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

তারাবাইএর পতনে পেশোয়ার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সকল বাধা, দূর হইল। পেশোয়াকেই এখন সকলে মারাঠা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রভু বলিয়া মানিল। তারাবাইএর জীবনব্যাপী কামনা এবং সংগ্রাম কেবল তাঁহার অসামান্য জীবনের পরিচয়মাত্র হইয়া রহিল।

অহল্যাবাই।

(প্রথম-লহরী।)

(১)

মারাঠা রাজ্যে যখন পেশোয়ারা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন গুজরাট হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত মধ্যভারত জুড়িয়া মারাঠারাজ্য বিস্তৃত হয়, একথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট ও বরদা প্রদেশে পিলাজি দামাজি গাইকোয়ার এবং পূর্ব্বপ্রান্তে নাগপুর প্রদেশে রঘুজি ভোঁসলা নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপিত করেন। এই দুইজন শক্তিশালী মারাঠা নেতা প্রথমে পেশোয়াদের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারা মারাঠা দেশে পেশোয়ার প্রভুত্ব মানিতে বাধ্য হন।

বরদা ও নাগপুরের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশ দ্বিতীয় পেশোয়া বাজিরাও অধিকার করেন। মলহররাও হোল্‌কার এবং রণজি সিন্ধিয়া নামে তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। বাজিরাও তাঁহার নূতন অধিকৃত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের পশ্চিম ভাগ ইন্দোরপ্রদেশ মলহররাও হোলকারকে এবং পূর্ব্বভাগ গোয়ালিয়ার প্রদেশ রণজি সিন্ধিয়াকে দান করেন। বাজিরাওএর অনুগত থাকিয়া তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশ শাসন করিবেন এবং রাজস্ব হইতে নিজ নিজ অধীনস্থ সৈন্যের ব্যয় বহন

করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্তে তাঁহারা এই দুইটি প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব পাইলেন।

সুতরাং এখন মারাঠা সাম্রাজ্য মোটের উপর পাঁচভাগে বিভক্ত হইল। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূল জুড়িয়া আদি মারাঠা দেশ পেশোয়ার শাসনাধীনে রহিল। কেবল কোহ্লাপুরে ও সেতারায় শিবাজির দুই বংশধর রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র শাম্বজি এবং সাহুর পোষ্য স্বরূপ তারাবাইএর পৌত্র রামরাজা রাজা নামে অতি ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া রহিলেন। তারপর গুজরাট হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত মধ্যভারত জুড়িয়া বরদা, ইন্দোর, গোয়ালিয়র এবং নাগপুর পরপর এই চারিটি রাজ্য হইল।

পেশোয়া বাজিরাও ও বলজি রাজিরাওএর শাসনকালে বরদায় দামাজি গাইকোয়ার, ইন্দোরে মলহররাও হোলকার, গোয়ালিয়ারে রণজি সিন্ধিয়া এবং নাগপুরে রঘুজি ভোঁস্‌লা রাজা ছিলেন। ইঁহারা সকলেই পেশোয়াকে সকলের উপরে প্রভু বলিয়া মানিতেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ অধীনস্থ প্রদেশ স্বাধীন রাজার ন্যায় শাসন করিতেন। সকলের অধীনেই বৃহৎ সৈন্যদল ছিল। এই সৈন্য লইয়া সকলেই প্রায় নিজ ইচ্ছামত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেন।

মোগল সাম্রাজ্য শক্তিহীন হইতেছে, এই জীর্ণ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া তাঁহার স্থানে ভারতে মারাঠা সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উচ্চ সংকল্প প্রথমে বাজিরাওএর মনে উদিত হয়। এই সংকল্প

সিদ্ধির জন্য তিনি ও তাঁহার সেনাপতিগণ চারিদিকে তাঁহাদের বিজয়ী সৈন্য চালনা করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যভারত মারাঠারাজ্যভুক্ত হইল এবং উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশ মারাঠাদিগকে কর দিতে আরম্ভ করিল। বাজিরাওএর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় পেশোয়া বলজি বাজিরাও পিতার নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিতে থাকেন। মারাঠা রাজগণ ও সেনাপতিগণ সমস্ত উত্তর ভারত ছাইয়া ফেলিলেন। পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘব একবার দিল্লী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বাদসাহকে নিজের ইচ্ছামত শাসন কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করেন, এবং পঞ্জাব জয় করিয়া সেখানে একজন মারাঠা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

ইহার দুই বৎসরকাল মধ্যেই পেশোয়ার খুল্লতাতপুত্র ও প্রধান সেনাপতি সদাশিবরাও ভাও পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাস-রাওকে লইয়া দিল্লী অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করেন। বিশ্বাস-রাওকে তিনি ভারত সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিবেন, এইরূপ মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিকূলে এক প্রবল শত্রু ছিলেন। তাই ইঁহাকে দমন করা পর্য্যন্ত এই ঘোষণার কার্য্য স্থগিত রাখিলেন।

এই শত্রু আফগান-রাজ আমেদ সাহ দুরাণী। ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন এবং এই সময়ে তিনি ক্রমে ছয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করেন। মারাঠাদের সঙ্গে ইঁহার মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ হইত।

মোগল সাম্রাজ্যের এখন কোন শক্তি নাই বলিলেও হয়। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা এখন নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীন রাজার মত হইয়াছেন। ভারতের মুশলমান শাসনকর্ত্তা বা রাজারা সকলে মারাঠাদের ভয়ে যারপরনাই ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, মুশলমান মোগল সাম্রাজ্যের স্থানে ভারতে হিন্দু মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। এখন তাঁহারা মারাঠাদিগকে কর দিতেছেন। কিন্তু অচিরেই সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মারাঠার অধীন হইতে হইবে। সুতরাং মারাঠাশক্তি দমন করিবার জন্য তাঁহারা সকলে প্রবল পরাক্রান্ত আফগানরাজ আমেদসাহ দুরাণীর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটে পানীপথ ক্ষেত্রে মারাঠা ও মুশলমানে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মারাঠারা পরাস্ত হইলেন। সদাশিব ও বিশ্বাসরাও নিহত হইলেন।

ইহার পর মারাঠা শক্তি অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পেশোয়া বলজি বাজিরাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্যান্য মারাঠা রাজাদের উপর পেশোয়াদের প্রভুত্ব নাম মাত্র রহিল। মারাঠাসাম্রাজ্য কার্য্যতঃ একেবারে পাঁচটি পৃথক্ রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

যুদ্ধের পর মুশলমান রাজগণের একতার বন্ধন শিথিল হইল ও উত্তর ভারতে বহু বিভিন্ন রাজ্য হইল। দিল্লীর সম্রাট, সম্রাট নাম মাত্র লইয়া দিল্লীতে রহিলেন।

ইন্দোরের রাজা মলহররাও হোলকারের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইনি প্রথমে হোল্ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন সামান্য পশুপালক ছিলেন। হোল্ গ্রামের নাম হইতেই ইঁহার হোলকার পদবী হয়। তখন মারাঠা দেশে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। মলহর তাঁহার মাতুলের অধীনে একজন অশ্বারোহী সৈন্য হইলেন। নানা যুদ্ধে তিনি বিশেষ সাহস, বীরত্ব ও রণকৌশল দেখান। তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া পেশোয়া বাজিরাও তাঁহাকে আপনার অধীনে এক সেনানায়কের পদে নিযুক্ত করেন। আপন শক্তিতে মলহররাও ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উঠিতে লাগিলেন। শেষে বাজিরাও ইন্দোর প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দিলেন।

আমাদের আখ্যায়িকার নায়িকা অহল্যাবাই এই হোলকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহররাও হোলকারের পুত্রবধূ। রাজ্যশাসন-নিপুণতায় এবং অন্যান্য বহু সদনুষ্ঠানে অহল্যাবাই ভারতের সর্ব্বত্র চির যশস্বিনী হইয়া আছেন।

(২)

একদিন মলহররাও মালব ও গুজরাট প্রদেশে কোন বিদ্রোহ দমন করিয়া বিজয়ী সৈন্য সহ পুনায় নিজ প্রভু পেশোয়ার নিকট যাইতেছিলেন। পথে পাথরডী নামে একটি গ্রাম ছিল। বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ তাঁহারা সেখানে থাকিলেন। মলহররাও ও কয়েকজন সেনানী কোন মন্দিরে

বসিয়া গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকের সঙ্গে গ্রামের অবস্থাদি সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে ছোট একটি মেয়ে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। মেয়েটি তেমন সুন্দর নয় বটে, কিন্তু তার মুখ ভরা অপূর্ব্ব এক জ্যোঃতিতে তাকে দেব-বালিকার মত দেখাইতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—"বাঃ! মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! এটি কে?"

শিক্ষক কহিলেন,—"এটি আমার একজন ছাত্রী, নাম অহল্যা। এই গ্রামবাসী আমার বন্ধু আনন্দ রাও শিন্দের কন্যা। আনন্দরাওএর অনেক দিন সন্তানাদি হয় না; শেষে এক সন্ন্যাসীর উপদেশে সন্তান কামনায়, কোহ্লাপুরে গিয়া জগদম্বা-দেবীর আরাধনা করেন। আনন্দরাও স্বপ্নে দেখিলেন, স্বয়ং জগদম্বা আসিয়া বলিতেছেন,—"আমি তোমার ঘরে তোমার কন্যা হইয়া জন্মিব।" আনন্দরাওএর স্ত্রীও স্বপ্নে দেখিলেন, কোন এক দেবী তাঁহার কপালে সিঁদূর দিয়া, তাহার কোলে একটি কন্যা দিলেন। ইহার পরেই অহল্যার জন্ম হয়। অহল্যার ভগবতী অংশেই জন্ম হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। শিশুকাল হইতেই অহল্যা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি উহার শান্ত ও মধুর প্রকৃতি। সকলেই অহল্যাকে বড় ভালবাসে। আমার পাঠশালায় অহল্যা পড়ে। অহল্যার মাত্র এই নয় বৎসর বয়স, কিন্তু ইহারি মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে। অহল্যা যার ঘরে যাইবে, অহল্যার চরিত্রে তার ঘর পবিত্র ও চির যশস্বী হইবে।"

মলহররাও ভাবিলেন, অহল্যা তাঁরি ঘরে যাইবে! তিনি তাঁহার পুত্র খণ্ডেরাওএর সঙ্গে অহল্যার বিবাহ দিলেন।

দরিদ্র-কন্যা অহল্যা রাজ-বধূ হইয়া রাজার ঘরে গেলেন। কিন্তু দরিদ্রের ঘরের দরিদ্রের বধূর ন্যায় তিনি নিজের হাতে গৃহকর্ম্ম ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিতেন। রাজার ঘরে দাস দাসীর অভাব ছিল না। কিন্তু অহল্যা গৃহকর্ম্ম ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবায় দাস দাসীর অপেক্ষা করিতেন না। রাত্রি থাকিতে সকলের আগে উঠিয়া তিনি গৃহকর্ম্ম আরম্ভ করিতেন, এবং সমস্তদিন অক্লান্তভাবে বিনাবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর আহারান্তে শয়ন করিতে যাইতেন।

অহল্যার চারিত্রগুণে ও সেবা-শুশ্রূষায়, দীপ্ত সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত, রণদুর্জ্জয়, তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা মহাবীর মলহররাও, মাতার নিকট কোমল শিশুর ন্যায় বধূর অনুগত হইলেন। কোন অবস্থায় অহল্যার কোন প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। পীড়িতাবস্থায় চিকিৎসকগণ, মন্ত্রিগণ, এমন কি, তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্ত তাঁহাকে ব্যবস্থামত ঔষধ পথ্যাদি খাওয়াইতে পারিতেন না, কিন্তু অহল্যা রোগের তৃষ্ণার সময় জলটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাকে যতটুকু খাইতে বলিতেন, তিনি তার বেসি খাইতেন না।

বালিকা বয়সেই অহল্যার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিও যার-পর-নাই প্রবল ছিল। অল্প বয়সেই তিনি মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া রীতিমত পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করেন। বালিকা বলিয়া শ্বশুর

শাশুড়ী বা অন্য গুরুজন কেহ পাছে তাঁহাকে বাধা দেন, এজন্য পূজা অর্চ্চনা তিনি অনেক সময় লুকাইয়া করিতেন।

এইরূপে গৃহকর্ম্মে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবায় এবং পূজা-অর্চ্চনায় নিত্যব্রতপরায়ণা রাজবধূ অহল্যার জীবনের আরো নয় বৎসর কাটিল। অহল্যার একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইল। কিন্তু এই আঠার বৎসর বয়সেই অহল্যার জীবনের গৃহধর্ম্মের সব সুখ শেষ হইল। অহল্যার স্বামী খণ্ডেরাও কোন যুদ্ধে নিহত হইলেন।

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অহল্যা চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মলহররাও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া অহল্যার কোলে মাথা রাখিয়া কহিলেন,—"মা, আমি তোমার ছেলে, আমায় ফেলিয়া কোথায় যাবে মা? আমার খণ্ডু নাই, তুমি আছ। কোন দিনই খণ্ডুর চেয়ে বেসি বই কম ছিলে না, আজ খণ্ডুর অভাব খণ্ডুর দুঃখ তোমাকে দিয়া, তোমার দিকে চাহিয়া ভুলিতে পারিব। খণ্ডু গিয়াছে, আমার খালি ঘর ভরিয়া ঘরের লক্ষ্মী তুমি আমার কাছে থাক। আমার গৃহের কর্ত্রী, রাজ্যের সহায় তুমি হও। খণ্ডু যে আমার নাই, সে কথা আমি কখনো মনে করিতে পারিব না। মা যেমন ছেলেকে রাখে, তেমনি আজ থেকে আমাকে তোমার কোলে রাখ। মা যেমন ছেলের সহায়, তেমনি আজ থেকে তুমি আমার সকল কার্য্যের সহায় হও। আমার এই দুঃখের সাগরে মা, একা ফেলিয়া যেয়ো না।"

শ্বশুরের এমন কাতর অনুরোধ অহল্যার মত বধূ অবহেলা করিতে পারিলেন না। শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া অহল্যা কহিলেন,—

"আপনি আমার ইষ্টদেবতা স্বরূপ। জীবন ভরিয়া বৈধব্যের দুঃখই সহিব। পরকালে স্বামীর সঙ্গে কবে মিলন হইবে জানি না। কিন্তু যাই হউক্, ইহকালে ও পরকালে যত দুঃখই কপালে থাক্, আপনাদিগকে কখনো অবহেলা করিব না। স্বামীসেবায় বঞ্চিত হইলাম বটে, কিন্তু আপনার ও শ্বশ্রূদেবীর সেবায় স্বামী-সেবায় বঞ্চিত বৈধব্য-জীবন সার্থক করিব।"

অহল্যা অনুমরণের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। শ্বশুরও তাঁহার কথা রাখিলেন; অহল্যা তাঁহার রাজসংসারের কর্ত্রী হইলেন। রাজ্যশাসনেও অহল্যাকে তিনি খণ্ডুর স্থানে বসাইলেন। রাজ্যের উত্তরাধিকারী বয়স্ক যোগ্য পুত্রকে রাজারা যেমন রাজ্যশাসনের সহযোগী করিয়া থাকেন, মলহররাও অহল্যাকে সেইরূপ আপনার শাসনকার্য্যের সহযোগিনী করিলেন। রাজ্যের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা এবং আভ্যন্তরিক শাসন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার অনেক ভার তিনি অহল্যার হাতে দিলেন। অহল্যা এত দক্ষতার সঙ্গে এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যে, অহল্যার রাজনীতিকৌশল ও রাজ্যশাসন-শক্তির উপর মলহররাওএর সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। পানীপথের যুদ্ধে যাইবার সময় অহল্যার উপরেই তিনি রাজ্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন, এমন দুঃসময়েও অহল্যা যেমন ভাবে রাজ্যের

শাসন ও শৃঙ্খলারক্ষা করিয়াছেন, তিনি নিজেও তেমন পারিতেন কি না সন্দেহ। অহল্যার জন্য, তিনি বস্তুতঃই খণ্ডেরাওয়ের অভাব অনুভব করিতে পারিতেন না।

ইহার পর ৪।৫ বৎসর মলহররাও জীবিত ছিলেন। অহল্যার উপদেশ ও পরামর্শ ব্যতীত তিনি আর কোন কার্য্যই করিতেন না। মলহর কিছু দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু অহল্যার প্রতি তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে, ক্রোধ বা প্রতিহিংসার বশে কোন গুরুতর অন্যায় কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হইলে, অহল্যা বলিবামাত্র তিনি ক্ষান্ত হইতেন। মলহরের জীবনের শেষভাগে রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অহল্যার হাতেই একরূপ ছিল।

(৩)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মলহররাও হোলকারের মৃত্যু হইল। অহল্যার পুত্র মালেরাও পিতামহের সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। মালেরাও যার-পর-নাই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক ছিলেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুশ্চরিত্রতা এত বেসি ছিল যে, সে সব কথা শুনিলে তাঁহাকে কখনো প্রকৃতিস্থ মানুষ বলিয়া মনে করা যায় না। ইহার উপর আবার অত্যন্ত সুরাপানে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই ছিল না।

মদ খাইয়া উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে তিনি বেত মারিতেন। আত্মীয় ও গুরুজন কেহ উপদেশ দিতে গেলে চাকর দিয়া

তাঁহাদের অপমান করাইতেন। দেবসেবা ও ব্রাহ্মণসেবা অহল্যার নিত্যকর্ম্ম ছিল, মালেরাও নানারূপ নিষ্ঠুর ও ঘৃণিত উপায়ে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের লাঞ্ছনা করিতেন। কখনো বস্ত্র ও পাদুকাব মধ্যে বৃশ্চিক রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতে দিতেন। কখনো টাকার কলসীতে সাপ রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ইচ্ছামত তাহার মধ্য হইতে টাকা তুলিয়া নিতে বলিতেন। মালেরাও এইরূপ সব অদ্ভুত ব্যবহার করিতেন।

শ্বশুর থাকিতে অহল্যা যেমনই সুখে ও সম্মানে ছিলেন, এখন তেমনই দুঃখে কাঁদিয়া তাঁর দিন যাইতে লাগিল। পুত্র রাজ্যেশ্বর; কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রতিকার করা তাঁহার আয়ত্ত ছিল না। কি করিবেন? মহাপ্রাণা নারী কাঁদিয়া দেবতার নিকট এমন অপদার্থ পুত্রের মৃত্যু কামনা করিতেন।

মালেরাওএর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিথ্যা সন্দেহ করিয়া রাজপ্রাসাদের এক শিল্পীর তিনি প্রাণদণ্ড করিলেন। পরে তাহাকে নিরপরাধ জানিতে পারিয়া, মালেরাওএর সহসা ভীষণ অনুতাপ হইল। মালেরাওএর পক্ষে নরহত্যার জন্য এরূপ অনুতাপ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় কখন্ কিজন্য কি ঘটনা হয়, তাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। অনুতাপের ফলে মালেরাওএর সর্ব্বদা মনে হইত, মৃত শিল্পীর প্রেতাত্মা যেন তাহাকে মারিতে আসিতেছে। প্রলাপের ঘোরে মালেরাও যে সব কথা কহিতেন, সে সব যেন প্রেতাত্মাই তাঁহার

দেহ আশ্রয় করিয়া নিজের প্রতিশোধের কথা বলিতেছে, এইরূপ সকলের মনে হইত।

পুত্র যত দুশ্চরিত্রই হউক, মাতা তার প্রতি একেবারে স্নেহশূন্য কখনো হইতে পারেন না। পুত্রের পৈশাচিক প্রকৃতিতে অহল্যা পুত্রের মৃত্যু কামনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজ তাহার এ যাতনা চক্ষে দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। পুত্রের পাশে বসিয়া দিবারাত্রি অহল্যা পুত্রের এই যাতনা-মুক্তির জন্য করযোড়ে প্রেতাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেন। প্রেতাত্মার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলেন; তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য জায়গীর দিতে চাহিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রেতাত্মার প্রভাবেই হউক, আর রোগের প্রভাবেই হউক, রাজা হইবার পর মাত্র দশ মাসের মধ্যেই নিজ দুষ্ক্রিয়ার ফলে মালেরাওএর ইহলীলা শেষ হইল।

পুত্রের যাতনার মুক্তি হইল; স্নেহময়ী মাতা ইহাতে শান্তিলাভ করিলেন। কিন্তু মায়ের প্রাণে পুত্রের শোক,—এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক মায়ের প্রাণে কত বাজিল, তাহা মা ভিন্ন সংসারে আর কেহ বলিতে পারে না। একমাত্র মা-ই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু, রাজ্যের ও প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষিণী রাণী অহল্যা, রাজ্যের পক্ষে, প্রজাগণের পক্ষে, পুত্রের এ মৃত্যু মঙ্গল ঘটনা বলিয়া মনে করিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর রাজ্য-শাসনের ভার অহল্যা নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন।

(৪)

রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াই অহল্যা বড় এক বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত নিতান্ত স্বার্থপর ও কুটিল চরিত্রের লোক ছিলেন। অহল্যা যেরূপ বুদ্ধিমতী ও শক্তিশালিনী রমণী ছিলেন, তাহাতে অহ-ল্যার হাতে শাসনভার থাকিলে রাজ্যে তাঁহার প্রভুত্ব বড় থাকিবে না। কর্ম্মচারীরূপে অহল্যার আদেশ মাত্র তাঁহাকে পালন করিতে হইবে। কিন্তু যদি অহল্যাকে সরাইয়া হোলকার বংশীয় কোন শিশুকে তিনি রাজাসনে বসাইতে পারেন, তবে বালক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত তিনিই রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিবেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত এই চিন্তা করিয়া, আপনার কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় যুবক মাধবরাও পেশোয়া ছিলেন। তিনি নিজে অতি ধর্ম্মপরায়ণ, কিন্তু তাঁহার শক্তিশালী খুল্লতাত রঘুনাথরাও অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। এবং এই দুরাকাঙ্ক্ষার বশে তিনি না করিতে পারিতেন, এমন কাজ নাই। গঙ্গাধর যশোবন্ত রঘুনাথের নিকট গোপনে প্রস্তাব করিলেন যে, রঘুনাথ পেশোয়ার সৈন্য লইয়া বলপূর্ব্বক ইন্দোর অধিকার করিবেন। পরে অহল্যাকে দূর করিয়া হোল্‌কারবংশীয় কোন শিশুর হাতে রাজ্যভার দিবেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত সেই শিশুর অভিভাবক স্বরূপ রাজ্য শাসন করিবেন।

রঘুনাথ চিন্তা করিলেন—মলহররাও কিম্বা তাঁহার পুত্র এখন জীবিত নাই। অহল্যা রমণী। এই সুযোগে সহজেই রঘুনাথ ইন্দোর অধিকার করিতে পারিবেন। এবং তাঁহারি নিয়োজিত ইন্দোররাজ চিরদিন রঘুনাথের অনুগত ও বাধ্য থাকিবেন। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা যায় না। উৎসাহিত মনে রঘুনাথ গঙ্গাধর যশোবন্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রঘুনাথ সসৈন্যে ইন্দোরের দিকে চলিলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি তাঁহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র পেশোয়ার ছিল না। তিনি এ কার্য্যে সম্মতি দিলেন না এবং পিতৃব্যকে জানাইলেন যে, তাঁহার এ কার্য্যের কোন দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিবেন না।

অহল্যা এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইলেন। তেজস্বিনী রাণী তখনি প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"এ রাজ্য আমার শ্বশুর আপনার শক্তিবলে লাভ করিয়াছেন, শক্তিবলে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার তোষামোদে ভুলিয়া কি তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া পেশোয়া এ রাজ্য তাঁহাকে দেন নাই। আমার শ্বশুর পেশোয়াকে প্রভু বলিয়া মানিতেন, আমিও মানিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাই বলিয়া এ রাজ্য আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইবার অধিকার পেশোয়ার নাই। আমি দুর্ব্বল রমণী বলিয়া আমার কৃতঘ্ন কর্ম্মচারীর সহায়তায় রঘুনাথরাও অন্যায়রূপে আমার রাজ্য কাড়িয়া নিতে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যেন মনে রাখেন, আমি সামান্য রমণী নহি। মলহররাওএর পুত্রবধূ, ইন্দোরের রাণী। আপন

শক্তিতে যদি এ রাজ্য আমি রক্ষা করিতে না পারি, বৃথা সেই মহাবীরের রাজ্যশাসনের সহযোগিনী হইয়াছিলাম ; বৃথা তাঁর শাসিত এই রাজ্যে তাঁর সিংহাসনে বসিয়াছি। এ রাজ্যরক্ষা ত সহজ কথা,—আমি হাতে অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধে নামিলে পেশোয়ার সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিবে। আপনারা ভীত হইবেন না। সাহসে ও উৎসাহে সকলে আমার সহায় হউন। স্বয়ং বাজিরাও ইন্দোরের শক্তিকে অবহেলা করিতে পারিতেন না। রঘুনাথ তাঁর কাছে কে ?”

কর্ম্মচারিগণ একবাক্যে অহল্যার পক্ষে পেশোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু বুদ্ধিমতী অহল্যা আত্মশক্তির অভিমানে কেবল নিজের সৈন্যবলের উপর নির্ভর করিলেন না। বরদার গাইকোয়ার রাজা, নাগপুরের ভোঁসলা রাজা এবং অন্যান্য মারাঠা সামন্ত ও সর্দ্দারগণের নিকট তিনি সহায়তা চাহিলেন। তাঁহাদের নিকট তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন,—

“পেশোয়ার সঙ্গে আমাদের সকলেরই সমান সম্বন্ধ। আমরা তাঁহার অধীন বটে ; কিন্তু অন্যায়পূর্ব্বক আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইবার অধিকার তাঁহার নাই। আজ আমার যে বিপদ, কাল আপনাদেরও সেই বিপদ হইতে পারে। এইরূপ বিপদে পরস্পরের সহায়তাই আমাদের ন্যায্য অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায়। আশা করি এই বিবেচনায় কেহই আপনারা এই বিপদে আমাকে সহায়তা দিতে বিমুখ হইবেন না।”

অহল্যার যুক্তির সার্থকতা বুঝিয়া এবং মলহররাওএর গুণ স্মরণ করিয়া—সকলেই অহল্যার সহায়তার জন্য সৈন্য লইয়া, ইন্দোরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নিজের সৈন্য পরিচালন জন্যও একজন সুদক্ষ ও বিশ্বাসী বীরপুরুষের প্রয়োজন। তুকোজি হোলকার নামে মলহর-রাওএর অতি নিকট এক আত্মীয় মারাঠা সর্দ্দার ছিলেন। অহল্যা তাঁহাকে আনাইয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁহাকে নিজের সেনাপতি ও প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিয়োগ করিলেন। তুকোজিও অহল্যাকে মাতুজি ডাকিয়া সেই দিন হইতে তাঁহার পুত্রস্থানীয় হইলেন।

রাজ্যরক্ষার জন্য তিনি যেরূপ আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে যুদ্ধে তিনি যে জয়লাভ করিতে পারিবেন, এবিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কোমলপ্রাণা অহল্যা চির-দিনই রক্তপাতের বিরোধিনী ছিলেন। বিনা রক্তপাতে যদি রাজ্যরক্ষা হয়, তবে যুদ্ধে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। পেশোয়া মাধবরাওকে তিনি ধর্ম্মপরায়ণ যুবক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার জ্ঞাতসারে বা ইচ্ছায় যে রঘুনাথ এমন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এরূপ তাঁহার মনে হইল না। তিনি সকল কথা জানাইয়া পেশোয়াকে এক পত্র লিখিলেন।

সেই সঙ্গে রঘুনাথের নিকটও লিখিলেন,—"আপনি আমার রাজ্য হরণ করিতে আসিতেছেন, আমিও রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতেছি। আপনাদের বংশ চিরদিনই

আমাদের পূজ্য। কিন্তু অস্ত্র ধরিয়া আপনি আমার রাজ্যে আসিলে, অস্ত্র দিয়াই আমি আপনার অভ্যর্থনা করিব। তবে একটি কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। আপনি বীর পুরুষ, আমি রমণী। যুদ্ধে হারিলে আমার বিশেষ কোন অসম্মান নাই। কিন্তু আপনি জিতিলে কোন গৌরব নাই, হারিলে লজ্জা ও অপমান যথেষ্ট আছে। এ অবস্থায় যুদ্ধে আপনার কি লাভ, জানি না। যাহা হউক, বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইবেন।”

প্রয়োজন হইলে সমান বা অধিকতর বল লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হওয়া যায়, এরূপ আয়োজন করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপায়ে শত্রুকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা,—ইহাই উচ্চ রাজনীতি কৌশল। পাশ্চাত্য সভ্য ও শক্তিশালী জাতিরা আজ এই কৌশল বলেই, আপনাদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ ও রক্তপাত নিবারণ করিতেছেন। আর ভারতনারী অহল্যা আপন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতায়, বহুপূর্ব্বেই এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সফলকাম হইয়া গিয়াছেন।

অহল্যা পত্র পাঠাইলেন। অহল্যার শক্তি প্রকৃত পক্ষে কতদূর তাহা না বুঝিয়াই রঘুনাথ নিবৃত্ত হইবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল না। অহল্যাও এরূপ আশা কখনো করেন নাই। তিনি অক্লান্তভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে পেশোয়ার উত্তর আসিল, রঘুনাথের এই অন্যায় যুদ্ধযাত্রা তাঁহার অনুমোদিত নহে। অহল্যা মলহরের রাজ্যভার

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কোন আপত্তির কারণ নাই। সুতরাং অহল্যার রাজ্যহরণ করিতে তিনি চান না। অন্যায় পূর্ব্বক যাঁহারা অহল্যার রাজ্যহরণে উদ্যত হইয়াছেন, অহল্যা তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত দণ্ড দিতে পারেন। পেশোয়া তাহাতে রুষ্ট হইবেন না।

পেশোয়ার নিকট এই আশ্বাস পাইয়া অহল্যার উৎসাহ শতগুণে বাড়িল। কর্ম্মচারীরাও পেশোয়ার এ যুদ্ধে সংশ্রব নাই জানিয়া সম্পূর্ণ দ্বিধাবিহীন হইয়া তাঁহার সাহায্যে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তুকোজির অধীনে অহল্যার সকল সৈন্য সাজিল। অহল্যা নিজেও যুদ্ধের বেশে কোমল হাতে অস্ত্র ধরিয়া হাতীর পিঠে চড়িয়া সৈন্যের সঙ্গে চলিলেন।

সসৈন্যে অহল্যা ও তুকোজি সিপ্রা নদীর নিকটে আসিয়া ছাউনি করিলেন। অহল্যার সহায় স্বরূপ অন্যান্য রাজারাও নিজ নিজ সৈন্য লইয়া আসিলেন।

রঘুনাথ সিপ্রা নদীর তীরে আসিয়া অহল্যার যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; অহল্যার পত্র তিনি বৃথা বাগাড়ম্বর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এত শীঘ্র যে অহল্যা তাঁহার বিরুদ্ধে এত শক্তি ও সহায় লইয়া আসিতে পারিবেন, এ কথা তিনি স্বপ্নেও কখনো মনে করেন নাই। পরাজয়ের আশ-ঙ্কায় সকল দুরাশা তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তুকো-জিকে সংবাদ পাঠাইলেন—"আমি যুদ্ধের মানসে আসি নাই।

পুত্রশোকাতুরা অহল্যাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছি। তোমাদের এত সৈন্য-সজ্জা কেন ?"

তুকোজিও উত্তর পাঠাইলেন,—"মাতুজির প্রতি আপনার এত দয়ায় কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু শোকে সান্ত্বনার জন্য সঙ্গে এত সৈন্যের প্রয়োজন কি ?"

রঘুনাথ তখন সৈন্য সামন্ত সব উজ্জয়িনী নগরে পাঠাইয়া ১০।১২ জন অনুচর মাত্র লইয়া তুকোজির শিবিরে আসিলেন। তুকোজিও যথাবিধি তাহাকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

রঘুনাথ অহল্যার পুত্র মালেরাওএর কথা বলিয়া অনেক কাঁদিলেন। সঙ্গে তুকোজিও কিছু কিছু কাঁদিলেন!

পেশোয়ার খুল্লতাত পরম সম্মানের পাত্র অতিথিকে আদরে নিমন্ত্রণ করিয়া অহল্যা ইন্দোরে লইয়া আসিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকটে সুসজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকায় রঘুনাথের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজোচিত ভাবে অহল্যা একমাসকাল রাজতুল্য অতিথির যথাবিধি সৎকার করিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহায়তার জন্য আসিয়াছিলেন, বিনয় বাক্যে এবং মূল্যবান্ উপহারে সন্তুষ্ট করিয়া অহল্যা সকলকে বিদায় করিলেন।

বলে পারিলেন না ; ছলে কৌশলে ভুলাইয়া, কূটতর্কে ঠকাইয়া যদি তিনি অহল্যার রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন, এখন রঘুনাথ সেই চেষ্টায় মন দিলেন।

পেশোয়ার প্রতি পেশোয়ার অধীন রাজগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে

তিনি অহল্যার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিলেন। কিন্তু কোন যুক্তিতেই তিনি অহল্যাকে এমন বুঝাইতে পারিলেন না, যে, সম্পূর্ণরূপে পেশোয়ার অনুগত হইয়া পেশোয়ার আদেশপালনই তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য।

তখন তিনি অহল্যাকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজ্যের অধিকারী করার আবশ্যকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অহল্যা তাঁহার সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া কহিলেন,—"আমার পুত্র মালেরাওএর কোন শিশুপুত্র থাকিলে ধর্ম্মবিধানে সে-ই রাজ্যের অধিকারী হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে কালে সে কিরূপ চরিত্রের লোক হইবে, বলা যায় না। পোষ্যগ্রহণ করিয়া কেন অনর্থক রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তিকে বিপদাপন্ন করিব? তার চেয়ে আমার মৃত্যুকালে হোলকার বংশীয় কোন যোগ্য লোকের হাতে রাজ্যভার দিয়া যাইব, সেই ভাল। পোষ্যগ্রহণ করা অপেক্ষা এখনই সেইরূপ কোন লোক নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে আমার রাজ্যশাসনের সহযোগী করিব, আমার এইরূপ ইচ্ছা। রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পক্ষেও ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।"

রঘুনাথ বুঝিলেন অহল্যা ভুলিবার ও ঠকিবার পাত্রী নহেন। তিনি নিরস্ত হইলেন।

অহল্যা পূর্ব্বেই মনে মনে আপনার ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তুকোজি তাঁহার শ্বশুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সর্ব্ববিষয়ে রাজ্যশাসনের যোগ্য লোক।

যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই তুকোজি অহল্যার পুত্রস্থানীয় হইয়াছেন। এখন তিনি তাঁহাকে উত্তরাধিকারীরূপে রাজ্যশাসনের সহযোগী করিলেন, এবং গঙ্গাধর যশোবন্তকেও মার্জ্জনা করিয়া, পরম ক্ষমাশীলা রাণী অহল্যা, আবার তাঁহাকে কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই ঘটনায় রাজস্থান ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজারা সকলেই বুঝিতে পারিলেন, অহল্যা কতদূর উচ্চ রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারিণী। অহল্যা সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী হইলেন। অনেকেই অহল্যার বন্ধুত্বলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া অহল্যার রাজ্যগ্রহণের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া অনেক উপহার সহ দূত পাঠাইলেন। বিনয়ে ও শিষ্টাচারে দূতগণকে যার-পর-নাই আপ্যায়িত করিয়া, অহল্যাও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অনেক উপহার প্রতিদান স্বরূপ এই সব রাজাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভারতের দিকে দিকে রাণী অহল্যাবাইএর নাম বিস্তৃত হইতে লাগিল।

অহল্যাবাই।

(দ্বিতীয় লহরী)

(১)

রাজপদে থাকিয়া রাজশক্তি পরিচালনার গৌরব সকলের পক্ষেই বড় প্রলোভনের জিনিষ। এই প্রলোভনের বশে কত মানব যে কত রক্তপাত, কত বিশ্বাস-ঘাতকতা, কত আততায়িয়তার পাপে পৃথিবী কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, এই প্রলোভন, রাজপদে অধিষ্ঠিতা অহল্যার হৃদয়ে কখনো স্থান পায় নাই। হিন্দুরমণীরূপে পূজা-অর্চ্চনা, অতিথি ব্রাহ্মণ সেবা, জনসাধারণের ধর্ম্মসাধনার সহায়তা, দীনদুঃখীর দুঃখ মোচন প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং রাণীরূপে প্রজার অভাব-অভিযোগ দূর করা, সর্ব্ববিধ সুখশান্তি ও উন্নতি বিধানই, দেবীসদৃশী অহল্যার হৃদয়ের প্রধান কামনা ছিল। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কুলের গৌরবরক্ষার জন্য যেটুকু রাজক্ষমতা পরিচালনা নিতান্ত প্রয়োজন, তার বেসি কখনো তিনি চাহিতেন না।

নারীরূপে ও রাণীরূপে তিনি যে সব কার্য্য জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন, তার জন্য যথেষ্ট অবসর তিনি খুঁজিতেন। তুকোজিকে যোগ্য সহযোগী পাইয়া তিনি তাঁহার

হাতে যুদ্ধ বিগ্রহ, এবং রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার দিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে, সাধারণ ভাবে তাঁহার আদেশ লইয়া তুকোজি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ এই সব কঠোর রাজকীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন, এই ব্যবস্থা হইল।

অহল্যা সাধারণভাবে তুকোজির কার্য্য পরিদর্শন করিয়া, সমস্ত অবসর ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও প্রজার সুখশান্তিবিধানে নিয়োগ করিলেন। ৩০ বৎসর কাল অহল্যা রাজত্ব করেন। কখনো রাজ-গৌরবে গৌরবিনী শক্তিশালিনী তেজস্বিনী রাণী রূপে, কখনো প্রজার চিরস্নেহময়ী জননী ও নিত্যকরুণাময়ী পালিনী রূপে, কখনো বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু-রমণীরূপে এবং সকল অবস্থায়, সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে, কঠোর ব্রতচারিণী হিন্দু-বিধবারূপে,—রাজত্বের এই ত্রিশবৎসরকাল অহল্যা যে কত মহত্ত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় তাহার বিস্তৃত বর্ণনা হওয়া অসম্ভব।

নারীদুর্ল্লভ অসংখ্য গুণে অহল্যা ভারতে যশস্বিনী ও ভারতের হিন্দুমুশলমান সকল রাজার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। রাজাদের মধ্যে তখন অবিরত যুদ্ধ চলিত। কিন্তু অহল্যার প্রতি ভক্তিবশতঃ কেহই বড় অহল্যার রাজ্য আক্রমণ করেন নাই। বরং কোন শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত থাকিতেন। সকলেই অহ-ল্যার প্রতি আপনাদের বন্ধুত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইলে

আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। সকলে মনেপ্রাণে তাঁহার মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন।

ভারতে তখন একরূপ বিপ্লবের অবস্থা। অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহে কোন রাজ্যেই শান্তির শৃঙ্খলা ছিল না। শান্তির শৃঙ্খলার অভাব, দস্যুর উপদ্রব, রাজপুরুষের উৎপীড়ন, বিজয়ী শত্রু-সৈন্যের লুণ্ঠন ও যথেচ্ছাচার, যুদ্ধক্লিষ্ট রাজার প্রজারক্ষার অনবসর প্রভৃতি নানাকারণে সকল রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর দুঃখের ও বিড়ম্বনার একশেষ হইত। সকল রাজ্যেই, প্রজার অবস্থার উন্নতি তো দূরের কথা, ক্রমে, হীন হইতে হীনতর হইতেছিল।—কিন্তু অহল্যার শাসনগুণে, মাতার ন্যায় প্রজাপালনে, এবং রাজ্যময় অশেষ সদনুষ্ঠানে চারিদিকের বিপ্লব, যুদ্ধকোলাহল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে অহল্যার রাজ্য, সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে হাসিয়া উঠিল। যে ঘোর ঝটিকার আবর্ত্ত ভারত বিধ্বস্ত করিতেছিল, তাহা যেন পুণ্যময় কোন অদ্ভুত যাদুবলে অপসারিত হইয়া, মাঝে অহল্যার শান্তিভরা দেশখানি বাঁচাইয়া রাখিয়া তবে চারিদিকে সব উলট পালট করিতে লাগিল। যেন, দারুণ ভূকম্পে কম্পিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন পৃথিবীর মধ্যে, শিবের ত্রিশূলের উপর বারানসীর ন্যায়, অহল্যার পরিপূর্ণ পুণ্যের রাজশক্তির ত্রিশূলাগ্রে ইন্দোর অটল শান্তিতে বিরাজ করিতেছে!

এইজন্য আদর্শ রাণী ও আদর্শ হিন্দুনারীরূপিণী অহল্যা তাঁহার অপূর্ব্ব মহত্বে দেবীরূপে ভারতময় পূজিতা হইয়াছিলেন, এখনো পূজিতা, এবং অনন্তকাল চিরপূজিতা থাকিবেন।

(২)

বৃথায় অহল্যা কোন সময় নষ্ট করিতেন না। দিনের কার্য্যের জন্য তাঁহার লিখিত বাঁধা নিয়ম ছিল ; দিনের পর দিন রাজত্বের ৩০ বৎসর কাল তিনি সেই বাঁধা নিয়মে চলিতেন। কখনো তার ব্যতিক্রম হইত না। রাত্রি থাকিতে উঠিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া তিনি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ শুনিতেন। সেই সময় অনেক ভিখারী আসিয়া জুটিত। পুরাণ শুনিয়া নিজের হাতে অহল্যা সকলকে ভিক্ষা দিতেন। তারপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ও অতিথিদিগকে নিজে সম্মুখে থাকিয়া আহার করাইয়া, পরে যৎসামান্যভাবে নিজের হবিষ্য করিতেন। আহারের পর অল্পকাল বিশ্রাম করিয়া রাজসভায় গিয়া বসিতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া প্রজাদের আবেদন শুনিতেন, অভিযোগ ইত্যাদির বিচার করিতেন এবং অন্যান্য রাজকর্ম্ম যাহা উপস্থিত হইত, তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই সময় অতি দীন প্রজারাও তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাইতে পারিত।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সভা ভঙ্গ হইবার পর আরো প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল অহল্যার সন্ধ্যা-পূজায় কাটিত। তারপর আবার তিনি রাজকার্য্য আলোচনা করিতে বসিতেন। এইরূপে দিনের সব কার্য্য শেষ হইলে, রাত্রি দেড় প্রহরের পর অহল্যা শয়ন করিতে যাইতেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, রাজারা পূজা সন্ধ্যা প্রভৃতি

ধর্ম্মানুষ্ঠানে বেসি মন ও সময় দিলে, রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু অহল্যার পক্ষে এরূপ কখনো ঘটে নাই। প্রত্যহ ছয় ঘণ্টার অধিককাল তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাপন করিতেন; ৮।৯ ঘণ্টা রাজকার্য্য করিতেন। বাকী কালটুকু মাত্র আহার ও বিশ্রামাদি কার্য্যে যাইত।

যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের অভ্যাস, বাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলা মত যাঁরা কাজ করিতে পারেন, তাঁহারা জীবনের সকল কর্ত্তব্যই সুচারুরূপে করিয়া যাইতে পারেন। এ সম্বন্ধে অহল্যার দৃষ্টান্ত কা'র না অনুকরণীয়?

দয়া ও ন্যায় এই দুইটিই প্রজার প্রতি রাজার রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। আদর্শনারী অহল্যা পূর্ণভাবে এই দুইটি ধর্ম্ম পালন করেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "দেবতা আমার হাতে যে রাজক্ষমতা দিয়াছেন, প্রজার মঙ্গলে সেই ক্ষমতার যোগ্য ব্যবহার করিবার জন্য দেবতার কাছে আমি দায়ী।"

সকল কার্য্যেই তাঁহার এই উচ্চদায়িত্ববোধ পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইত। তখন অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপ্লবের মধ্যে মারাঠা রাজ্যগুলি কেবল গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং ভূমিতে প্রজার স্বত্ব অথবা রাজাকে দেয় রাজস্ব সম্বন্ধে এসব দেশে পাকা নিয়ম কিছু ছিল না ফলে রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদের অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে প্রজাদের অনেক অসুবিধা এবং কষ্ট ভোগ করিতে হইত। অহল্যা রাণী হইয়াই রাজ্যের সমস্ত ভূমির পরিমাপ করাইলেন, এবং রাজস্ব সম্বন্ধে প্রজাদের সকল

স্বত্ব রক্ষা করিয়া কতকগুলি অতি সুন্দর নিয়ম প্রচলিত করিলেন।

নিয়মিত রাজস্ব আদায় হইয়া তাঁহার রাজকোষে অর্থ আসুক না আসুক, প্রজাদের উপর কোনরূপ উৎপীড়ন না হয়, প্রজারা সুখে থাকে, প্রজারা ধনে-লক্ষ্মীতে দিন দিন উন্নত হয়, এই দিকে দৃষ্টি তাঁহার অনেক বেসি ছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন কর্ম্মচারী প্রজাপীড়ন করায় তিনি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান,—"আপনি রাজস্ব আদায় করিতে পারুন না পারুন, প্রজারা আপনার শাসনাধীনে সুখে আছে জানিতে পারিলে আমি বেসি সুখী হইব।"

প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার দয়া, ন্যায়বুদ্ধি ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি যে কত প্রবল ছিল তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

একবার কোন নিঃসন্তান ধনী বণিকের মৃত্যু হইলে, তুকোজি তাঁহার সম্পত্তি রাজসরকারে আনিতে চাহিলেন। এইরূপ কার্য্য যে তখন রাজাদের মধ্যে একেবারে অপ্রচলিত ছিল তাহা নয়। বণিকের স্ত্রী অহল্যার নিকট আসিয়া স্বামীর সম্পত্তির অধিকার প্রার্থনা করিলেন। বণিকের স্ত্রীর প্রার্থনা অন্যায় নয়। তুকোজির কার্য্য প্রচলিত প্রথা অনুসারে অসঙ্গত না হইলেও শাস্ত্রবিহিত রাজধর্ম্ম অনুসারে অন্যায়। এইরূপ বিচার করিয়া অহল্যা তুকোজিকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলেন।

আর একটি ধনী বণিক নিঃসন্তান অবস্থায় মরিলে, বণিকের

স্ত্রী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। অহল্যার কোন লোভী কর্ম্মচারী বণিকের স্ত্রীকে বলিলেন,—"যদি আমাকে তিন লক্ষ টাকা না দাও, তবে রাজসরকারে তোমার পোষ্য পুত্র অগ্রাহ্য করাইয়া, তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাইব।" বণিকপত্নী অহল্যার দয়া ও ন্যায়পরতার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি ছেলেটিকে কোলে করিয়া অহল্যার দরবারে আসিয়া কাঁদিয়া কর্ম্মচারীর ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। অহল্যার কোমল হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ছেলেটিকে কোলে করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন এবং বহুমূল্য উপহার দিলেন। বণিকপত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"মা, তোমার কোন ভয় নাই। তোমার স্বামীর সম্পত্তি তোমার দত্তক পুত্রই পাইবে। অত্যাচারী কর্ম্মচারীর উপযুক্ত শাস্তি আমি এখনি দিব।"

এই বলিয়া কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন।

কৃতজ্ঞচিত্তে বণিকপত্নী রাণীকে অনেক উপহার দিতে চাহিলেন। অহল্যা কিছু গ্রহণ করিলেন না।

আর একবার তাঁহার প্রজাদের মধ্যে দুই ভাই অনেক সম্পত্তি রাখিয়া মরিল। উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। বড় ভাইএর স্ত্রী দত্তক পুত্র না রাখিয়া সম্পত্তি অহল্যাকে দিতে আসিলেন। অহল্যা কহিলেন,—"সে কি মা? তোমার স্বামীর সম্পত্তি তুমি ভোগ করিবে। আমি কেন ইহা লইব?" বিধবা কহিলেন,—"রাণী মা, আমি বিধবা। ভোগ আমার উঠিয়া গিয়াছে। সম্পত্তি দিয়া আমি কি করিব? পরের ছেলে

কে আসিয়া এ সম্পত্তি উড়াইবে, তাই দত্তক লইবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনি রাণী, কত সৎকর্ম্ম আপনাকে করিতে হয়। এই সম্পত্তি লইয়া কোন সৎকার্য্যে আপনি ব্যয় করুন।”

অহল্যা উত্তর করিলেন,—“আমি রাণী বলিয়া একাই যে এদেশে সকল সৎকার্য্যের অধিকারিণী, তা নয়। সৎকার্য্য তুমিও অনেক করিতে পার। সৎকার্য্যের জন্য যথেষ্ট ধন আমার আছে। তোমার ধন কেন আমি লইব। স্বামীর অবর্ত্তমানে এ সম্পত্তি এখন তোমার। যদি ভোগ না করিতে চাও, তুমি নিজে সৎকার্য্যে ইহা ব্যয় কর। তোমার সম্পত্তির সদ্ব্যয়ে তুমিই পুণ্যের অধিকারিণী হও।”

অহল্যার উপদেশে বিধবা তাঁহার সকল সম্পত্তি নানারূপ লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিলেন।

আবার কোন নিঃসন্তান বণিকের মৃত্যু হইলে বণিকের স্ত্রী পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পাইবার জন্য অহল্যাকে অনেক উপঢৌকন দিতে চাহিল। অমাত্য বলিলেন, এরূপ উপঢৌকন লওয়ায় কোন দোষ নাই। কিন্তু অহল্যা উত্তর করিলেন,—“শাস্ত্রবিধানে এই বিধবার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাহার ন্যায়-অধিকার সে ভোগ করিবে, তাহাতে আমার অনুমতির আবশ্যক কি? আবশ্যক হইলেও, সেজন্য কোন উপঢৌকন গ্রহণে আমার কোনই অধিকার নাই। বিধবা ইচ্ছামত পোষ্যপুত্র গ্রহণ করুক। আমি কোন উপহার লইব না।”

হায়! অহল্যার মত রাণী পৃথিবীতে কোন্ দেশে কয় জন ছিলেন!

রাজ্যের উন্নতির জন্য, লোকের সুবিধার জন্য, দীন দুঃখীর দুঃখ ও অভাব দূর করিবার জন্য, দেবসেবার জন্য, রাজ্যমধ্যে যে তিনি কত অর্থব্যয়ে কত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

রাজ্যের নানাস্থানে তিনি অনেক নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজ্যমধ্যে অনেক পথ, নদীর উপর অনেক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উচ্চ বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া লোকে যাহাতে সহজে অন্যত্র যাইতে পারে, সেই জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি পর্ব্বতের উপর দিয়াও একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। জলকষ্ট নিবারণের জন্য রাজ্যময় শত জলাশয় ও কূপ খনন করেন। পথিকের কষ্ট নিবারণের জন্য পথের মাঝে মাঝে বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করেন। পাখীরা বাসা বাঁধিয়া থাকিবে, পথিকেরা ছায়ায় বসিবে, ফল খাইবে, এই জন্য পথের দু'ধারে সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করেন। দেবসেবার জন্য মন্দিরে মন্দিরে দেশ ছাইয়া ফেলিলেন। গ্রীষ্মের দিনে পথের পাশে, ক্ষেতের ধারে, তৃষ্ণাতুর পথিক ও কৃষকের জন্য বহু জলসত্র খুলিতেন। দুর্ভিক্ষ হইলে দেশ বিদেশে তীর্থে তীর্থে তাঁহার অন্নসত্র বসিত। কেবল কি মানবের দুঃখেই দয়াময়ী মহিমময়ী অহল্যার হৃদয় কাঁদিত? পশুপক্ষীদের কষ্টেও তিনি ব্যথিত হইতেন। গ্রীষ্মের দিনে, ক্ষেতের পশুদিগকে

জলপান করাইবার জন্য অহল্যার লোকজন জলপাত্র লইয়া ক্ষেতের কাছে ঘুরিত। মাছের আহারের জন্য নর্ম্মদার জলে ছাতু ও গমের মণ্ড ফেলা হইত। পাখীদের খাইবার জন্য শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট থাকিত। শ্রান্ত ক্লান্ত মানব, পশু পক্ষী, মৎস্য, সকলেই অহল্যার দানে তৃপ্ত হইত। সকল জীবের তৃপ্ত প্রাণের স্বাভাবিক আশীর্ব্বাদ অহল্যার পরলোকের মঙ্গলের জন্য নিত্য ভগবানের চরণে পৌঁছিত।

অহল্যার দানধর্ম্ম যে কেবল নিজের রাজ্যমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ভারতে এমন তীর্থস্থান নাই, যেখানে তিনি দেবসেবার জন্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করেন নাই; লোকসেবার জন্য অন্নসত্র জলসত্র দান করেন নাই। ধর্ম্মের জন্য তিনি অকাতরে এত অর্থব্যয় করিতেন, যে, দক্ষিণ ভারতের অনেক তীর্থে প্রত্যহ মন্দির ধুইবার জন্য ও দেবমূর্ত্তি স্নান করাইবার জন্য শত শত ক্রোশ দূর হইতে তাঁহার লোকজন গঙ্গাজল লইয়া আসিত! গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির এবং কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির অহল্যা সংস্কার করেন। অহল্যার একটি ঘাটও কাশীতে আছে। হিমালয়ে দুর্গম কেদারনাথ তীর্থে তিনি একটি ধর্ম্মশালা ও কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। অহল্যার কীর্ত্তি এখনো অনেক তীর্থে বর্ত্তমান আছে। হিন্দু তীর্থযাত্রী বোধ হয় এমন কেহই নাই, যিনি অহল্যার নাম শোনেন নাই,, অহল্যার কীর্ত্তি কোন না কোন তীর্থে দেখেন নাই।

গৃহেও নিত্য দেবসেবা, অতিথি সৎকার, ব্রাহ্মণ কাঙ্গালীর

ভোজন ও দান প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান হইত। হিন্দুরমণীর করণীয় ব্রত ও উপবাসাদি কিছুই অহল্যার বাদ যাইত না। সহস্র সহস্র দীনদুঃখী এই সব অনুষ্ঠানে আহারে ও দানে তুষ্ট হইত।

ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার যার-পর-নাই প্রবল ছিল। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা তাঁহার ছিল না। প্রজাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি কখনো কোন বাধা দেন নাই। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের লোকই বিনা বাধায় বিনা উৎপীড়নে তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস মত চলিত।

ব্যক্তিগত জীবনে অহল্যার কোন আড়ম্বর, কোন ভোগ ও সুখের লালসা ছিল না। বিধবা হইয়া অবধি কঠোরতম ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মে তিনি চলিতেন। কোন সুখাদ্য কখনো তিনি খাইতেন না, রাজকর্ত্তব্যের প্রয়োজন ছাড়া ভাল বসন কখনো পরিতেন না, ভাল বিছানায় কখনো শুইতেন না, কোন বিলাস দ্রব্য কখনো স্পর্শও করিতেন না।

বিনয় ও নিরহঙ্কার তাঁহার এতদূর ছিল যে, আপনার কোন স্তুতিবাক্য তিনি কখনো শুনিতে ভালবাসেন নাই বা কোন স্তুতিবাদককে কখনো প্রশ্রয় দেন নাই। এই সম্বন্ধে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে।

কোন ব্রাহ্মণ পুরস্কারের লোভে অহল্যার কীর্ত্তিবর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। পুস্তকের অনেক স্থলে অহল্যার অনেক স্তুতি ছিল। ব্রাহ্মণ অহল্যাকে পুস্তক পড়াইয়া

শুনাইতে আসিলেন। অহল্যা অতিকষ্টে কোন মতে পুস্তক-খানি শুনিলেন; তারপর কহিলেন,—"আপনি বৃথা অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি বড় পাপিনী, আপনার এসব স্তুতি আমাকে সাজে না।"

এই বলিয়া অহল্যা পুস্তকখানি নর্ম্মদার জলে ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণকে বিনা পুরস্কারেই বিদায় করিলেন। আর কোন সংবাদ তাহার লইলেন না।

(৩)

রাজারা একদিকে যেমন দয়ায় ও ন্যায় ধর্ম্ম-অনুসারে প্রজারঞ্জন করিবেন, অপরদিকে তেমনি রুদ্ররূপে দুষ্টের দমনে, অত্যাচার নিবারণ করিয়া প্রজারক্ষা করিবেন,—ইহাই রাজধর্ম্ম বলিয়া প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাজা একদিকে যেমন ফুলের চেয়ে কোমল, অপরদিকে তেমন বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন হইবেন। অহল্যা পূর্ণভাবে রাজোচিত এই দুই বিপরীত গুণেরই অধিকারিণী ছিলেন।

অহল্যা কতদূর কোমলপ্রাণা ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাহার পরিচয় পাঠিকারা অনেক পাইয়াছেন। যেমন তিনি মাতার ন্যায় স্নেহে প্রজা পালন করিতেন, নিঃস্বার্থভাবে প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার রক্ষা করিতেন, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন হইলে রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া দুষ্টের দমন করিতেন, অদম্য তেজস্বিতা এবং অটল দৃঢ়তার সঙ্গে আপনার রাজগৌরব রক্ষা করিতেন।

মধ্যভারত ও রাজপুতানা অঞ্চলে ভীল নামে একপ্রকার অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি বাস করে। ইহারা বড় দুর্দ্দান্ত। কোন রাজা ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজের শাসনের অধীনে আনিতে পারেন নাই। ভীলদের গ্রামের মধ্য দিয়া যে সব পথিক ও বণিক যাইত, ভীলেরা তাহাদের নিকট হইতে সামান্য একটি কর আদায় করিত, ইহাকে ভীলকড়ি বলিত। বহুকাল-অবধি পুরুষানুক্রমে এই ভীলকড়ি আদায়ের প্রথা ছিল, সুতরাং অহল্যার ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু অনেক সময় ইহাদের দস্যুতায় এই সব পথিক বণিক এবং গ্রামবাসী নিরীহ প্রজারা বড় উৎপীড়িত হইত। এই সব অত্যাচার অহল্যার সহিত না। ভীল দস্যুদিগকে দমন করিয়া তিনি প্রজাদের শান্তি রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমে সদয় ব্যবহারে তিনি ভীলদিগকে ভাল পথে আনিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন অহল্যা কঠোর শাস্তি বিধানে ইহাদিগকে দমন করিতে আদেশ দিলেন। অনেক ভীল দস্যুর প্রাণদণ্ড হইল। অনেক ভীলগ্রাম উৎসন্ন হইল। তখন ভীলেরা নরম হইয়া অহল্যার দয়া ভিক্ষা করিল। অহল্যা নিয়ম করিয়া দিলেন, ভীলেরা প্রাচীন প্রথা অনুসারে তাহাদের ভীলকড়ি আদায় করিবে, কিন্তু দস্যুতা না করিয়া কৃষি ও ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং তাহাদের গ্রামে যদি কোন পথিকের বা বণিকের ধনপ্রাণের অনিষ্ট হয়, তবে তাহারাই তাহার জন্য দায়ী হইবে।

ভীলেরা সেই অবধি অহল্যার অনুগত হইয়া রহিল।

নারী বলিয়া অত্যাচারী কর্ম্মচারীর উপযুক্ত শাস্তি বিধানে তিনি কখনো ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। যে সব শক্তিশালী প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসনের সহায় ছিলেন, যাঁহাদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহারাও কোনরূপ অন্যায় করিলে কিম্বা তাঁহার রাজগৌরবের কোনরূপ অবহেলা বা অবমাননা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিতেন। এমন কি, তাঁহার পুত্রস্থানীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী, রাজ্যশাসনের সহযোগী তুকোজিরও এ সম্বন্ধে কোন ত্রুটি বা নিয়মলঙ্ঘন তিনি নীরবে সহ্য করিতেন না।

শিবাজি-গোপাল নামে অহল্যার কোন প্রধান কর্ম্মচারী অহল্যার প্রতিনিধিস্বরূপ পুনায় পেশোয়ার দরবারে ছিলেন। তাঁহার গুণে ও কার্য্যের ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হইয়া পেশোয়া তাঁহাকে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। শিবাজি-গোপাল স্বীকৃত হইলেন। তুকোজিও অনুমোদন করিলেন। কিন্তু কেহই, অহল্যাকে এ কথা জানাইলেন না। অহল্যার আদেশ না লইয়া শিবাজি-গোপাল অহল্যার কার্য্য ত্যাগ করিয়া পেশোয়ার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অহল্যা এই সংবাদ শুনিবামাত্র তুকোজিকে ডাকিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। তুকোজি অহল্যার পায়ে ধরিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। আর কখনো তিনি অহল্যার আদেশ-বিনা কোন গুরুতর রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে-সাহসী হইতেন না।

আপনার রাজগৌরবের প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে কর্ম্মচারিগণের রাজ্যের প্রতি ভয় ও ভক্তি ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। ক্রমে এইরূপ ভয় ও ভক্তিহারা রাজকর্ম্মচারীদের যথেচ্ছাচারে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়া প্রজার সুখ শান্তির অনেক ব্যাঘাত করে।

সূক্ষ্ম রাজনীতিকুশলা অহল্যা ইহা বুঝিতেন। তাই আপনার রাজগৌরব রক্ষার প্রতি চিরদিন তাঁহার এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অন্য রাজ্যের রাজাদের নিকটেও আপনার রাজগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অহল্যা চিরদিন সমান তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। রাজত্বের প্রথমভাগে রঘুনাথের আক্রমণ হইতে রাজ্য ও রাজগৌরব রক্ষার জন্য তিনি কতদূর তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছেন পাঠিকারা তাহা অবগত আছেন। বৃদ্ধ বয়সে, রাজত্বকালের শেষভাগেও আর একটি যুদ্ধে তিনি এইরূপ অদম্য ও অশিথিল তেজস্বিতা দেখাইয়া সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করেন।

রাজপুতানায় জয়পুরের রাজা পূর্ব্বে মলহররাওকে এবং পরে অহল্যাকে কর দিতেন। অহল্যার রাজত্বের শেষভাগে ৪।৫ লক্ষ টাকার কর বাকী পড়িয়াছিল। তুকোজি যখন এই কর আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তখন তুকোজির শত্রু সিন্ধিয়ার সেনাপতি জীউকদাদা গোপনে জয়পুররাজকে এই কর দিতে নিষেধ করিয়া জানাইলেন যে, যদি এজন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। জীউকদাদার পরামর্শে

জয়পুররাজ তুকোজিকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনাদের ন্যায় সিন্ধিয়া রাজসরকার হইতেও আমার নিকট করের দাবী করেন। এখন আপনাদের মধ্যে যিনি বেসি শক্তিশালী, আমি তাঁহাকে কর দিব।"

জয়পুররাজের এই উত্তরে তুকোজি যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু সহসা অতর্কিত অবস্থায় জীউকদাদা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তুকোজি পরাজিত হইয়া কোন দুর্গে আশ্রয় লইয়া অহল্যার নিকট আরো অর্থ ও সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান।

তুকোজির পরাজয়ের সংবাদে রোষে ও ক্ষোভে অহল্যা কহিলেন,—"ধিক! বীর হইয়া তুকোজি হোলকার রাজ্যের চিরগৌরবে এমন কলঙ্ক আনিল! তুকোজি আমার পুত্রের মত স্নেহের পাত্র। কিন্তু আজ তার এই পরাজয়ের সংবাদ অপেক্ষা যুদ্ধে মৃত্যুর সংবাদ পাইলে আমি বেসি সুখী হইতাম।"

কিন্তু তখনি তুকোজিকে এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন—"যাহা হইবার হইয়াছে। তুমি ভীত কিম্বা নিরাশ হইও না। যত অর্থ লাগে, যত সৈন্য লাগে, দিব, কিন্তু হোলকাররাজ্যের গৌরব রক্ষা করা চাই।

"আর, তুমি বৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছ। যদি যুদ্ধ চালাইবার সামর্থ্য না থাকে বোঝ, তবে অবিলম্বে আমাকে লিখিবে। আমি নিজে অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধে যাইব। আমিও বৃদ্ধা হইয়াছি বটে, কিন্তু শক্তি এখনো যথেষ্ট আছে। শক্তি আছে বলিয়াই এখনো রাজ্যশাসন করিতেছি। নহিলে করিতাম না।"

অহল্যার উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া এবং অহল্যার প্রেরিত নূতন সৈন্য সাহায্য পাইয়া তুকোজি জীউকদাদাকে পরাজিত করিলেন। জয়পুররাজ আর কর দিতে আপত্তি করিলেন না। অহল্যার রাজ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।

অহল্যার রাজনৈতিক চতুরতা ও কৌশল সম্বন্ধেও বড় সুন্দর একটি গল্প আছে। ইন্দোরের রাজকোষে মলহররাওএর সময় হইতে বহুকোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। এই সঞ্চিত ধন সব অহল্যা দেবসেবা ও লোকসেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রঘুনাথরাও অহল্যার রাজ্যহরণ করিতে চেষ্টা করিয়া কিরূপ বিফল হন, একথা পাঠিকারা জানেন। অহল্যার এই সঞ্চিত ধনের কথা শুনিয়া আবার রঘুনাথের লোভ হইল। কোন যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ইহার কিছু অংশ রঘুনাথ চাহিয়া পাঠাইলেন। ইন্দোর পেশোয়াদের অধীন রাজ্য, সুতরাং সে হিসাবে রঘুনাথের এ দাবী নিতান্ত অন্যায় নয়।

কিন্তু দেব-সেবা ও লোক-সেবার জন্য উৎসর্গিত অর্থ রঘুনাথকে যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য দিতে অহল্যার ইচ্ছা হইল না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—"এ সব সঞ্চিত অর্থ দান-ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করা রহিয়াছে ; আপনার যদি অর্থের অনাটন হইয়া থাকে, তবে, আপনি ব্রাহ্মণ, যথাবিধি এই ধনের উপর তুলসী-পাতা ও গঙ্গাজল রাখিয়া মন্ত্র পড়িয়া আমি আপনাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি।"

রঘুনাথের বড় রাগ হইল। ইন্দোরের রাণী অহল্যা

পেশোয়াদের অধীন। সেই ভাবে তিনি ইন্দোর-রাজসরকারের টাকা নিবেন। ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের মত পশুপালকবংশীয় বধূ শূদ্রানী অহল্যার দান তিনি কেন গ্রহণ করিবেন? তিনি অহল্যাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। অহল্যাও উত্তর পাঠাইলেন,—"যুদ্ধে প্রাণ যায়, রাজ্য যায়, যথাসর্ব্বস্ব যায়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নিজের হাতে দেবসেবা ও লোকসেবার অর্থ অন্য কার্য্যে ব্যয় করিব না।"

বিনা যুদ্ধে কার্য্যসিদ্ধি হইলে যুদ্ধে ও রক্তপাতে অহল্যার কোনদিনই বাসনা ছিল না। এবারও কৌশলে তিনি যুদ্ধ নিবারণের উপায় চিন্তা করিলেন। রঘুনাথ সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলে, অহল্যা নিজে বীর-বেশে সাজিয়া ঘোড়ায় চড়িলেন। সঙ্গে পাঁচশত দাসীও সাজিয়া চলিল। এইরূপে তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রঘুনাথের আদেশেও মারাঠা সর্দ্দারেরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিছুতেই যুদ্ধ করিতে চাহিল না। এইরূপ যে ঘটিবে অহল্যা তাহা পূর্ব্বেই জানিতেন। তাই তিনি এই ভাবে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ এখন ক্রোধে অহল্যাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার সৈন্য কোথায়?"

অহল্যা উত্তর করিলেন,—"পেশোয়ারা আমার প্রভু। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাজদ্রোহী আমি হইতে চাই না। কিন্তু হোলকারের রাজকোষে ধর্ম্মসেবার জন্য যে অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহাও আমি কাহাকেও দিব না। কেহ নিতে চাহিলে,

প্রাণ দিয়াও তাহা রক্ষা করিব। আপনার যদি তেমন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয়, আমাকে ও আমার এই দাসীদিগকে হত্যা করিয়া সে সম্পত্তি লইতে পারেন।”

রঘুনাথ নিরুপায় হইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে, বুঝিলেন, বলে কি কৌশলে অহল্যার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন, এমন সাধ্য তাঁহার নাই। অগত্যা শেষে নিজের ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, মিষ্টবাক্যে অহল্যাকে তুষ্ট করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

(৪)

এইবার ধীরে ধীরে মহীয়সী রাণী অহল্যাবাইএর জীবনকাল ফুরাইয়া আসিল।

আদর্শ রমণী ও আদর্শ রাণী হইয়াও সাংসারিক জীবনে অহল্যা বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া তিনি আঠার বৎসর বয়সে বিধবা হন। পুত্র মালেরাওএর দুশ্চরিত্রতায় এবং অকালমৃত্যুতে প্রথম জীবনে তিনি যার-পর-নাই কষ্ট পান। কন্যা মুক্তাবাই যোগ্য স্বামীর হাতে পড়িয়া সুখে স্বামীর ঘরে ছিলেন। মুক্তার একটি পুত্র ছিল। অহল্যা দৌহিত্রকে নিজের কাছে রাখিয়া স্নেহে প্রতিপালন করেন।*

* কিন্তু, মারাঠাদেশের নিয়মানুসারে কন্যা ও দৌহিত্রসন্তান রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন না।

কিন্তু সংসারের এতটুকু সুখেও তিনি শেষ জীবনে বঞ্চিত হইলেন। সংসারের প্রধান স্নেহের বন্ধন এই দৌহিত্রটিও অহল্যাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ইঁহার মৃত্যুর একবৎসরের মধ্যেই মুক্তা বিধবা হইলেন। পতিপুত্রহীনা মুক্তা শূন্য জীবন লইয়া সংসারে থাকিতে চাহিলেন না। তিনি সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কন্যাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অহল্যা অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুক্তা কহিলেন,—"মা, স্বামী নাই, পুত্র নাই, কি লইয়া আর এ ছার সংসারে থাকিব? কি অবলম্বন করিয়া আর এ শূন্য জীবন কাটাইব? তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ। কতদিন আর বাঁচিবে? তুমি গেলে আমার আপনার জন আর কেহ থাকিবে না। তখন এ জীবন-ভার বহিতে পারিব না। তার চেয়ে আজ স্বামীর সঙ্গে যাই। আমার ইহজীবন সার্থক হউক। পরলোকেও স্বামীর চরণে আশ্রয় পাইয়া ধন্য হই। আমি থাকিব না। মিছা আর অনুরোধে আমাকে কষ্ট দিও না।"

অগত্যা অহল্যা কন্যার সহমরণে সম্মতি দিলেন। নিজের চক্ষেই কন্যার এই আত্মবিসর্জ্জন দেখিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন।

নর্ম্মদাতীরে চিতা প্রস্তুত হইল। মুক্তা, মাতাকে ও অন্যান্য সকলকে প্রণাম করিয়া চিতায় উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে মুক্তার জীবন্ত কোমল দেহ ঘিরিয়া সধূম চিতার আগুন আকাশে

।

কন্যার যাতনা দেখিয়া অহল্যা ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন

না। আর্ত্তনাদ করিয়া তিনিও চিতায় ঝাঁপ দিতে ছুটিলেন। অতি কষ্টে দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দুইদিকে ধরিয়া রাখিলেন।

দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইল।

কন্যাকে জীবন্ত চিতার আগুনে বিসর্জ্জন দিয়া অহল্যা শূন্য-প্রাণে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধরা-শয্যায় রাণী পড়িয়া রহিলেন।

শোক দুঃখে, রাজকার্য্যের গুরুতর পরিশ্রমে ও কঠোর ব্রত-উপবাসে ক্রমে অহল্যার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মৃত্যু নিকট জানিয়া তিনি প্রতিদিন এক হাজার ব্রাহ্মণের ভোজনের এবং দীন দুঃখী ও অন্ধ আতুরকে বস্ত্র দানের ব্যবস্থা করিলেন। মৃত্যুর দিন বারো হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার আদেশ দিলেন।

এইরূপ ত্রিশ বৎসর ধর্ম্মগৌরবে রাজত্ব করিয়া ষাট বৎসর বয়সে সর্ব্বজীবসেবিকা তপস্বিনী রাণী, গৃহে ভোজনতৃপ্ত দ্বাদশ সহস্র ব্রাহ্মণের এবং অন্ন বস্ত্রে তুষ্ট অসংখ্য দীন দুঃখীর আশী-র্ব্বাদ মাথায় লইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

লক্ষ্মীবাই।

(১)

মারাঠারা যখন মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আপনাদের শক্তি বিস্তার করিতেছিলেন, তখন বাঙ্গালায় এবং মাদ্রাজ প্রদেশে ধীরে ধীরে ইংরেজের আধিপত্য স্থাপিত হইয়া উঠিল। মোগল সাম্রাজ্য এখন আর নাই। পঞ্জাবে এখন স্বাধীন শিখরাজ্য। রাজপুতানার রাজারা মারাঠার ভয়ে, ভীত, মারাঠাকে কর দেন। দিল্লী ও আগ্রা-প্রদেশ একরূপ মারাঠাদের অধীন। অযোধ্যার স্বাধীন নবাব এবং তাহার পশ্চিমে রোহিলাদের দেশে স্বাধীন রোহিলারাও মারাঠারাজাদিগকে কর দিতেছেন। বাঙ্গালা ও বিহারের রাজা ইংরেজ। মধ্যভারত জুড়িয়া মারাঠাদের চারিটি রাজ্য। এদিকে দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম ভাগ আদি মারাঠাদেশে পেশোয়া রাজত্ব করেন। মধ্যভাগে নিজাম রাজ্য। নিজামও মারাঠাকে কর দেন। নিজামের দক্ষিণে বীর হায়দর আলী ও টিপুস্থলতানের নূতন স্বাধীন মহীশূর রাজ্য। সকলের পূর্ব্বে মাদ্রাজের রাজা আবার ইংরেজ।

অহল্যাবাইএর মৃত্যুকালে ভারতের সাধারণ অবস্থা এইরূপ ছিল।

ভারতের রাজারা সর্ব্বদা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেন। অনেকে এই সব যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা লইতেন। যুদ্ধে জয় হইলে ইংরেজেরও কিছু কিছু রাজ্যলাভ ও শক্তি বৃদ্ধি হইত। ইহাতে ক্রমে ইংরেজের শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল।

ভারতের রাজারা মোগলশক্তির পতনের পর ভারতময় বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের রাজ্য নূতন করিয়া গড়িয়া লইতেছেন এবং চারিদিকে আবার বহু শত্রুর সঙ্গে যুঝিয়া এই সব নূতন-গড়া রাজ্য তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইতেছে। কিন্তু ইংরেজের শক্তি সব সুগঠিত ও সুশাসিত সুদূর ইংলণ্ড হইতে আসিতেছে। ভারতের বিপ্লব, ইংলণ্ডের সুনিয়মে বাঁধা শাসন শৃঙ্খলা এবং সেই শৃঙ্খলাজাত শক্তি, স্পর্শও করিতে পারিত না। সুতরাং এই সব যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে ভারতের রাজাদের শক্তি অপেক্ষা ইংরেজের শক্তির প্রভাবই বেসি দেখা যাইত।

শিখেরা তখনো কেবল নূতন উঠিতেছে। সুতরাং এক মারাঠাশক্তি ভিন্ন ইংরেজের সমকক্ষ হইতে পারে, এমন শক্তি আর দেশে ছিল না। কিন্তু এই মারাঠাশক্তিও পাঁচভাগে বিভক্ত হইল। পাঁচটি রাজ্যে মিল ছিল না; পরস্পরে শত্রুতা বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ যথেষ্ট ছিল। পানীপথের যুদ্ধের পর মারাঠারাজারা সকলে এক হইয়া মিলিয়া কোন শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন এমন সম্ভাবনা ছিল না।

এই সময়ে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ইংরেজ-ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। তিনি দেখিলেন, ভারতে এক মারাঠাই প্রবল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একতা ও জাতীয়ত্বের বন্ধন এখন শিথিল। ভারতে মারাঠা-জাতীয়শক্তি প্রতিষ্ঠার দিকে আর এখন মারাঠারাজাদের মন নাই। তাঁহারা সকলেই নিজ-নিজ রাজ্যরক্ষা অথবা অধিকার বিস্তার লইয়াই ব্যস্ত। ভারতের অন্য রাজাদের মধ্যেও কোনরূপ একতা বা জাতীয়তার ভাব নাই। সকলেই প্রায় মারাঠাদের ভয়ে ভীত ও মারাঠাদের প্রতাপে উৎপীড়িত। ইহার মধ্যে আবার নিজেদের মধ্যেও শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহ আছে। সর্ব্বদা সহস্র বিপদে তাঁহারা শঙ্কিত; অবিরত যুদ্ধে সকলে ক্লান্ত; পরস্পরের প্রতি প্রীতি, বিশ্বাস ও বন্ধুভাব কাহারো নাই। সুতরাং সকলের একমাত্র চিন্তা এই হইয়াছে, কেমন করিয়া নিরাপদে আপনার রাজ্যে একটুকু শান্তি ভোগ করিবেন। দূরদর্শী রাজনৈতিক লর্ড ওয়েলেস্‌লী বুঝিলেন, ভারতে ইংরেজ-প্রাধান্য স্থাপনের এই বড় সুন্দর অবসর।

মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে মিলিয়া তিনি শক্তিশালী মহীশূর রাজ্য জয় করিলেন। একভাগে মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশীয় একজনকে রাজা করা হইল *। আর তিন ভাগ তিন জনে ভাগ করিয়া নিলেন। ইংরেজের শক্তি ও প্রতিপত্তি ইহাতে আরও বাড়িল।

* ইঁহারই বংশধর বর্ত্তমান ইংরেজের অধীন মহীশূরের রাজা।

ইহার পর ওয়েলেস্‌লী ঘোষণা করিলেন যে, ভারতের রাজারা কেহ যদি ইংরেজের অধীন হন, সকল কার্য্যে ইংরেজের কথা-মত চলেন, তবে ইংরেজ সকল শত্রু হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন।

ভারতের রাজারা ইহা অপ্রত্যাশিত কল্যাণ বলিয়া মনে করিলেন। অনেকেই নিরাপদে ছায়াশীতল শান্তির আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজের অধীন হইলেন। ইঁহাদের দরবারে রেসিডেণ্ট নামে ইংরেজ-সরকারের এক একজন প্রতিনিধি রহিলেন। রাজারা এই রেসিডেণ্টদের মতানুবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

মারাঠারাজাদের মধ্যে এই সময় হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লা রাজারাই বিশেষ প্রবল ছিলেন। পেশোয়া ও গাইকোয়ার কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। প্রবলের ভয়ে দুর্ব্বল পেশোয়া ও গাইকোয়ারও ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

নামে পেশোয়া এখনো মারাঠারাজাদের প্রভু। সুতরাং প্রভু দ্বিতীয় বাজীরাওএর এই অধীনতা স্বীকারে সিন্ধিয়া এবং ভোঁস্‌লারাজারা অবমানিত বোধ করিয়া ইংরেজরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে হারিয়া রাজ্যের অনেক অংশ ইংরেজকে দিয়া তাঁহারা সন্ধি করিতে বাধ্য হন। পরে হোলকারও ইংরেজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করেন। যুদ্ধে হোলকার পরাজিত হইলেন।

এই ঘটনার ১৪।১৫ বৎসর পরে নিজেদের গত শক্তি আবার ফিরিয়া পাইবার জন্য বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের সময়, হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা রাজা তিন জনে মিলিয়া ইংরেজের সহিত এক যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। তিন শক্তিই ইংরেজের অধীন হইলেন। অধীন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওও ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। ইংরেজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন এবং তাঁহাকে বার্ষিক আটলক্ষ টাকা বৃত্তি ও কাণপুরের নিকটে বিঠুর জায়গীর দিয়া তথায় রাখিলেন।

ভারতে মারাঠাশক্তি লোপ পাইল; এখন সমস্ত ভারতেই একরূপ ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

ইহা বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

আমরা পূর্ব্বে পাঁচটি মারাঠা রাজ্যের কথা বলিয়াছি; বড় বড় এই পাঁচটি রাজ্য ছাড়া এই সব রাজ্যের অধীন ও আশ্রিত ছোট ছোট অনেক রাজ্যও ছিল। ইহাদের মধ্যে নাগপুরের উত্তরে ক্ষুদ্র ঝান্সী রাজ্য পেশোয়াদের অধীন ছিল। মারাঠাশক্তির পতনের সময় অন্যান্যের ন্যায় ঝান্সীর রাজাও ইংরেজের অধীন হইলেন।

পঞ্চাশ বৎসরের কিছু বেসি হইল, ভারতে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ হয়, তখন আমাদের আখ্যায়িকার নায়িকা লক্ষ্মীবাই এই ঝান্সীর রাণী ছিলেন।

(২)

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও যখন রাজ্য হারাইয়া বিঠুরে গেলেন, পেশোয়ার ভ্রাতা চিমাজি আপ্পা তখন কাশীতে গিয়া রহিলেন। মোরোপন্ত তাম্বে নামক কোন ব্রাহ্মণ ইঁহার দেওয়ান ছিলেন। তিনিও নিজ প্রভুর সঙ্গে সপরিবারে কাশীতে গেলেন। কাশীতে মোরোপন্তের একটি অতি সুন্দরী কন্যা হইল। কন্যার নাম তিনি মনুবাই রাখিলেন। বিবাহের পর এই বালিকাই লক্ষ্মীবাই নামে প্রসিদ্ধ হন।

মনুর যখন ৩৷৪ বৎসর বয়স, তখন চিমাজী আপ্পার মৃত্যু হওয়ায় মোরোপন্ত বিঠুরে গিয়া বাজীরাওএর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় মনুর মাতার মৃত্যু হয়। মাতৃহীনা মনু পিতার বড় আদরের, বড় স্নেহের পাত্রী হইলেন। মনু দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন। স্বাভাবিক তেজস্বিতায় ও সরলতায় এই সৌন্দর্য্যে একটি উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া উঠিত। বাজীরাও ও তাঁহার অনুচরগণ সকলেই মনুকে বড় স্নেহ করিতেন। স্বভাবতঃই মনুর হৃদয়ে তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা, ক্ষমতা-প্রিয়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ ছিল। গৃহে স্ত্রীলোক না থাকায় পুরুষের মধ্যেই মনু প্রতিপালিত হন। ইহাতে এই পুরুষোচিত গুণগুলিই তাঁহার মধ্যে বিশেষ ভাবে বিকাশ পাইতে লাগিল।

বাজীরাওএর সন্তান ছিল না। তিনি দুইটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া বড়টির নাম নানাসাহেব এবং ছোটটির নাম

রাওসাহেব রাখিয়াছিলেন। নানা সাহেব মনুকে বড় ভালবাসিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেন। মনুও নানার বিশেষ অনুগত হইয়া উঠিলেন। তিনি নানার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন; তরোয়াল খেলিতেন; ঘুড়ি উড়াইতেন। আবার সঙ্গিনীদের মধ্যে যখন থাকিতেন, তখন নিজে রাণী সাজিয়া তাহাদিগকে সখী বা দাসী সাজাইয়া 'রাজত্বের খেলা' করিতেন।

এইরূপে মনুর শৈশব কাটিল। আট বৎসর বয়সে ঝান্সীর রাজা গঙ্গাধররাওএর সঙ্গে মনুর বিবাহ হইল। মনুর অসঙ্কোচ নির্ভীকতা এত বেসি ছিল যে, বিবাহে যখন বরের কাপড়ের সঙ্গে তাঁর কাপড়ের গ্রন্থি বাঁধা হয়, তখন তিনি পুরোহিতকে বলিয়া ফেলিলেন,—"খুব শক্ত করিয়া বাঁধিবেন; গিঠ যেন খুলিয়া যায় না।"

বিবাহের বধূরূপে মনু যখন ঝান্সীতে আসিলেন, সকলে তাঁর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'লক্ষ্মী' নাম দিল। সেই অবধি মনু নাম উঠিয়া গেল, তিনি লক্ষ্মীবাই নামে পরিচিতা হইলেন।

লক্ষ্মীবাইএর পিতাও ঝান্সীর রাজার অধীনে সর্দ্দারের পদ পাইয়া ঝান্সীতে আসিয়া রহিলেন।

বিবাহের ৭।৮ বৎসর পরে লক্ষ্মীবাইএর একটি পুত্র জন্মিল। লক্ষ্মী গঙ্গাধরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং এই পুত্রই তাঁহারি প্রথম সন্তান ও উত্তরাধিকারী। পরিণত বয়সে প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করিয়া গঙ্গাধর যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু

তিন মাসের মধ্যে পুত্রটির মৃত্যু হইল। শোকে গঙ্গাধরের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। কঠিন রোগে মৃত্যু নিকট জানিয়া তিনি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। পুত্রের নাম হইল দামোদররাও।

গঙ্গাধর ইংরেজসরকারের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তাঁহার আনুগত্য ও বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে তাঁহার পোষ্যপুত্রের প্রতি সদয় থাকেন এবং তাঁহাব স্ত্রীর সমস্ত অধিকার ও সম্মান রক্ষা করেন, এই জন্য অনেক মিনতি করিয়া গঙ্গাধর মৃত্যুকালে রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট এক খানা পত্র লিখিয়া গেলেন।

এই সময় লর্ড ডালহৌসি ভারতের বড় লাট ছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতে ইংরেজশক্তির প্রাধান্য স্থাপিত করিয়া যান। এখন লর্ড ডালহৌসির ইচ্ছা হইল, ইংরেজশক্তিই ভারতে একমাত্র শক্তি হয়। এই চিন্তা করিয়া যুদ্ধে শিখজাতিকে পরাভূত করিয়া তিনি পঞ্জাব অধিকার করেন, অযোধ্যার নবাবকে বৃত্তি প্রদান করিয়া অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরেজ-শাসনাধীনে আনেন এবং নানা কারণ দেখাইয়া দেশীয় রাজাদের কয়েকটি রাজ্য ইংরেজশাসনভুক্ত করেন।

এই সময় তিনি নিয়ম করিলেন যে, যে সব রাজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া ইংরেজের অধীনতা ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া দত্তক পুত্র রাখেন, তবে এদেশের প্রাচীন প্রথামত সে দত্তক রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন। কিন্তু, ইংরেজ দেশীয় রাজাদের যে সব রাজ্য

জয় করিয়া, ফিরিয়া আবার দেশীয় রাজাদিগকেই সেই সব রাজ্যে রাজা করিয়া বসাইয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভূসম্পত্তির জায়গীরের অধিকারীর মত। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহারা যদি দত্তক রাখেন, তবে সেই দত্তক তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবেন, কিন্তু রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন না। এরূপ স্থলে রাজ্য ইংরেজ-রাজসরকারের শাসনাধীনে আসিবে।

এই নিয়মানুসারে লর্ড ডালহৌসি, সেতারা, নাগপুর ও ঝান্সী অধিকার করিলেন।

রাজ্য গেল, পুত্রের অধিকার লোপ পাইল; লক্ষ্মীবাই ইহাতে যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার স্বামীর গৃহীত দত্তক যে, হিন্দুশাস্ত্রবিধানের এবং দেশের প্রচলিত প্রথার অনুসারে তাঁহার স্বামীর রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী, এইরূপ অনেক যুক্তি দেখাইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজ্যের জন্য অনেক প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে যখন তাঁহার এ বিষয়ে আলাপ হয়, তখন তাঁহার সকল যুক্তি ও সকল অনুরোধ অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া রোষে ও ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই দৃঢ়স্বরে বলিলেন,——

"মেরি ঝান্সী দেঙ্গে নেহি!"

(অর্থাৎ, আমার ঝান্সী দিব না)

কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। ঝান্সী ইংরেজ অধিকারে আসিল।

(৩)

এই সময়ে বিঠুরে বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওএর মৃত্যু হইল। লর্ড ডালহৌসি তাঁহার পোষ্যপুত্র নানাসাহেবকে তাঁহার বৃত্তি দিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, বাজীরাওএর পোষ্যপুত্রকে গবর্ণমেণ্ট প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। বাজীরাও যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সম্পত্তি এবং বিঠুরের জায়গীর তাঁহার দত্তক নানাসাহেব ও রাওসাহেবের পক্ষে যথেষ্ট।

পিতার বৃত্তি পাইবার জন্য নানাসাহেব অনেক যুক্তি দেখাইয়া অনেক আবেদন করিলেন: বিলাতে আপনার প্রতিনিধি পাঠাইলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। ইহাতে, নানাসাহেব ইংরেজরাজসরকারের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ছোট বড় দেশীয় সম্ভ্রান্ত রাজ্যগুলি ইংরেজরাজসরকারভুক্ত করায় ক্রমশঃ দেশের লোকের অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং আরও দু'একটি কারণে এই সময় সহসা ভারতবিখ্যাত সিপাহী-বিদ্রোহ * উপস্থিত হয়।

* ইংরেজরাজের সৈন্য দুই রকম।—ইংরেজ সৈন্যগণকে গোরা এবং এদেশীয় সৈন্যগণকে সিপাহী বলে। এই সিপাহীরা ক্ষেপিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বেহার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরভারতে এবং মধ্যভারতের অনেক স্থলে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিদ্রোহী সিপাহীরা তাহাদের ইংরেজ কর্ম্মচারী-দিগকে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল। যে যে স্থানে বিদ্রোহ হইল, ইংরেজ অধিবাসীরা সপরিবারে স্থানীয় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সিপাহীরা যেখানে এই সব দুর্গ অধিকার করিতে পারিল, ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা সকলকেই গুলি করিয়া মারিল। অন্য যে ভাবে যেখানে কোন ইংরেজ তাহাদের হাতে পড়িত, সকলকেই তাহারা এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে মারিত।

কিন্তু সিপাহীরা এইরূপ নিষ্ঠুর-ব্যবহার করিলেও দেশের গ্রামবাসী অনেক স্ত্রীপুরুষ অনেক পলাতক ইংরেজ-পরিবারকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সিপাহীরা জানিতে পারিলে ধনেপ্রাণে ইঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবে জানিয়াও, ইঁহারা এদেশীয় নরনারীর স্বাভাবিক কোমল ও পরদুঃখকাতর প্রকৃতির বশে, কোন ভয়েই বিপন্নকে আশ্রয়দানে রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সিপাহীরা দিল্লীর বাদসাহনামধারী বৃদ্ধ বাহাদুর সাহকে ভারতসম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল। তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কাণপুরে বিদ্রোহীদের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল। নানাসাহেব সেখানে তাঁহাদের নেতা হইলেন। তাঁতিয়াটোপে নামক একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ কখনো

মধ্যভারতে, কখনো উত্তরভারতে নানাস্থানে ঘুরিয়া নানা-সাহেবের পক্ষে বিদ্রোহীদের সহায়তা ও তাঁহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বেহারের ক্ষত্রিয় জমিদার কুমারসিংহকে অবিশ্বাস করিয়া গবর্ণমেণ্ট ধরিবার চেষ্টা করায় তিনিও সেখানে বিদ্রোহীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যায় স্বামিগণ বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঝান্সীতেও ইংরেজের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যদিও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্মীবাই যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট ছিলেন, তবু প্রতিশোধের জন্য প্রথমে তিনি সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেন নাই।

সিপাহীদের উত্তেজনার লক্ষণ টের পাইয়াই ঝান্সীর ডেপুটি কমিশনার কাপ্তেন গর্ডন সাহেব স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের রক্ষার জন্য লক্ষ্মীবাইএর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাণী আপন প্রাসাদে যত্নে ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে ইংরেজেরা ঝান্সী দুর্গে গিয়া রহিলেন। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকেও রাণীর আশ্রয় হইতে দুর্গে নিয়া গেলেন। দুর্গেও দুই তিনদিন পর্য্যন্ত রাণী ইঁহাদিগের জন্য গোপনে রুটি পাঠাইতেন। ইঁহাদের রক্ষার জন্য তিনি গর্ডন সাহেবের নিকট কিছু সৈন্য সংগ্রহের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু সাহেব জানাইলেন এরূপ সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তাঁহারা দুর্গরক্ষা করিতে পারিলেন না। সিপাহীরা দুর্গ অধিকার করিয়া ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা সকলকেই

হত্যা করিল। দুইজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক মাত্র অতি কষ্টে পলাইয়া রক্ষা পান। কোন কোন ইংরেজ লেখক বলেন,—রাণীর আদেশে বা জ্ঞাতসারে রাণীর লোকজনও সিপাহীদের সঙ্গে ভীষণ হত্যাকাণ্ডে যোগ দেয়। কয়েকজন ইংরেজকর্ম্মচারী সাহায্যের জন্য রাণীর নিকট যাইতেছিলেন; পথে রাণীর লোকেরা ইঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাণীর নিকট লইয়া যায়। রাণী ইঁহাদিগকে সিপাহীদের হাতে দেন এবং সিপাহীরা হাতে পাইয়াই ইঁহাদিগকে হত্যা করে।—কিন্তু একজন বিশিষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিক অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন, রাণী বা রাণীর লোকজন কোন ভাবেই এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। যে দুইজন সাহেব পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন পরে রাণীর পোষ্যপুত্র দামোদর রাওএর নিকট পত্র লিখিয়া জানান যে, রাণীর নামে এই কলঙ্ক মিথ্যা। হত্যার সহায়তা করা দূরে থাকুক, রাণী বিপদে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া, আহার দিয়া, এমন কি, লোকজন দিয়াও সাহায্য করেন।

দুর্গ অধিকার করিয়া সিপাহীরা রাণীর প্রাসাদ আক্রমণ করিল। যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য রাণীর কাছে তাহারা তিনলক্ষ টাকা চাহিল। টাকা না দিলে তাহারা রাণীর প্রাসাদ তোপের মুখে উড়াইয়া দিবে, এই ভয় দেখাইল।

রাণীর এত টাকা দিবার শক্তি ছিল না। তিনি মার্জ্জনার জন্য অনেক মিনতি করিলেন। কিন্তু সিপাহীরা শুনিল না।

অগত্যা রাণী অলঙ্কারে ও নগদে একলক্ষ টাকা সিপাহীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

আনন্দে সিপাহীরা রাণীর জয়ধ্বনি করিল, এবং, এ রাজ্যের মালিক রাণী, এই ঘোষণা করিতে করিতে দিল্লীর দিকে গেল।

ঝান্‌সী এখন অরাজক। ইংরেজের শাসন বিধ্বস্ত হইয়াছে। সিপাহীরাও চলিয়া গিয়াছে; কতদিনে আবার ইংরেজ আসিয়া ঝান্‌সীতে শাসন ও শান্তি স্থাপন করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। অরাজকতায় ও বিশৃঙ্খলতায় ঝান্‌সীর প্রজাদের বিড়ম্বনার একশেষ হইবে। রাজ্য হারাইয়াও প্রজাদের প্রতি স্নেহ মমতা রাণী এখনো ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ঝান্‌সীতে প্রধান লোক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি ঝান্‌সীর শাসনভার লইলেন। জব্বলপুরের কমিশনারের নিকট রাণী লিখিয়া পাঠাইলেন, যে, রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত দেখিয়া প্রজার রক্ষার জন্য তিনি রাজ্যের শাসন-ভার হাতে নিয়াছেন। যতদিন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঝান্‌সীতে আবার তাঁহাদের অধিকার স্থাপন করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহা-দের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি রাজ্যশাসন করিবেন।

কিন্তু ইংরেজকর্ম্মচারীরা রাণীর এই কথা বিশ্বাস করিলেন না। যুদ্ধের গোলযোগের সময় সকল কথা ঠিক ভাবে সব যায়গায় যায় না। নিত্য কত মিথ্যা ও অর্দ্ধসত্য জনরবও উঠে। ঝান্‌সীতে বাস্তবিক কখন্ কি ভাবে কি ঘটনা হইয়াছিল, প্রমাণসহ তাহার ঠিক বিবরণ দূরস্থ ইংরেজরাজকর্ম্মচারীদের

নিকট পৌঁছিবার সম্ভাবনা ছিল না। আবার দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে রাজপুরুষদের মনে বিশ্বাস অপেক্ষা সন্দেহের ভাবই বেসি প্রবল থাকে। সামান্য ঘটনায়, সামান্য কোন কথায়, এমন কি সামান্য কোন ইঙ্গিতে পর্য্যন্ত—অতি বিশ্বাসী অনুগত প্রজাকেও তাঁহারা শত্রু বলিয়া সন্দেহ করেন। রাণীকে তাঁহারা বিশেষ তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিতেন। ঝান্‌সী অধিকার করায় রাণী যে ইংরেজের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহাও জানিতেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহেবের শত্রুতার যে কারণ, রাণীর তাহা অপেক্ষা বেসি কারণ আছে। এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্যে না হউক, গোপনে যে রাণী সিপাহীদের পক্ষে,—ইংরেজরাজপুরুষদের মনে এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

ইংরেজ-স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকাদের হত্যাকাণ্ডে রাণী লিপ্ত আছেন, পূর্ব্বেই এই জনরব তাঁহারা শুনিয়াছিলেন। এখন রাণীর ঝান্‌সীর শাসনভার গ্রহণে তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস হইবারই কথা, যে, বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাণী আপনার রাজ্য উদ্ধার করিতে চান এবং তাঁহার এই পত্র ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য রাজনৈতিক চাতুরী মাত্র। তারপর আবার রাণীর কাছে টাকা পাইয়া সিপাহীরা যে, রাণী রাজ্যের মালিক, এই কথা প্রচার করিতে করিতে দিল্লীর দিকে গিয়াছিল, ইহাতে এই ধারণা দৃঢ় হইবার কারণ ঘটে। রাণীর নামে এই কথা উঠিল, যে, সিপাহীদিগকে টাকা দিয়া তাহাদের সাহায্যে রাণী ঝান্‌সীর রাজত্ব অধিকার করিয়াছেন।

যে ভাবে যে কারণেই হউক, ইংরেজরাজপুরুষগণ, রাণী যে বাস্তবিক তাঁহাদের পক্ষে, এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। নানাসাহেব প্রভৃতির ন্যায় রাণীকেও তাঁহারা শত্রু বলিয়া মনে করিলেন।

রাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ইংরেজের হত্যাকাণ্ডে যে রাণীর সংস্রব ছিল না, এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজের উপর অসন্তুষ্ট থাকিলেও, নির্দ্দোষ বিপন্ন ইংরেজ নর-নারীকে হাতে পাইয়া নিষ্ঠুর হত্যায় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া, তাঁহাদের রক্ষার জন্য যত্নবতী হইবেন, কোমলহৃদয়া ভারতরমণী রাণী লক্ষ্মীবাইএর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজকে যদি তিনি শত্রুও মনে করিয়া থাকেন, তথাপি বিপন্ন শত্রুকে রক্ষা করা এক কথা আর সুযোগ পাইয়া হৃতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা আর এক কথা। যে ঝান্সী তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল, যে ঝান্সী হারাইবার আশঙ্কায় দৃঢ় ও গর্ব্বিত স্বরে 'মেরি ঝান্সী দেঙ্গে নেহি' বলিয়া তিনি একদিন ইংরেজরাজপুরুষকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, যে ঝান্সী হারাইয়া এতদিন তিনি দারুণ মনোকষ্টে দিনপাত করিয়াছিলেন, এমন সুযোগে সেই ঝান্সী ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা যে তাঁহার না হইতে পারে এমন নয়। আবার এই ইচ্ছা সত্ত্বেও বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী রাণী ইহাও মনে করিতে পারেন যে, এই সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরেজের প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি কখনো বিধ্বস্ত হইবে না; এই সব অবস্থার

মধ্যে রাণীর মনে যে প্রকৃত কি ইচ্ছা ও কি উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

বিদ্রোহী সিপাহীর সহায়তায় আবার তাঁহার ঝান্সী ফিরিয়া পাইতে পারেন এরূপ কোন আশা বা ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল, রাণীর নিজের কথায় বা ব্যবহারে এরূপ কিছু প্রকাশ পায় নাই। বিপ্লবের মধ্যে ইংরেজের প্রতিনিধি স্বরূপ ঝান্‌সীর শান্তি রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য,—ঝান্সী গ্রহণ করিয়াই তিনি নিকটস্থ ইংরেজ রাজপুরুষকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান। যত দিন তিনি ঝান্সী শাসন করেন, যখনই কোন গুরুতর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তখনি সে সংবাদ ইংরেজ-রাজপুরুষকে পাঠাইতেন। হইতে পারে, বিপ্লবের সুযোগে ঝান্‌সী আপন হাতে ফিরিয়া আনাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ; কেবল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভাব রাখিবার জন্যই তিনি যেন তাঁহাদের হইয়া কাজ করিতেছেন, ব্যবহারে এইরূপ দেখাইতেন।—একথা সত্য হইলেও রাণীর রাজনৈতিক চতুরতা ও দূরদর্শিতা যে অসাধারণ ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি।

(৪)

রাজ্য গ্রহণ করিয়া ৮। ১০ মাস কাল রাণী অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। একদিকে যেমন তাঁহার পুরুষোচিত সাহস, শক্তি, চতুরতা, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা

হল, অপর দিকে তেমনি দয়া কোমলতা প্রভৃতি গুণে তাহার রমণীহৃদয় পূর্ণ ছিল।

রাণীর বয়স এই সময় ২২। ২৩ বৎসর মাত্র ছিল। দেখিতেও তিনি অতি সুন্দরী ছিলেন। প্রতিভায় উজ্জ্বল, যৌবন-উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তির মত দেখাইত। দেবীর ন্যায় উজ্জ্বল রূপময়ী মূর্ত্তিতে, রাণীর ন্যায় দৃঢ়তা ও তেজস্বিতায়, মাতার ন্যায় স্নেহময় কোমল ব্যবহারে, ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অনুগত লোকজন, সৈন্যগণ ও প্রজাগণ সকলেই রাণীর নিতান্ত বশীভূত হইয়াছিল। বিখ্যাত ইংরেজ-সেনাপতি সার হিউ রোজ রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি নিজে রাণীর এই সব গুণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, রাণীর গুণে রাণীর প্রজা ও সৈন্যগণ তাঁহার এত বশীভূত যে, রাণীই তাঁহাদের শত্রুগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়ের পাত্রী।

বৈধব্যের পর হইতে রাণীর দৈনিক জীবন এইভাবে কাটিত :—শেষ রাত্রিতে উঠিয়া স্নান করিয়া তিনি বেলা ৪।৬ দণ্ড পর্য্যন্ত শিবপূজা করিতেন। তারপর উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিয়া রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণেই প্রায় দুইঘণ্টাকাল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন। এইজন্য তাঁহার ৪।৫টি ঘোড়া ছিল। প্রত্যহ সকল গুলিকেই এইরূপে চালনা করিতেন।

এই ব্যায়ামের পর আবার স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ও দীন দুঃখীকে দান করিয়া রাণী আহার করিতেন। আহারের পর বেলা প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত ছোট ছোট কাঁগজে রামনাম

লিখিতেন। পরে সেই কাগজের টুকরা গুলি ময়দার গুটির মধ্যে পূরিয়া মাছের খাইবার জন্য জলে ফেলিয়া দিতেন। তার পর সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত পুরাণ শুনিতেন। এই সময় লোকজনের সাক্ষাৎ ও আলাপ হইত। ইহার পর স্নান করিয়া আবার সন্ধ্যা আহ্নিকে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের উপরে কাটিত। তখন রাণী শুইতে যাইতেন।

রাজ্যশাসনের সময়, প্রত্যহ রাম নাম লেখা শেষ হইলে বেলা প্রায় ৩টায় রাজকার্য্যের জন্য রাণী দরবারে আসিতেন। এই সময় কখনো তিনি পুরুষবেশে কটিতে অসি ঝুলাইয়া, কখনো নারীবেশে সাদা সাড়ী, সাদা কাঁচুলী, এবং সামান্য কিছু হীরা মুক্তার অলঙ্কার পরিয়া আসিতেন।

দরবার ঘরের পাশে অন্য একটি ঘরে পরদার আঁড়ালে রাণীর গদীতে বসিয়া তিনি প্রজাদের আবেদন শ্রবণ, বিচার, ও অন্যান্য রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

••কিন্তু এই সামান্য ৮।১০ মাস মাত্র কালটুকুও তিনি শান্তিতে ও নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। তিনি রাজ্য গ্রহণ করিবার পরেই তাঁহার স্বামীর এক নিকট আত্মীয় সদাশিব রাও নারায়ণ, কোন দুর্গ ও কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়া আপনাকে ‘ঝান্‌সীর মহারাজ’ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু রাণী অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া তাহাকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। কিন্তু এক শত্রুর দমন হইতে না হইতে আর এক প্রবলতর শত্রু দেখা দিল। ঝান্‌সীর নিকটে বোরছা বা তেহরী

নামে ক্ষুদ্র একটি রাজ্য ছিল। বোরছার রাণী লড়ট্টিবাইএর সেনাপতি নথে খাঁ কুড়িহাজার সৈন্য লইয়া ঝান্সী আক্রমণ করিলেন।

রাণীর সৈন্যবল বেসি ছিল না। ইংরেজেরা রাজ্য অধিকার করার সময় তাঁহার সমস্ত তোপ ও গোলা বারুদ নষ্ট করিয়া ফেলেন। এই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাণী অতি সত্বর বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কারখানা খুলিয়া কামান বন্দুক ও গোলা বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বুন্দেলখণ্ডের সর্দ্দারগণ নিজ-নিজ সৈন্য লইয়া আসিলেন। দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া রাণী যথাস্থানে কামান সাজাইলেন। নিজে পাঠান বেশে সাজিয়া কামানের কাছে দাঁড়াইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

দুর্গের উপর রাণী ইংরেজের ও পেশোয়ার নিশান উড়াইলেন। নথে খাঁ দুর্গ আক্রমণ করিয়া, পরাজিত হইয়া রাণীর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

যুদ্ধের সময় মাতার ন্যায় স্নেহে রাণী সৈন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। আহত সৈন্যদের যাতনায় রাণীর চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইত। নিজে উপস্থিত থাকিয়া, তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার তত্ত্ব করিতেন। কাছে বসিয়া মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিয়া, গায় হাত বুলাইয়া তাহাদের কষ্ট দূর করিতেন।

যাহা হউক ;—ইন্দোরে যে ইংরেজরাজপ্রতিনিধি বা এজেন্ট থাকিতেন, ঝান্সী তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল ; নথে খাঁর বিবরণ

রাণী তাঁহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পত্র এজেণ্ট সাহেবের নিকট পৌঁছিল না।

(৫)

ইংরেজরাজপুরুষগণ রাণীকে শত্রু বলিয়া মনে না করেন, এজন্য রাণী এ পর্য্যন্ত যত চেষ্টা করিয়াছেন, সকলই বিফল হইল। রাণীকে দমন করিয়া, ঝান্‌সী অধিকার করিবার জন্য সেনাপতি সার হিউরোজ্ সৈন্য সহ ঝান্‌সীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরেজের সঙ্গে রাণী যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতে-ছেন, তাহাতে যে, ইংরেজ সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাই-বেন, একথা তিনি কখনো মনে করেন নাই।

ইন্দোরের এজেণ্টের নিকট সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য রাণী দূত পাঠাইলেন। কিন্তু, দূত ইন্দোরে গেল না; ইংরেজপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করিল না। দূরে থাকিয়া অনেক মিথ্যা কথা রাণীকে লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। রাণী ভাবিলেন, দূত ইংরেজপ্রতিনিধির নিকট তাঁহার পক্ষ সমর্থনের যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন।

এদিকে ঝান্‌সীর নূতন সৈন্যগণ এবং কর্ম্মচারীদের মধ্যে পূর্ব্বে যাহারা ইংরেজের ঝান্‌সী অধিকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা সকলে রাণীকে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।

এই সমস্যার মধ্যে রাণী আবার সংবাদ পাইলেন যে, তিনি যদি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া কর্ম্মচারিগণ সহ ইংরেজ-শিবিরে গিয়া

আত্মসমর্পণ করেন, তবে ইংরেজ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। এরূপ কার্য্য রাণী নিরাপদ ও সম্মানজনক মনে করিলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন।

রাণীর মাত্র এগার হাজার সৈন্য ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব, শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়া রাণী নিজে তাঁহাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। ঝান্‌সীনগর দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরে যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, তোপ ও সৈন্যসংস্থান করিয়া রাণী নগররক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮৫৮ সালের মার্চ্চমাসের শেষ ভাগে সার হিউরোজ ঝান্‌সী অবরোধ করিলেন। অতুল বিক্রমে ১০।১১ দিন পর্য্যন্ত রাণী ঝান্‌সী রক্ষা করিলেন। এই সময় দিবারাত্রিতে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া রাণী সর্ব্বদা গোলন্দাজ ও সিপাহীদের কাছে কাছে ঘুরিয়া তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। যেখানে যখনই যে অভাব হইত, নিজে থাকিয়া সে অভাব পূর্ণ করিতেন। ক্লান্ত সৈন্যদিগকে উৎসাহ বাক্যে সাহস দিতেন। প্রাচীর কোন স্থান বিপক্ষের গোলায় ভাঙ্গিলে নিজে দাঁড়াইয়া মিস্ত্রীদের দ্বারায় তাহা সংস্কার করাইতেন। নগরে যাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের আশ্রয় স্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করিতেন।

রাণীর বীরত্বে, শক্তিতে, অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে বালকবালিকারা পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ইহারা

প্রাচীরসংস্কারে সাহায্য করিত ; ক্লান্ত সৈন্যদের জন্য আহার ও পানীয় আনিয়া দিত।

যুদ্ধের সূচনা বুঝিয়াই রাণী নানাসাহেবের ও তান্তিয়া-টোপের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান। তান্তিয়া একদল সৈন্য লইয়া রাণীর সাহায্যে আসিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সার হিউরোজ প্রবল বিক্রমে ঝান্‌সীব প্রাচীর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে একদল সৈন্য গিয়া তান্তিয়াকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সব রসদ ও কামান অধিকার করিল।

ইহার কয়েক দিন পরেই নগর-প্রাচীরের একটি দ্বার ইংরেজ-সৈন্যের হস্তগত হইল। সেই পথে ইংরেজ সৈন্য নগরে প্রবেশ করিল। রাণী দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অন্য কোন স্থান হইতে সাহায্য আসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এ অবস্থায় অধিক দিন দুর্গরক্ষা করা অসম্ভব। সাহায্যের অভাবেই সত্বর তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া রাণী একদিন রাত্রির অন্ধকারে, পিতা, বালক পুত্র দামোদর এবং কয়েকজন অনুচর লইয়া গোপনে ঝান্‌সী ছাড়িয়া গেলেন।

রাণীর পলায়নের সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে ধরিবার জন্য ইংরেজসৈন্য পশ্চাতে ছুটিল। রাণীর পিতা ধরা পড়িলেন। তাঁহার ফাঁসী হইল। রাণী পুত্রসহ কাল্পীতে তাঁতিয়াটোপের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

ঝান্‌সীতে অনেক ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা

নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছিলেন। নগর অধিকার করিয়াই প্রতিহিংসায় মত্ত ইংরেজসৈন্য ঝান্‌সীর অনেক গৃহ পোড়াইয়া ছারখার করিল; অনেক লোককে হত্যা করিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব লিখিয়াছেন, প্রায় পাঁচহাজার ঝান্‌সীবাসী এইরূপে নিহত হয়। স্ত্রীলোকদের সম্মানরক্ষার জন্য অনেক নগরবাসী নাকি নিজের হাতে তাহাদের প্রাণ বিনাশ করেন। অনেক স্ত্রীলোক কূপের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণ নগর ও দুর্গ লুণ্ঠন করিল। ধনীগৃহের জিনিষপত্র সব ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিল। সেনাপতির চেষ্টায় শেষে শৃঙ্খলা আসিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে তিনি নিরন্ন ও গৃহহীন অবশিষ্ট লোক যাহারা ছিল, তাহাদিগকে আহারাদি দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে রাণী কাল্পীতে গিয়া তান্তিয়াটোপের সৈন্য পরিচালনায় সহযোগিনী হইলেন। নানাসাহেবের ভ্রাতা রাও-সাহেবও এই সময় কাল্পীতে ছিলেন। কাল্পীর ৪০ মাইল দূরে কুঁচনামক স্থানে ইংরেজসৈন্যের সঙ্গে তাঁহাদের একটি যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে সৈন্য লইয়া ইঁহারা পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন।

কাল্পীর নিকটে আর একটি যুদ্ধ হইল। স্ত্রীলোক বলিয়া রাওসাহেব রমণীর হাতে অধিক সৈন্য দিলেন না। মাত্র আড়াই শত অশ্বারোহী সৈন্যের ভার তিনি পাইলেন। কিন্তু অল্প সৈন্য

লইয়াও রাণী এমন বেগে ও বিক্রমে ইংরেজ সৈন্যের এক ভাগ আক্রমণ করিলেন, যে, তাহারা সে বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া হটিয়া গেল। কিন্তু অন্য দিকে নূতন একদল ইংরেজ-সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। রাওসাহেব পরাজিত হইয়া তাঁহার সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন। অগত্যা রাণীও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই যুদ্ধের পর কাল্পীও ইংরেজের হাতে পড়িল। রাওসাহেব ও তাঁহার সহযোগী কেহ কেহ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাণী ইহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, পলায়নে তাহাদের সকল আশা একেবারে শেষ হইবে। এরূপ অরক্ষিত অবস্থায়ও যুদ্ধে আত্মরক্ষা করা যাইবে না। সুতরাং কোন দুর্গ অধিকার করিয়া সেখানে সৈন্যবল রাখিয়া যুদ্ধ চালান প্রয়োজন। নিকটে সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র দুর্গ পর্ব্বতের উপর বিশেষ দৃঢ় ভাবে স্থাপিত ও গঠিত। সিন্ধিয়া ইংরেজের পক্ষে আছেন সত্য, কিন্তু এই দুর্গ যদি তাঁহারা অধিকার করিতে পারেন, তবে দুর্গস্থ সিন্ধিয়ার সৈন্যগণকেও তাঁহারা আপনাদের মতে আনিতে পারিবেন। এমন দৃঢ় দুর্গ এবং দুর্গের সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সব হাতে পাইলে তাঁহাদের শক্তি অনেক বাড়িবে। তাঁহারা সবলে যুঝিতে পারিবেন।

রাণীর এই প্রস্তাবে তাত্তিয়াটোপে সম্মত হইলেন। সৈন্য লইয়া সকলে গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাও সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা উঠিলে সৈন্যগণ উত্তেজিত

হইয়া বিদ্রোহী হইতে পারে, এই ভয়ে সিন্ধিয়া ও তাঁহার চতুর মন্ত্রী, মুখে তাঁহাদিগকে বন্ধুত্ব জানাইয়া যেন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে যাইতেছেন, এই ভাবে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রাওসাহেবও তাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। কিন্তু রাণী তাঁহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া নিজের অধীন ২।৩ শত সৈন্য লইয়া প্রস্তুত ছিলেন। সিন্ধিয়ার গোলন্দাজেরা যখন অতর্কিত রাওসাহেবের সৈন্যদের উপর কামান চালাইতে আরম্ভ করিল, তখন রাণী সহসা তাঁহার সৈন্য লইয়া প্রবল বেগে তাহাদের কামানের মুখে গিয়া পড়িলেন। সে বেগ সহিতে না পারিয়া গোলন্দাজেরা কামান ফেলিয়া পলায়ন করিল। এদিকে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণও অনেকে আসিয়া রাও সাহেবের সঙ্গে যোগ দিল। সিন্ধিয়া পরাজিত হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। গোয়ালিয়র রাও সাহেবের হস্তগত হইল।

গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া রাওসাহেব নানাসাহেবকে পেশোয়া এবং আপনাকে পোশোয়ার অধীন গোয়লিয়রের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়া আনন্দ উৎসব আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্মীবাই ইহাতে বিরক্ত হইলেন। উৎসব ছাড়িয়া সৈন্যদের মধ্যে শৃখলা আনিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে তিনি রাও সাহেবকে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাও সাহেব রাণীর উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। এই সময় লার হিউরোজ

ইংরেজ সৈন্য লইয়া গোয়ালিয়রের দিকে আসিলেন। তখন রাও সাহেব তান্তিয়াটোপেকে সৈন্য সাজাইয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। নিজে আগের মত নিশ্চেষ্ট রহিলেন।

রাও সাহেবের পক্ষ গোয়ালিয়রের বাহিরে দূরে কোথাও ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। ইংরেজ সৈন্য গোয়ালিয়র আক্রমণ করিল। রাণীর উপর গোয়ালিয়রের পূর্ব্বদিক রক্ষার ভার পড়িল। পুরুষ বেশে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়া রাণী সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে সৈন্যদের শৃঙ্খলা বিধান এবং নগর রক্ষার অন্যান্য বন্দোবস্ত করিলেন।

১৮ই জুন তারিখে সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। সমস্তদিন রাণী অশ্বপৃষ্ঠে, সৈন্যদের কাছে থাকিয়া অদম্য উৎসাহে বিক্রমে এবং রণকৌশলে তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যেরই জয় হইল।

মুন্দরা ও কাশী নামে রাণীর দুইজন সহচরীও ঘোড়ায় চড়িয়া রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই দুইজন সহচরী ও কয়েক-জন অনুচর লইয়া রাণী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী রাণীর পশ্চাতে ছুটিলেন। রাণীর ঘোড়া সকলের আগে ছুটিতেছিল। সহসা কাতর রোদন শুনিয়া রাণী ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহচরী মুন্দরাকে একজন ইংরেজ অশ্বারোহী আক্রমণ করিয়াছে। রাণী ঘোড়া ফিরাইয়া বিদ্যুৎ-বেগে তাহাদের কাছে আসিলেন,—অসির আঘাতে অশ্বারোহীকে হত্যা করিয়া আবার ছুটিয়া চলিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে রাণী সহসা দেখিলেন—সম্মুখে একটি ছোট খাল। ঘোড়া থামিল। কিছুতেই সে, খাল পার হইতে চাহিল না। ইতিমধ্যে কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী আসিয়া পড়িল। অসিতে অসিতে ইহাদের সঙ্গে রাণীর যুদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি একা কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন। মস্তকে অসির আঘাতে এবং বক্ষে সঙ্গিনের আঘাতে মুমূর্ষু হইয়া রাণী ভূতলে পড়িলেন। নিকটে এক সন্ন্যাসীর কুটীর ছিল। রাণীর একজন অনুচর তাঁহাকে সেই কুটীরে নিয়া গেল। সন্ন্যাসী রাণীর মুখে গঙ্গাজল দিলেন। দেখিতে দেখিতে রাণীর অমর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সর্ব্বত্র সিপাহীবিদ্রোহের নিবৃত্তি হইল। দিল্লীর বাদসাহ বাদসাহী নাম হারাইয়া রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁতিয়া ধরা পড়িল। তাঁহার ফাঁসি হইল। নানাসাহেব নিরুদ্দিষ্ট হইলেন; তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কুমার-সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আর কোন আশা নাই দেখিয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুরনারীরাও অনেকে যুদ্ধ করিতেন। শেষ যুদ্ধে যখন তাঁহারা দেখিলেন, আর কোন আশা নাই, তখন সকলে নিজেদের তোপের মুখে মাথা রাখিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

লক্ষ্মীবাইএর পুত্রের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। সরকার হইতে মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি ইন্দোরে গিয়া সামান্য ভাবে রহিলেন। দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইল।

ভারতবর্ষ এতদিন ইংরেজ বণিক কোম্পানীর হাতে ছিল। বিদ্রোহ দমনের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজের হাতে ভারত-সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া এই ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন যে, ইংরেজ ও এ দেশীয়দিগের মধ্যে কোন পার্থক্য না রাখিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষ তিনি ভারত শাসন করিবেন।

মহিমাময়ী মহারাণীর শাসনকালে ভারতে অখণ্ড শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

অবস্থার বৈগুণ্যে যে কারণেই রাণী লক্ষ্মীবাই অস্ত্রধারণ করিয়া থাকুন, এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে, রাণী লক্ষ্মীবাইএর নামও মহত্বে ও বীরত্বে, বিক্রমে ও গুণে, এযুগের প্রারম্ভ-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

রাণী ভবানী।

(১)

রাণী ভবানীর নাম জানেন না, কথা প্রসঙ্গে কখনো রাণী ভবানীর নাম মুখে আনেন নাই, এমন লোক এদেশে অতি অল্পই আছেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা যখন বাঙ্গালার নবাব, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ে যখন এদেশে মুশলমান-শক্তির পতন হইল, ইংরেজশাসনের সূত্রপাত হইল, রাণী ভবানী তখন নাটোরের বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকারিণী ছিলেন। এই জমীদারীর অধিকারিণী হইয়া, এই জমীদারীর বিপুল আয় দুই হাতে অকাতরে দেব-সেবায় ও লোকসেবায় ব্যয় করিয়া অসংখ্য ও অতুল কীর্ত্তিতে রাণী ভবানী বাঙ্গালার গৃহে গৃহে চির-যশস্বিনী এবং চির পুণ্যতীর্থ বারানসীতে পর্য্যন্ত প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন।

রাণী ভবানীর জীবন ও কৃতিত্ব বুঝিতে হইলে, মুশলমান-আমলে বাঙ্গালার অবস্থা,—বিশেষতঃ বাঙ্গালার জমীদারদের অবস্থা কিছু বুঝিতে হইবে।

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথমে পশ্চিম বঙ্গ, পরে আনুমানিক দুইশত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ মুশলমানদের অধিকৃত হয়। দিল্লীর বাদসাহরাই উত্তর ভারতে মুশলমানসাম্রাজ্যের প্রভু ছিলেন। বাঙ্গালা

সেই সাম্রাজ্যের অধীন একটি প্রদেশ হইল। বাদসাহের শাসনকর্ত্তারা বাদসাহের অধীনে বাঙ্গালা শাসন করিতেন। ইহাদের 'নবাব' নাম ছিল। নবাবেরা দিল্লীর বাদসাহকে কর দিতেন, রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতেন, সাধারণ ভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন; ইহা ভিন্ন আর সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীন রাজার ন্যায় বাঙ্গালা শাসন করিতেন। বাদসাহের ক্ষমতা কখনো দুর্ব্বল হইলে, তাঁহারা একেবারেই স্বাধীন হইতেন; বাদসাহের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতেন না। পাঠান সম্রাটগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, একবার বাঙ্গালার নবাবরা স্বাধীন হন। আবার পাঠান-সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন মোগল-সম্রাট্ আকবর সাহ বাঙ্গালা জয় করিয়া বাঙ্গালা শাসনের জন্য নিজের নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। *

এই সময় হইতে মোগলরাজপ্রতিনিধিগণ বাঙ্গালা শাসন করিতেন। পরে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগলসম্রাট্গণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, মোগলসাম্রাজ্য পতনের মুখে চলিল, বাঙ্গালার নবাবগণ আবার স্বাধীন হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবাব মুরসিদকুলি খাঁ-ই একরূপ মোগল আমলে বাঙ্গালার প্রথম স্বাধীন নবাব ছিলেন। দিল্লীর বাদসাহ নামে মুশলমান-সাম্রাজ্যের প্রভু হইলেও, বাঙ্গালার শাসনের উপর এই

* আকবরের হিন্দু কর্ম্মচারী রাজা টোডর মল এবং রাজা মানসিংহ সর্ব্বপ্রথমে মোগলের অধীন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

সময় হইতে তাঁহার আর কোন কর্ত্তৃত্ব রহিল না। পাঠান রাজাদের সময় কখনো গৌড়, কখনো সুবর্ণগ্রাম, কখনো সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। মোগলশাসনকালে আকবরের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে পূর্ব্ববঙ্গে পর্টুগীজ দস্যুদের দমনের জন্য নবাব ইস্‌লাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী করিলেন। মুরসিদকুলিখাঁ নবাব হইয়া ভাগীরথীর তীরে মক্‌সুদাবাদ নামক স্থানে রাজধানী করেন। নিজের নাম অনুসারে তিনি এই স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মুরসিদাবাদ রাখিলেন। এই মুরসিদাবাদই বাঙ্গালার নবাবদের শেষ রাজধানী।

মুরসিদকুলিখাঁর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন এবং দৌহিত্র সরফরাজখাঁ পর পর বাঙ্গালার নবাব হন। সরফরাজের দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালার জমিদারগণ আলিবর্দ্দীখাঁকে নবাব কারলেন। আলিবর্দ্দীর পরে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন।

মুশলমান আমলে বাঙ্গালা বহু পরগণায় বিভক্ত ছিল। এক বা অধিক পরগণা এক-একজন জমিদারের হাতে ছিল। এখনকার জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে কেবল নির্দ্দিষ্টহারে খাজনা আদায় করিয়া কতক রাজসরকারে দেন, কতক নিজেরা ভোগ করেন। ইহা ভিন্ন প্রজার সঙ্গে জমিদারের শাসন সম্বন্ধে প্রজারা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজরাজসরকারের অধীন। তখন এরূপ ছিল না। জমিদারগণ রাজার ন্যায় নিজ-নিজ জমিদারী

শাসন করিতেন। নবাবসরকারে রীতিমত প্রাপ্য কর বুঝাইয়া দিতে পারিলে, ইঁহাদের জমিদারী ও জমিদারীর প্রজাশাসনে নবাবগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ বড় করিতেন না। জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পর রাজা প্রজা সম্বন্ধ ছিল। রাজার মত অনেক জমিদারের সিপাহী পর্য্যন্ত থাকিত। রাজার মত ইঁহারা প্রজাদের শাসন, বিচার ও দণ্ডবিধান করিতেন। ইঁহাদের 'রাজা' নাম ছিল; প্রজারাও রাজার মতই ইঁহাদিগকে মানিত। মোটের উপর নবাবদের সঙ্গে বাদসাহের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, জমিদারের সঙ্গে নবাবেরও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল।

হাতে এত শক্তি ছিল বলিয়াই কোন কোন জমিদার-রাজা গড় নির্ম্মাণ করিয়া এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কখনো কখনো একেবারে স্বাধীন হইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। পাঠান রাজত্বকালে দিনাজপুরের রাজা গণেশ এইবার বাঙ্গালার সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া মুশলমান রাজত্বের মধ্যে বাঙ্গালায় কিছুকালের জন্য আবার হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পুত্র যদু আবার মুসলমানধর্ম্ম ও মুশলমানী নাম গ্রহণ করিয়া দুই পুরুষের মধ্যেই সেই হিন্দু রাজত্বের শেষ করেন।

আকবরের সময় মানসিংহের শাসনকালে, প্রতাপাদিত্য যশোহরে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু মানসিংহ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য মোগলের অধিকারে আনেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে বর্দ্ধমান অঞ্চলের একজন সামান্য তালুকদার শোভাসিংহ

বর্দ্ধমানের রাজার বিরুদ্ধে উঠিয়া সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ অধিকার করেন। কিন্তু বন্দিনী বর্দ্ধমান রাজকন্যার সতীত্ব হরণের চেষ্টা করায়, রাজকন্যার ছুরিকাঘাতে ইঁহার জীবনের এবং জীবনের সঙ্গে বিদ্রোহ ও নূতন রাজ্যেরও শেষ হইল।

তারপর মুর্‌সিদকুলিখাঁর সময়ে ভূষণায় সীতারাম এবং রাজসাহীতে উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কিন্তু পরাজিত হওয়ায় দুইজনের রাজ্যই বিধ্বস্ত হইল। পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার ইশা খাঁ এবং কেদার রায়ও একবার বিশেষ শক্তিশালী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাও বিফল হয়।

এই স্থলে আর একটি কথাও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। মুশলমানগণ প্রথমে অবশ্য বিজেতারূপেই এদেশে আসেন। কিন্তু বাঙ্গালা জয় করিয়া বাঙ্গালাতেই তাঁহারা বসতি আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালায় বসতি করায় ক্রমে বঙ্গবিজেতা মুশলমান-গণের নিকট বাঙ্গালাই নিজের দেশের মত হইল। তাঁহারা বাঙ্গালী হইলেন। বাঙ্গালার মুশলমান নবাব বাঙ্গালী হইলেন; মুশলমান জায়গীরদার, জমিদার, রাজকর্ম্মচারী, বণিক্—সকলেই বাঙ্গালী হইলেন। ক্রমে হিন্দুর সঙ্গে একদেশবাসীর ন্যায় বন্ধুত্ব ও সদ্ভাবও তাঁহাদের হইল। রাজনৈতিকক্ষেত্রে হিন্দুমুশলমানে কোন প্রভেদ রহিল না।

নবাবসরকারে শাসন বিভাগে রাজস্ব-বিভাগে, এমন কি, সৈনিক বিভাগে পর্য্যন্ত প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে হিন্দু।

নবাবী আমলের শেষভাগে বাঙ্গালার শাসন ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে জানকীরাম, মাণিকচাঁদ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, মোহনলাল, নন্দকুমার প্রভৃতি হিন্দুগণের নেতৃত্বই সর্ব্ব প্রধান ছিল। আমাদের আখ্যায়িকার নায়িকা নাটোরের রাণীভবানীও অনেক পরিমাণেই ইঁহাদের সহযোগিনী ছিলেন।

(২)

রাণীভবানীর শ্বশুর রাজা রামজীবন এবং তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দন নাটোরের জমিদারী ও জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের পিতা কামদেব পুঁটিয়ার জমিদার-সরকারে গ্রাম্য তহশীলদারের কার্য্য করিতেন। বাল্যকাল হইতেই রামজীবন ও রঘুনন্দন এই জমিদারসরকারে প্রতিপালিত হন। পুঁটিয়ার জমিদার দর্পনারায়ণ বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রঘুনন্দন অত্যন্ত প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন। দর্পনারায়ণ ইঁহার গুণে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব সরকারে আপনার সহকারী ও প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিশেষ কোন রাজকার্য্যে রঘুনন্দনের সহায়তা পাইয়া নবাব মুরসিদ্‌কুলিখাঁ তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময় হইতে নবাব-সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইল এবং তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই রঘুনন্দন কিছু কিছু জমিদারী করিতেছিলন।

রাজসাহীর বিদ্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণের পরাজয়ের পর সমস্ত রাজসাহীর জমিদারী নবাব রঘুনন্দনকে দিলেন। পুঁটিয়ার

জমিদারী রাজসাহীর মধ্যে ছিল। পূর্ব্ব প্রতিপালক প্রভু দর্পনারায়ণের পরিবারের জন্য লস্করপুর পরগণা রাখিয়া সমস্ত রাজসাহীর জমিদারী রঘুনন্দন গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামে তাহা পত্তন করিলেন। ভূষণার বিখ্যাত রাজা সীতারামের পতন হইলে ভূষণার জমিদারীর অধিকাংশও রঘুনন্দন ও রামজীবন পাইলেন। ক্রমে আরো অনেক জমিদারী তাঁহাদের হস্তগত হইল। সমগ্র রাজসাহী বিভাগ এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও যশোহরের অনেক স্থান লইয়া এই বিস্তীর্ণ জমিদারী গঠিত হইল। বাঙ্গালায় এত বড় জমিদারী আর ছিল না। এই জমিদারী হইতে বৎসর ৫২ লক্ষ টাকার উপরে খাজনা নবাব সরকারে দেওয়া হইত।

সকল জমিদারীই রঘুনন্দন আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামে পত্তন করেন। এই বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধীশ্বর রামজীবনকে নবাব রাজা উপাধি দিলেন। ইনিই নাটোরের প্রথম রাজা।

রঘুনন্দন নিঃসন্তান ছিলেন। রামজীবনের প্রথম পুত্র কালিকাপ্রসাদ (কালীকোঙর) অল্পবয়সে মারা যান। রামজীবনের, রামকান্ত নামে পোষ্য পুত্র ছিল। * এবং রামজীবন
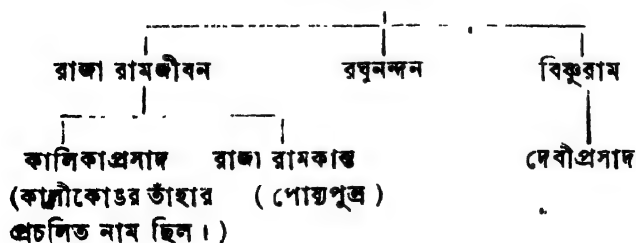
ও রঘুনন্দনের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। পোষ্যপুত্র রামকান্ত এবং দেবীপ্রসাদ অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক জমিদারীর অংশী। কিন্তু, দেবীপ্রসাদ দুরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ রামকান্তকে অসিদ্ধ দত্তক প্রমাণ করাইয়া সমস্ত জমিদারী তিনি অধিকার করিবেন, এইরূপ চেষ্টা করেন। রামজীবন তাঁহাকে ছয়আনা অংশ দিতে চা'ন, কিন্তু দেবীপ্রসাদ ইহাতে সম্মত হন না। ক্রমে রামজীবন বুঝিতে পারিলেন, দেবীপ্রসাদ জমিদারীর অংশ পাইলে তুমুল গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইবে। সুতরাং তিনি রামকান্তকে সমস্ত জমিদারীর অধিকারী করিয়া যান। জমিদারী তাঁহারি নামে ছিল, কাজেই এরূপ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না।

ইহার পর, রাজসাহীর মধ্যে ছাতিম গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর কন্যাকে অত্যন্ত সুন্দরী ও সুলক্ষণা দেখিয়া রামজীবন তাঁহার সঙ্গে পুত্র রামকান্তের বিবাহ দিলেন। এই কন্যাই ভবানী। ভবানী রাজবধূ হইয়া রাজগৃহে আসিলেন। রামজীবনের মৃত্যুর পর রামকান্ত রাজা হইলেন; ভবানী— 'রাণী ভবানী' হইলেন।

দয়ারাম নামে রামজীবনের একজন অতি চতুর ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী ছিলেন। এই জমিদারসরকারে এবং এই জমিদার-সরকার হইতে ক্রমে নবাব সরকারে পর্য্যন্ত আপন বুদ্ধি ও শক্তিবলে দয়ারাম বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া নিজেও জমিদার পদে উন্নীত হন। ইনিই বর্ত্তমান দীঘাপতিয়া রাজবংশের

প্রতিষ্ঠাতা। জমিদারী কার্য্যে দয়ারামের উপদেশের উপর নির্ভর করিতেই রামজীবন রামকান্তকে উপদেশ দিয়া যান।

কিন্তু রামকান্ত জমিদার হইয়া দয়ারামকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। প্রথম যৌবনের চপলতা বশতঃ জমিদারী-কার্য্যে অমনোযোগী হওয়ায় দয়ারাম একদিন রামকান্তকে কিছু অনুযোগ করেন। রামকান্ত ইহাতে দয়ারামকে অপমান করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দেন। রামজীবনের সময় হইতেই দয়ারাম এ সংসারে অনেক কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। স্বয়ং রামজীবন ও রঘুনন্দন তাঁহাকে অনেক খাতির করিতেন। আজ যুবক রামকান্ত তাঁহাকে এত অপমান করিল,—দয়ারাম ইহাতে বড় চটিলেন। তরলমতি রামকান্তকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি মুরসিদাবাদে নবাবসরকারে গেলেন।

এই সময় আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। ইনি পূর্ব্ব হইতেই দয়ারামকে জানিতেন। রাজা সীতারামের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দয়ারামের বুদ্ধি-কৌশলেই সীতারামের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মহাবীর মেনাহাতী নিহত হন। সুতরাং নবাব দরবারেও, দয়ারামের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

এই সময়ে নবাবসরকারে রামকান্তের অনেক খাজানা বাকী পড়িয়াছিল। দয়ারাম একদিন নবাবকে কহিলেন, রামকান্তের গৃহে বহু অর্থ সঞ্চিত আছে; ইচ্ছা পূর্ব্বক তিনি নবাবের খাজানা দিতেছেন না। এদিকে তিনি রাজার ন্যায় আড়ম্বরে বহু ব্যয় করিতেছেন।

নবাব, শুনিয়া যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। পূর্ব্বে উদয়-নারায়ণ, সীতারাম প্রভৃতি কোন কোন জমিদার এইরূপে নবাবের খাজানা বন্ধ করিয়া স্বাধীন রাজপদ লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। রামকান্তের উপর নবাবের সন্দেহেরও কিছু কারণ হইল। তিনি আদেশ করিলেন, রামকান্তের সমস্ত সঞ্চিত ধনসম্পত্তি নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাঁহার জমিদারী তাঁহার খুল্লতাতপুত্র দেবীপ্রসাদ পাইবেন।

আদেশ প্রচার করিয়া রামকান্তের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়া আনিবার জন্য নবাব, নাটোরে, সৈন্য পাঠাইলেন। নবাবের সৈন্য নাটোরে আসিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল। আত্মরক্ষা অসাধ্য দেখিয়া রামকান্ত প্রথম গর্ভবতী রাণী ভবানীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিলেন।

ধন সম্পত্তি সব নবাবসরকারে গেল; জমিদারী দেবী-প্রসাদের হইল। রামকান্ত মুরসিদাবাদে গিয়া একটি সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়া স্ত্রীকে লইয়া সেখানে রহিলেন। ভবানীর অলঙ্কার ব্যতীত আর কোন সম্বল তাঁহার ছিল না। তাহাই কিছু কিছু করিয়া বিক্রয় করিয়া রামকান্ত দিন চালাইতে লাগিলেন।

(২)

একদিন দয়ারাম পাল্কী চড়িয়া মুরসিদাবাদের কোন রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন; উপরে কোন সামান্য গৃহের ছাদ

হইতে কে ডাকিয়া বলিল,—"দয়া দাদা, আর কত দিন এ ভাবে থাকিব?"

দয়ারাম চাহিয়া দেখিলেন,দীন গৃহের ছাদের উপর দীনবেশে, বিষণ্ণ ও অশ্রুপ্লাবিত বদনে রামকান্ত দণ্ডায়মান। স্নেহময় প্রভু রাজা রামজীবনের একমাত্র পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বাল্যাবধি রাজোচিত ভোগবিলাসে প্রতিপালিত, তাঁহার নিজের কত আদরের কত স্নেহের রামকান্তের আজ এই অবস্থা। রাজ-পুত্র, রাজ্যেশ্বর রামকান্ত আজ তাঁহারি প্রতিহিংসার ফলে দীনবেশে দীনগৃহের উপরে দাঁড়াইয়া কাতর বচনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিতেছেন! ছি! ছি! তিনি কোন্ প্রাণে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন! তীব্র বিষময় জ্বালা সহসা দয়ারামের মর্ম্মের মর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। তিনি অবিলম্বে পাল্কী হইতে নামিয়া রামকান্তের নিকটে গেলেন।

রামকান্তের হাত ধরিয়া দয়ারাম কহিলেন,—

"ভাই, দুঃখ করিও না, কাঁদিও না; আমাকে মাপ কর। আমি তোমাকে ভিখারী করিয়াছি, আবার আমিই তোমাকে রাজ্যেশ্বর করিব।"

রামকান্ত আশ্বস্ত হইলেন। দয়ারাম একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"কিছু টাকা খরচ করিতে হইবে। তোমার হাতে কিছু আছে?"

রামকান্ত কহিলেন,—"টাকা কোথায় পাইব? সঙ্গে কিছুই

আনিতে পারি নাই। স্ত্রীর গায়ে যা অলঙ্কার ছিল, তা'ই বেচিয়া কোনমতে দিন চালাইতেছি।"

দয়ারাম কহিলেন,—"অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা না হইলে আবার তোমার জমিদারী ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব হইবে না। আমার নিজের হাতে এখন টাকা নাই। বউ-মা কোথায়? তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

দয়ারাম রাণী ভবানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। রাণী ভবানী নিজের বহুমূল্য যা' কিছু অলঙ্কার ছিল সব দয়ারামকে দিলেন।

অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দয়ারাম অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এই সময় দেবীপ্রসাদ মুরসিদাবাদে ছিলেন এবং প্রত্যহ নবাব-দরবারে যাইতেন। নবাব দরবারে প্রবেশের পথে যত দোকানদার ও লোকজন ছিল, সকলকে দয়ারাম অর্থ দিয়া বশীভূত করিলেন। দেবীপ্রসাদ যখন নবাবদরবারে যাইতেন, পথের দু'ধারের সকল লোকে দয়ারামের উপদেশ মত তাঁহাকে দেখাইয়া, বলিত,—"ঐ কমবক্তা (ভাগ্যহীন ও বুদ্ধিহীন) বেটা যাইতেছে।"

দেবীপ্রসাদ বড় বিরক্ত হইয়া নবাবের নিকট অভিযোগ করিলেন। দিনের পর দিন লোকে ঐরূপ বলিয়া দেবীপ্রসাদকে পাগল করিয়া তুলিল। নবাবও প্রত্যহ দেবীপ্রসাদের সেই অভিযোগে বড় বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"সকলেই যখন তোমাকে কমবক্তা বলে, তুমি নিশ্চয়ই 'কমবক্তা'। এত বড় জমিদারী তোমার হাতে থাকিতে পারে না।"

দয়ারামও সুযোগ বুঝিয়া দেবীপ্রসাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করিয়া আবার রামকান্তকে তাঁহার জমিদারী ফিরাইয়া দিতে নবাবকে অনুরোধ করিলেন। দেবীপ্রসাদের উপর বিরক্ত নবাব দয়ারামের অনুরোধে আবার সমস্ত জমিদারী লইয়া রামকান্তকে দিলেন।

রামকান্তের জমিদারী ফিরিয়া পাওয়া সম্বন্ধে এইরূপ গল্প আছে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নিতান্ত বিচক্ষণ ও বিবেচক রাজা ছিলেন। তরলপ্রকৃতি বালকের ন্যায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে এরূপ মতি পরিবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। গল্প অমূলক হইতে পারে। তবে, যে ভাবেই হউক, দয়ারামের বুদ্ধি-কৌশলেই যে রামকান্ত তাঁহার জমিদারী ফিরিয়া পা'ন, একথা সত্য।

(৩)

৩৪ বৎসর বয়সে রাজা রামকান্তের মৃত্যু হইল। রাণী ভবানীর দুইটি পুত্র হইয়া শৈশবেই নষ্ট হয়। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান তারা নামে এক কন্যা মাত্র তখন জীবিত। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুতে এই বিস্তীর্ণ জমিদারীর ভার তাঁহারি হাতে পড়িল। ৩২ বৎসরের সময় বিধবা হইয়া প্রায় ৮০ বৎসর রাণী ভবানী জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল গৃহে, জীবনে, সমান কঠোরভাবে বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া একদিকে যেমন তিনি রাণীর ন্যায় দক্ষতা ও তেজস্বিতার সহিত নিজের বৈষয়িক ও রাজ-নৈতিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি

নারীরূপিণী দেবীর ন্যায় দেবসেবা ধর্ম্মসেবা ও লোকসেবায় বিপুল সম্পত্তি মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। প্রতিভায় ও ধর্ম্মের মহিমায় রাণী ভবানীর মত নারী বাঙ্গালায় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। এক রাণী ভবানীর নামেই বাঙ্গালা চিরদিন গৌরবান্বিত থাকিতে পারে।

যথাকালে রাণী ভবানী রঘুনন্দন ভাদুড়ী নামক কোন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। শাশুড়ীর প্রতিনিধি স্বরূপ, জামাতা জমিদারীর উপর কর্ত্তৃত্ব পাইলেন।

দয়ারাম এখনো নাটোরের রাজসংসারে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। দয়ারামের উপকার স্মরণ করিয়া রাণী ভবানী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সকল কার্য্যেই দয়ারামের উপদেশ মানিয়া চলিতেন। জমিদারীর উপর জামাতা রঘুনন্দনের কর্ত্তৃত্ব দয়ারামের মনঃপুত হইল না। তিনি জামাতা, এই রাজবংশের তিনি কেহই নন। যে রাজপদে রাজা রামজীবন ও রাজা রামকান্ত সগৌরবে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন সেই পদে দরিদ্র-সন্তান রঘুনন্দন কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, দয়ারামের ইহাতে হাসি পাইল। প্রভুভক্ত দরারাম, রাজ-সংসারে অন্যের কর্ত্তৃত্বে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। একদিন রাণী ভবানী বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, দয়ারাম আসিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, যা'র তা'র কথায় তিনি রাজকার্য্য ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

রাণী ভবানী বড় বিস্মিত হইলেন। তিনি আবার লোক পাঠাইলেন। এবার দয়ারাম, আসিলেন।

রাণী ভবানী বলিলেন,—

"দয়াদাদা, আমি তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, না আসিয়া তুমি এমন উত্তর পাঠাইলে?"

দয়ারাম কহিলেন,—"আমি কোন অন্যায় করি নাই। রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, যা'র তা'র কথায় সে কার্য্য ফেলিয়া আসিতে পারি না। তাই বলিয়াছি; এবং উচিত কথাই বলিয়াছি।"

রাণী ভবানী কহিলেন,—"আমার কথা কি 'যা'র তা'র' কথা হইল, দয়াদাদা?" দয়ারাম উত্তর করিলেন,—"তা' বই কি? আপনি কে? আপনি রাণী নন, রাজমাতা নন, রাজার শাশুড়ী মাত্র। রাজার শ্বাশুড়ীকে আমি এত বড় মনে করি না যে, তাঁর ডাকে যখন তখন রাজকার্য্য ফেলিয়া চলিয়া আসিব। আপনি যদি কখনো রাজমাতা হন, তখন যোগ্য সম্মান আপনাকে দেখাইব।" দয়ারামের ইঙ্গিত ও অসন্তোষের কারণ রাণী ভবানী বুঝিতে পারিলেন। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন,—"দয়াদাদা! রাজমাতা হইয়া এই রাজবংশ রক্ষা, শ্বশুর ও স্বামীর নাম রক্ষা, তাঁহাদের জল-পিণ্ডের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা যে আমারো না আছে, তা'নয়। তবে তা'র সময় যথেষ্ট আছে, তাই এতদিন কোন উদ্যোগ করি নাই, তাই আপাততঃ জামাতার উপর কর্ত্তৃত্ব দিয়াছি। ইহাতে তোমার এত

অসন্তোষ, এত বিরক্তি কেন? যাই হ'ক তুমি কোন সুলক্ষণ বালকের অনুসন্ধান কর, আমি তা'কে পোষ্য পুত্র রাখিব।"

সন্তুষ্টচিত্তে দয়ারাম রাণীকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনন্দনের মৃত্যু হইল। অসামান্য রূপবতী রাজকন্যা তারা নবীন যৌবনে বিধবা হইলেন। সাংসারিক সুখের একমাত্র অবলম্বন, মাতৃজীবনের একমাত্র স্নেহের ধন, তাহার বৈধব্যে রাণী ভবানী যে কি মর্ম্মবেদনা পাইলেন, তাহা বাঙ্গালীর ঘরে, হিন্দুর ঘরে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই নিদারুণ যাতনার ছবি পাঠিকারা ঘরে ঘরে দেখিতেছেন।

কিন্তু রাণী ভবানীর ন্যায় অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারিণী যাঁহারা, ধর্ম্মের জন্য, দেবতার তুষ্টির জন্য, পরকালের কর্ত্তব্যের জন্য, ইহজীবনের সকল সুখ, সকল ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়াও শান্তিময় প্রাণে যাঁহারা জীবন যাপন করিতে পারেন, কোন দুঃখে, কোন শোকে, কোন বিপদে, কর্ত্তব্যের পথ হইতে তাঁহারা বিচলিত হন না। তারাও রাণী ভবানীর যোগ্য কন্যা। সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় মাতার জীবনের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের মধ্যে তাঁহার জীবন গঠিত। মাতার ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে ও ধর্ম্ম সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। কন্যার শান্তিতে মাতার মনেও ক্রমে শান্তি আসিল।

এদিকে পূর্ব্ব হইতেই দয়ারাম উপযুক্ত পোষ্যপুত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। জামাতার মৃত্যুর পর রাণী ভবানীও পোষ্যপুত্র গ্রহণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

যে সব সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের ঘরে এখনো উপনয়ন হয় নাই এমন সুন্দর ও সুলক্ষণ বালকপুত্র আছে, সকলে নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই সব বালক লইয়া রাজবাটীতে আসিবেন, দয়ারাম এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন। ঘরের ছেলে যদি রাজপদ পায়, তাই অনেক পিতা, অনেক পিতামহ, অনেক খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠ-তাত, অনেক ভ্রাতা নিজ নিজ ঘরের সুন্দর কুৎসিত, সুলক্ষণ কুলক্ষণ সকল প্রকার বালক লইয়াই নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজ-বাটীতে আসিলেন। (কারণ নিজের ঘরের ছেলেকে কেহ বড় কুৎসিত বা কুলক্ষণ দেখে না।) বিস্তৃত এক সুসজ্জিত গৃহে বালকদের বসিবার স্থান করা হইল। কিন্তু রাজবাড়ীর জাঁকজমক, লোকজন, এবং গৃহের সাজসজ্জা দেখিয়া সকল বালকই ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিল। একটি নির্ভীক বালক যারপরনাই সপ্রতিভ ভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়াই দয়ারামকে তা'র পাদুকা খুলিয়া লইতে বলিল। দয়ারাম হাসিয়া বালকের পাদুকা খুলিয়া দিলেন। বালক সোজা গিয়া মসলন্দে জাঁকিয়া বসিল। দয়ারাম ভাবিলেন, এই বালকই রাজা বটে।

রাণী ভবানীও অন্তরাল হইতে এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন। তিনি দয়ারামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দয়াদাদা, কোন্ বালককে তুমি তোমাদের রাজা বলিয়া পছন্দ

করিলে ?” দয়ারাম হাসিয়া কহিলেন,—“মা, আমাদের রাজা আপনিই রাজার মত আমাকে দিয়া জুতা খোলাইয়া রাজার আসনে গিয়া বসিয়াছেন। আমাদের কাহারো পছন্দের অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই। রাজা রামজীবন, রাজা রামকান্ত, যার কথামত চলিতেন, তাকে দিয়া যে বালক জুতা খোলাইয়া লইল. তার উপরে আর এ রাজ্যের রাজা কে হইতে পারে ? ঐ বালকই আমাদের রাজা ; আপনি উহাকেই দত্তক রাখুন।”

এই বালককে যথাবিধি দত্তক গ্রহণ করিয়া রাণী ভবানী তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ রাখিলেন।

(৪)

বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব দুর্ভাগ্য সিরাজদ্দৌলার নাম এদেশে সকলেই জানেন। ইতিহাসে ও লোকমুখে সিরাজদ্দৌলার নামে অনেক কলঙ্কের কথা শোনা যায়। তাঁহার অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও অকর্ম্মণ্যতা-সম্বন্ধে যে কথা আছে, তাহা অমূলক বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক অনেক প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে যার-পর নাই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। যৌবনের প্রথম হইতেই তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়লালসা এত বেসি প্রকাশ পায় যে বাঙ্গালার প্রধান জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন।

স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নিজে ধর্ম্মশীল ও সংযতচরিত্র হইয়াও দৌহিত্রের দুষ্ক্রিয়ায় কোনরূপ বাধা দিতেন না। অবাধে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সিরাজের ভোগলালসা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িতে লাগিল। অনেক কুলললনার অমূল্য সতীত্বধন সে লালসার আগুনে বিসর্জ্জিত হইল; অনেক বিশুদ্ধ কুলে কলঙ্কের কালী পড়িল। সকলেই যার-পর-নাই ভীত হইয়া উঠিলেন।

মুরসিদাবাদের নিকট বড়নগরে গঙ্গাতীরে রাণী ভবানীর একটি বাড়ী ছিল। অনেক সময় তিনি গঙ্গাবাসের জন্য সেখানে থাকিতেন। তাঁহার যুবতী বিধবা কন্যা তারা পরম রূপবতী ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মসেবা সে সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়াছিল। এমন উজ্জ্বল রূপে তারাকে দেববালার মত দেখাইত।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তারা আপন উজ্জ্বল রূপে দিবা আলো করিয়া গঙ্গাতীরে সেই বাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন সময় সিরাজের বিলাসতরণী সিরাজ ও তাঁহার বিলাস-সহচরগণসহ গঙ্গা বাহিয়া যাইতেছিল। সহসা তারাকে দেখিয়া সিরাজ মুগ্ধ হইলেন। প্রাণের সকল লালসা তাঁহার জাগিয়া উঠিল। অসংযত সিরাজের হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। তারাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা হইল। বলে, ছলে, কৌশলে যে ভাবেই হউক, তিনি তারাকে গ্রহণ করিবেন, এই সংকল্প করিয়া, সেইরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

বাণী ভবানী এই সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই ভীত হইলেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বরী,—চরিত্রের দৃঢ়তায়, তেজস্বিতায়, শাসন শক্তিতে এবং অসংখ্য সৎকর্ম্মে বাঙ্গালার জমিদার ও জনসাধারণ সকলেরই পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী। সিরাজ তাঁহার কন্যাকে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে যে, বাঙ্গালাময় বোধ ও অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু তবু তিনি ভীত হইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, ইন্দ্রিয়লালসায় উন্মত্ত সিরাজ, ভবিষ্যতে আপন কর্ম্মের ফল গণিতে অক্ষম। শেষে ফল কি হইবে, ইহা ভাবিয়া সিরাজ লালসা দমন কবিবেন না, করিতে পারিবেন না। সিরাজের কার্য্যে বাধা দেওয়া স্নেহে দুর্ব্বল আলিবর্দ্দীর ক্ষমতাতীত।

এদিকে বলপূর্ব্বক তারাকে হরণ করিবার জন্য সিরাজের সৈন্য আসিয়া বড়নগর আক্রমণ করিল। নিকটে রাণী ভবানীর অর্থে প্রতিপালিত সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম ছিল। ভবানী তাঁহাদের আশ্রয় প্রর্থনা করিলেন। প্রতিপালিকার সম্মান রক্ষার জন্য সন্ন্যাসীঠাকুররা ঢাল তরোয়ালে সাজিয়া আসিলেন। সিরাজের সৈন্য পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গেল।

ইহাতে যে সিরাজ নিরস্ত হইবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। কৌশলে সিরাজকে প্রতারিত করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত অবসর পাইবার জন্য, হিতৈষীগণের পরামর্শে রাত্রিতে গঙ্গাতীরে মিথ্যা চিতা জ্বালাইয়া রাণী ভবানী প্রচার করিলেন

যে, তারার সহসা মৃত্যু হইয়াছে এবং সেই চিতায় তারার মৃত রূপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছে।

কিন্তু এ কৌশল অধিক দিন গোপন থাকিতে পারে না। রাণী ভবানী আর বড়নগরে থাকিতে সাহস পাইলেন না। সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা রক্ষিত হইয়া তারাকে লইয়া তিনি নাটোরে ফিরিয়া আসিলেন। নাটোরে রাজবাড়ী পর পর তিনটি সুপ্রসর খাতে বেষ্টিত ছিল। এই খাতগুলিকে লোকে গড় বলিত। রাণী ভবানী তারাকে লইয়া এই গড়বেষ্টিত সুরক্ষিত রাজবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য লোকজন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কিছু সময় গত হওয়ায়, এই কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করিবার কিছু অবসরও সিরাজের হইল। কতক নিজের বিবেচনায় এবং কতক হিতার্থী বন্ধুগণের পরামর্শে তিনি বুঝিতে পারিলেন, রাণী ভবানীর ন্যায় শক্তি ও প্রতিপত্তি-শালিনী, সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী ভূম্যধিকারিণীর কুলে এইরূপ কলঙ্ক আনিবার চেষ্টা করিলে রাজ্যময় আগুন জ্বলিয়া উঠিবে; সে আগুনে তাঁহার সিংহাসন ও জীবন পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইতে পারে। তিনি নিরস্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইল। সিরাজ বাঙ্গালার নবাব হইলেন। অচিরেই সিরাজের সঙ্গে কলিকাতার ইংরেজ-কোম্পানীর বিবাদ উপস্থিত হইল।

সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ আলিবর্দ্দী ও সিরাজের

রাজত্বের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে, ইংরেজ বণিক কোম্পানী বাঙ্গালায় স্থানে স্থানে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করেন। পরে বাদসাহদের নিকট হইতে তাঁহারা কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের জমিদারী এবং বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কতকগুলি অধিকার লাভ করেন। তখন দেশে মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ, অরাজকতা ও অন্যান্য নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। এই সব দুঃসময়ে আত্মরক্ষাব প্রয়োজনে ইংরেজ-কোম্পানী কলিকাতায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কিছু সৈন্যও রাখিলেন। ক্রমে বাঙ্গালায় ইঁহাদের অনেক পরিমাণে সামরিক শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

বিদেশী বণিক ইংরেজের, দেশমধ্যে এইরূপ শক্তি বৃদ্ধি দেখিয়া বিচক্ষণ আলিবর্দ্দী খাঁ কিছু ভীত এবং চিন্তিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে তিনি সিরাজকে উপদেশ দিয়া যান।

এই সব কারণে ইংরেজের প্রতি সিরাজের সদ্ভাব ছিল না। শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে ইংরেজের ব্যবহারেও কিছু গর্ব্বিত ভাব দেখা যাইত। ইহাতে এবং অন্যান্য নানা কারণে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হইল। সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজের দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু মাদ্রাজ হইতে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব অনেক সৈন্যসহ আসিয়া নবাবের সৈন্য-পরাজিত কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহার পর কলিকাতায় ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের সন্ধি হইল। ইংরেজের শক্তি ও প্রতিপত্তি ইহাতে অনেক বাড়িল।

এই ঘটনার অল্প পরেই জগৎশেঠ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রধান কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী ও জমিদার, সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে সিরাজের সেনাপতি মীরজাফরকে নবাব করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করেন।

সকল দেশেই রাজার নিম্নে জমিদার ও প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের স্থান। ব্যক্তিগত বা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য এক রাজাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য রাজাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ইঁহাদের সমবেত চেষ্টা, ন্যায় কি অন্যায় যাহাই হউক, রাজায় রাজায় যুদ্ধের ন্যায় এরূপ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক ঘটিয়াছে ও ঘটিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে এই বাঙ্গালাতেই জমিদারগণের চেষ্টায় উচ্ছৃঙ্খল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ নবাব সরফরাজ খাঁ পদচ্যুত হন এবং আলিবর্দ্দী সিংহাসনলাভ করেন। এবারও সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহারা মীরজাফরকে সিংহাসন দিতে চান। কিন্তু সেবারে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; এবারে ইঁহারা ইংরেজের সহায়তা চাহিলেন। ইংরেজ তখন দেশের রাজা নন; তখন বিদেশী বণিক মাত্র। বণিক রূপে আসিয়া দেশের মধ্যে ইতিমধ্যেই তাঁহারা যথেষ্ট শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই কার্য্যে সেই ইংরেজের সহায়তা গ্রহণ করিলে যে ইংরেজের শক্তিই দেশের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিবে, ইংরেজের শক্তির নিকট ক্রমে তাঁহাদিগকে যে অবনত হইতে হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিলেন না।

কিন্তু স্বার্থের মোহে বা বুদ্ধির দোষে দেশের পুরুষনেতাগণ

যাহা বুঝিলেন না, অবলা রমণী-নেত্রী তাহা বুঝিয়াছিলেন। সিরাজের প্রতি বাস্তবিক রোষ ও অসন্তোষের কারণ সর্ব্বাপেক্ষা রাণী ভবানীর অধিক ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণজাত প্রতিহিংসা মহাপ্রাণা রাণী ভবানীকে তৎকালিক জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে অন্ধ করিতে পারিল না। এ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাই ষড়যন্ত্রকারী জমিদারগণ এ সম্বন্ধে তাঁহার মত চাহিয়া পাঠাইলে তিনি তাঁহাদের প্রতিকূলে মত দিলেন। ইঁহাদের কাপুরুষোচিত আচরণে এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কথিত আছে, ইঁহাদের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকে, তিনি যে পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য বিদ্রূপছলে শাঁখা ও সিন্দূর পাঠাইয়া দিলেন।

যাহা হউক, রাণী ভবানীর উপদেশ ও বিদ্রূপ কিছুতেই ইঁহারা নিজেদের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। ষড়যন্ত্রকারিগণের বাসনা ও চেষ্টা সফল হইল। ভাগীরথীতীরে পলাশীক্ষেত্রে ক্লাইবের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ পরাজিত হইলেন। তারপর পলায়িত দুর্ভাগ্য সিরাজ ধৃত হইয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে নিহত হইলেন। ইংরেজের আশ্রিত মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব হইলেন।

১০। ১২ বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালা একেবারে ইংরেজের শাসনাধীনে আসিল। মীরজাফরের বংশধর নবাবগণ ইংরেজের

বৃত্তি পাইয়া মুরসিদাবাদে রহিলেন। বাঙ্গালার রাজধানী উঠিয়া ইংরেজ-শক্তির কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় আসিল।

(৫)

কঠোর কর্ত্তব্যব্রত-পরায়ণ জীবন, দেবসেবা, লোকসেবা, দান ধর্ম্ম প্রভৃতি অসংখ্য সৎকর্ম্মে, অকুণ্ঠিত অজস্র ব্যয় প্রভৃতি যে সব কার্য্যে রাণী ভবানী চিরযশস্বিনী ও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, এখনো আমরা তাহার কোন আলোচনা করিতে পারি নাই। রাণী ভবানী যাহাতে রাণী ভবানী বলিয়া এ দেশে চিরপূজিতা, নিম্নে যথাসাধ্য তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

প্রথম বয়স হইতেই দেবতা ও ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং লোকসেবায় প্রাণের প্রবল আকর্ষণ ছিল। সধবা অবস্থায় জমিদারী তাঁহার হাতে ছিল না; কিন্তু যাহা কিছু অর্থ হাতে পাইতেন, তাহা তিনি ধর্ম্ম ও লোকসেবাতেই ব্যয় করিতেন। এই সময়েও অনেক স্থানে তিনি দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। জলকষ্ট-পীড়িত স্থানে অনেক পুষ্করিণী খনন করান। অন্ন বস্ত্র দানে অনেক দীনদুঃখীর দুঃখদূর করেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় দরিদ্রলোকের কন্যার বিবাহ দিয়া দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর জমিদারী হাতে পাইয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা এই সব কার্য্যে ব্যয় করিতেন। প্রথম জীবনে দেবসেবায় তাঁহার গভীর আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে।

একদিন রাজা রামকান্ত দুই ছড়া মতির মালা কিনিয়া রাণীকে বলিলেন,—"ইহার এক ছড়া তোমার; আর এক ছড়া জয়কালী দেবীর।" ভবানী দেখিলেন, এক ছড়া হার ভাল, আর এক ছড়া একটু নিকৃষ্ট। তিনি কহিলেন,—"কোন ছড়া দেবীকে দিতে চাও?" রামকান্ত হাসিয়া কহিলেন, "এই মন্দ ছড়া। ভাল ছড়া তোমার জন্য।"

ভবানী কহিলেন,—"আমি ভাবিয়াছিলাম ভাল ছড়াই দেবীকে দিব। ভাল, তবে দু'জনেরই মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হউক। দু'ছড়াই দেবীকে দেওয়া যাক্।" রাণীর দেবতা ভক্তিতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া রাজা কহিলেন,—"তোমার যদি এইরূপ ইচ্ছা হয় তবে তাহাই কর।"

দুই ছড়া মালাই দেবীকে দেওয়া হইল।

বিধবা হইয়া অবধি তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতিদিন এক কঠোর বাঁধা নিয়মে তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত হইত। নাটোরে না থাকিয়া প্রায়শঃ তিনি গঙ্গাতীরে বড়নগরেই থাকিতেন। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে উঠিয়া তিনি ২।৩ দণ্ডকাল জপ করিতেন। তারপর অন্ধকার থাকিতেই নিজের হাতে ফুল তুলিয়া, প্রাতঃস্নান করিয়া, ঘাটে বসিয়াই ২।৩ দণ্ড বেলা পর্য্যন্ত শিবপূজা ও গঙ্গাপূজা করিতেন। তারপর সকল দেবালয়ে ঘুরিয়া অঞ্জলি দিয়া ঘরে আসিতেন। ঘরে আসিয়া কিছুকাল পুরাণ শুনিয়া আবার ইষ্ট পূজা করিতেন। ইহাতে বেলা প্রায় দুইপ্রহর হইত। তখন সামান্য

কিছু জল খাইয়া গৃহে সকলের আহারের পরিদর্শন করিতেন। তারপর নিজের হাতে পাক করিয়া দশ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া নিজে হবিষ্য করিতেন। আহারের পর আচমন করিয়াই দেওয়ানখানায় গিয়া কুশাসনে বসিতেন। সেই খানে মুখশুদ্ধি করিতে করিতে বিষয়-কার্য্য সম্বন্ধে কর্ম্মচারিগণের বক্তব্য শুনিয়া কাগজ পত্র দেখিয়া যথাযোগ্য আদেশ লিখাইয়া দিতেন।

এই কার্য্য হইতে অবসর হইবামাত্র আবার আসিয়া পুরাণ শুনিতে বসিতেন। ২।৩ দণ্ড বেলা থাকিতে আবার কর্ম্মচারীরা আদেশ মত কাগজ-পত্র লিখিয়া লইয়া আসিত। তিনি দেখিয়া বা শুনিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতেন।

সন্ধ্যার সময় আবার গঙ্গাতীরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া গঙ্গাতে ঘৃত-প্রদীপ দিতেন। সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরিয়া রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত জপ করিতেন। জপের পর কিছু জল খাইয়া আবার দেওয়ানখানায় বসিয়া বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রজাদের প্রার্থনা শুনিয়া বিচার করিতেন। তারপর ২।৩ দণ্ডকাল, লোকজন যাহারা আসিত তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। এইরূপে দিনের সব কার্য্য শেষ হইলে, ঘুরিয়া ফিরিয়া গৃহে লোকজন সব কোথায় কি ভাবে আছে, কাহারো কোন অভাব বা অসুবিধা আছে কি না ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া যাহার যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ ব্যবস্থাদি করিয়া নিজে শয়ন করিতেন।

বিস্তীর্ণ জমিদারী হইতে তাঁহার বহু লক্ষ টাকা আয় হইত।

ব্রহ্মচারিণী কঠোরব্রতপরায়ণা বিধবার নিজের বসন ভূষণে ও ভোগবিলাসের কোন ব্যয়ই ছিল না। পরিজনবর্গের প্রতিপালন এবং নিজের নিত্য ব্রত পূজা ইত্যাদি কার্য্যে যাহা লাগিত, তাহা ভিন্ন আর সমস্ত আয়ই তিনি দানধর্ম্মে ও অন্যান্য লোকহিতকর কর্ম্মে ব্যয় করিতেন। সঞ্চয় একরূপ কিছুই করিতেন না।

ব্রাহ্মণ, অতিথি, তীর্থবাসী ও বিভিন্ন আশ্রমের সন্ন্যাসী-দিগের জন্য বৎসর এক লক্ষ আশী হাজার টাকার নগদ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য নানাস্থানে টোল স্থাপন করিয়া ছাত্রদের প্রতিপালন এবং শিক্ষাদানের জন্যও অনেক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই সব বৃত্তির টাকা বন্ধ না করিতে পারেন, এজন্য, ইংরেজ-শাসন স্থাপিত হইলে, বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি তিনি আপনার দেয় রাজস্বের সঙ্গে মিলাইয়া—সেই পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা দিতেন। অধ্যাপকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সময় মত বৃত্তির টাকা লইয়া টোলের ব্যয় চালাইতেন।

নিজের জমিদারী এবং অন্যান্য অনেকের জমিদারীর মধ্যে অনেক দরিদ্র লোককে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া তিনি চিরদিন তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন।

রোগীর চিকিৎসার জন্য ৮জন বৈদ্য তিনি বেতন দিয়া রাখেন। ইঁহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীদিগের চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন। ভারীরা নানাবিধ পাঁচন, পুরাণ চাউল, ছোট মাছ, মুগের ডাল, মিছরী প্রভৃতি

রোগীর পথ্য সামগ্রী লইয়া ইঁহাদের সঙ্গে যাইত। প্রত্যেকের সঙ্গে দুইজন করিয়া চাকর থাকিত, তাহারা অনাথ ও নিরাশ্রয় রোগীদিগকে ঔষধ পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইত। তখন দেশে স্থায়ী দাতব্য-চিকিৎসালয় ছিল না। কিন্তু, রাণী ভবানীর অপূর্ব্ব ব্যবস্থায় যেন আটটি নিত্য ভ্রমণশীল দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহার জমিদারীর মধ্যে ঘুরিত।

ইহা ছাড়া তিনি নাটোর নগরে, রাজসাহীতে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে বহু দেবালয়, জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। দেবালয়গুলির মধ্যে নাটোরের নিকটবর্ত্তী করতোয়ার তীরে পীঠস্থান ভবানীপুরের অপর্ণার মন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে।

এক দেশে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে থাকিতে হিন্দু ও মুশলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত বৈষম্য ও বিরোধের ভাবও অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। হিন্দুরাও মুশলমানের পীর-দরগায় সিন্নি দিতেন; মুশলমানরাও হিন্দুর দেবালয়ে অনেক মানত করিতেন। ভবানীপুরের পীঠস্থানে মানত করিয়া কোন ধনী মুশলমান দিল্লীর দরবারে এক মোকদ্দমায় জিতিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই মুশলমান, দেবীকে একটি অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু এই মন্দিরের বাহিরের সৌন্দর্য্য এত বেসি ছিল যে, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহাই বেসি সময় দেখিত; ভিতরে দেবী-দর্শনে বিশেষ আগ্রহ দেখাইত না। কথিত আছে, রাণী ভবানী একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, দেবী আসিয়া কহিতেছেন,—

"লোকে আমার মন্দিরের বাহির দেখিয়াই ভুলিয়া যায়, ভিতরে আসিয়া আমায় দেখিতে কেহ বড় তিষ্ঠে না। তুমি আমার মন্দিরের ভিতর সুন্দর করিয়া দাও।"

রাণী ভবানী মন্দির সংস্কার করিয়া ভিতর এমন সুন্দর করিয়া সাজাইলেন যে, মন্দিরের বাহিরের সৌন্দর্য্য একেবারে ডুবিয়া গেল। লোকে ভিতরে থাকিতে পারিলে আর বাহির দেখিতে যাইতে চাহিত না।

ভবানীপুরের তীর্থে যাইবার জন্য তিনি নাটোর হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত একটি সুপ্রসর রাস্তা নির্ম্মাণ করান। এই পথটি প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ। সারা পথের মধ্যে মধ্যে পান্থ-নিবাস নির্ম্মিত হইল। এই সব পান্থনিবাসে পথিকদিগের আহার ও বিশ্রামের জন্য সর্ব্বদা সকল প্রকার আয়োজন থাকিত। এই রাস্তাকে লোকে 'ভবানীজাঙ্গাল' বলে।

রাণী ভবানী এক-তুর্গোৎসবের সময় দানধর্ম্মে যাহা ব্যয় করিতেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রতিবৎসরে তুই হাজার কুমারী ও সধবাকে পাটের সাড়ী, শাঁখা ও সোণার নথ দেওয়া হইত। প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ একশত কুমারীকে সোণার অলঙ্কার দিয়া তিনি পূজা করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ৫০,০০০ টাকা দান করিতেন। ইহা ছাড়া হাজার হাজার দীনতুঃখী ও কাঙ্গালীকে ভোজনে ও দানে পরিতৃপ্ত করিতেন।

সকল দীনতুঃখী সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতে পারিত না,

তাই, বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণকে তিনি তাহাদের পদ অনুসারে এক টাকা হইতে একশত টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দান করিতে অধিকার দিয়া দেন।

যাহাকে যে কার্য্যে যাহা দান করিবেন বলিয়া তিনি একবার সংকল্প করিতেন, কিছুতেই তিনি তাহার অন্যথা করিতেন না। দানের বাহুল্যে সঞ্চিত অর্থ তাঁহার থাকিত না। একবার রাজস্ব ভাল আদায় না হওয়ায় সংকল্পিত দানের টাকা কম পড়িল। তিনি তখন খামারের শস্য বিক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে তিন লক্ষ টাকা হইল; কিন্তু ইহাতেও কুলাইল না। তখন নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তিনি বাকী টাকা সংগ্রহ করিলেন।

দানধর্ম্ম প্রভৃতির জন্য কাশীতে তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হইতে পারে না। কাশীতে রাণী ভবানীকে লোকে স্বয়ং অন্নপূর্ণা বলিয়া মানিত। এখনো কাশীবাসীরা প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার সঙ্গে রাণী ভবানীর নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

প্রথম যখন তিনি কাশীতে যান, বহুদ্রব্যে পরিপূর্ণ ১৭০০ খানি নৌকা তাঁহার সঙ্গে যায়। তার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দানধর্ম্মাদির পরিচালনার জন্য প্রতিবৎসর এক হাজার নৌকা কাশীতে যাইত।

তীর্থে অনেক দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ স্থাপিত করিয়া তিনি সে সমুদয়ের ব্যয়ের জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অন্নপূর্ণার

মন্দিরে প্রতিদিন পঁচিশ মণ চাউল বিতরণ করা হইত। বিভিন্ন দেবমন্দিরে যে ভোগ দেওয়া হইত, তাহাতে প্রত্যহ ৪।৫ হাজার লোক আহার করিতে পারিত। অন্নসত্রে প্রতিদিন ১০৮ জন সধবা ও কুমারী ভোজন করিতেন এবং প্রত্যেকে একটাকা করিয়া দক্ষিণা পাইতেন। বৃহৎ চৌবাচ্চায় প্রত্যহ ৮ মণ করিয়া ছোলা ভিজাইয়া রাখা হইত। অনাহূত যে কোন লোক ইচ্ছামত এই ছোলা লইয়া খাইত। দরিদ্র, বৃদ্ধ, অনাহূত ও আতুর তীর্থবাসীরা সকলে বাসস্থান ও বৃত্তি পাইত। তাহাদের মৃত্যু হইলে সৎকার ও শ্রাদ্ধও রাণী ভবানীর ব্যয়ে সম্পন্ন হইত।

হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত প্রকৃত কাশীর আকার ত্রিশূলের ন্যায় এবং ইহার সীমান্ত-রেখার পরিমাণ পাঁচ ক্রোশ। এই জন্য কাশীকে পঞ্চক্রোশী বলিয়া থাকে। কিন্তু এই পঞ্চক্রোশের প্রকৃত স্থান কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। রাণী ভবানীর বাসনা হইল, এই পূর্ণ পঞ্চক্রোশের মধ্যে বৎসরের প্রত্যেক দিনের হিসাবে ৩৬৫ খানা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থবাসীদের বাস-স্থানের জন্য উৎসর্গ করিবেন। রাণী ভবানীর ইচ্ছায়, ব্রাহ্মণগণ অনুমানে একটি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রাণী ভবানী এই সীমা ব্যাপিয়া একটি বৃহৎ রাস্তা এবং সীমার মধ্যে ৩৬৫ খানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তীর্থবাসীদের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এই রাস্তার পাশে কিছু দূর অন্তর অন্তর এক একটি করিয়া পিল্লা, কূপ ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্লান্ত ভারবাহী লোকেরা

একাই অনায়াসে সেই পিল্লার উপরে ভার নামাইয়া কূপের জল খাইয়া, গাছের তলায় বিশ্রাম করিয়া আবার একাই বোঝা তুলিয়া মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারিত। 'ধর্ম্মঢোকা' নামে এইগুলি এখনো বর্ত্তমান আছে।

ইহা ছাড়া, এক এক ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া পুষ্করিণী বা বৃহৎ কূপ খনিত হইল। তীর্থযাত্রীদিগকে এই পঞ্চক্রোশী পথে যাত্রা করিতে হয়, মধ্যে মধ্যে দেবালয় প্রভৃতিতে পূজা করিয়া এত পথ ঘুরিতে ২।৪ দিন লাগে। বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে রাণী বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহাতে পথিকদের জন্য চাউল, ডাইল, তরিতরকারী, ফলমূল, বাসনপত্র, এমন কি, পাথরের খোদা উনুন পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাকিত।

রাণী ভবানীর দয়া কেবল লোকসমাজেই শেষ হইল না। এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে পাখীদের জন্য স্থানে স্থানে আহার্য্য রাখা হইত; পিপীলিকার গর্ত্তের কাছে চিনি মিছরী ও গুড় থাকিত।

কাশীবাসীদের, রাণী ভবানীর প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, রাণী ভবানীর নির্দ্দিষ্ট এই পঞ্চক্রোশব্যাপী সীমা, পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমা বলিয়া গৃহীত হইল।

(৬)

মানব মাত্রই বিশ্বদেবতার অংশ; মানবের আত্মা বিশ্বদেবতার বিশ্ব-আত্মার অংশ; মানবের প্রাণ বিশ্বদেবতার বিশ্বপ্রাণের অংশ; মানবের মূর্ত্তি বিশ্বদেবতার বিশ্বমূর্ত্তির অংশ।—

জ্ঞানী হিন্দুরা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাই কোন মানবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনে অসাধারণ শক্তি দেখিলে তাঁহারা মনে করেন, বিশ্বদেবতা বিশেষ ভাবে ইঁহার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানীর উচ্চ তত্ত্বজ্ঞান সাধারণ লোকে পরিষ্কাররূপে না বুঝিলেও, তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ইহার প্রভাব অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাই, অসাধারণ শক্তি ও সাধনা কাহারো মধ্যে দেখিলে, তাঁহাকে মানবরূপে স্বয়ং কোন দেবতা বলিয়া সাধারণতঃ হিন্দুরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসের ফলে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথাও তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ে।

শিবাজি ও অহল্যাবাই সম্বন্ধে এইরূপ কোন কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে,—পাঠিকারা তাহা পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন;—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের অসাধারণ মহিমায় মহিমান্বিতা রাণী ভবানীকেও সাময়িক লোকে মানবীরূপে স্বয়ং দেবী ভগবতী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাই তাঁহারও জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহার কিছু বিবরণ না দিলে রাণী ভবানীর জীবনের ইতিহাসাংশ অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

কাশীতে ব্রাহ্মণ, তীর্থবাসী ও দীন দুঃখী—এমন কি, ইতর প্রাণীকে পর্য্যন্ত মুক্তহস্তে অন্নদান জন্য, কাশীর অধিষ্ঠাত্রী অন্নপূর্ণার ন্যায় লোকে রাণী ভবানীকে ভক্তি করিত, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। একবার, দান করিতে বসিয়া,

অনেক সময় রাণী ভবানী যেমন হিসাবের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, সেইরূপ ঘটিল। সঙ্গে যে টাকা গিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া রাণীর আরো এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইল। রাজসাহী হইতে এই টাকা আসিতে বিলম্ব হওঁয়ায় তিনি কাশীর কোন ধনী বণিক ও মহাজনের নিকট এক লক্ষ টাকা ধার চাহিলেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে চিরদিনই এমন অনেক আছেন, যাঁহারা কিছু বেশী হিসাবী এবং নিজেদের টাকাকড়ি ও ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়া সংসারের আর কিছু খবর রাখেন না। এই মহাজন সেই প্রকৃতির লোক। তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালা হইতে এমন অনেক রাজা ও রাণী আসিয়া থাকে। রাণী ভবানীর ঘরের খবর আমি জানি না। ইঁহাকে 'আমি টাকা দিব না।"

রাত্রিতে বণিক স্বপ্নে দেখিলেন, স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাঁহার কাছে আসিয়া কহিতেছেন, 'মূর্খ, তুই আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছিস্? আমি টাকা ধার চাহিলাম, তা'ই দিলি না? আমি ও রাণী ভবানী যে এক; আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমিই রাণী ভবানীরূপে কাশীতে আসিয়া সকলকে অন্ন বিতরণ করিতেছি। আমার সেই অন্নদানে তুই বাধা দিতে চাস্!"

বণিক জাগিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাতেই টাকা লইয়া রাণী ভবানীর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন প্রার্থনা করিল। রাণী ভবানী বলিয়া পাঠাইলেন, "এখানে নয়। অন্নপূর্ণার মন্দিরে সাক্ষাৎ হইবে।"

বণিক ফিরিয়া গেল। রাণী ভবানী যখন অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া অন্নপূর্ণার পূজা করিতেছিলেন, বণিক তখন গিয়া প্রণাম করিয়া রাণী ভবানীর দিকে চাহিল। সে দেখিল, রাণী ভবানী ও অন্নপূর্ণা এক।

মুখে মুখে এ কথা কাশীময় প্রচারিত হইল। সেই অবধি কাশীবাসীরা রাণী ভবানীকে স্বয়ং অন্নপূর্ণা মা বলিয়া মানিত। তাই প্রাতে এখনো কাশীতে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার সঙ্গে রাণী ভবানীর নাম উচ্চারিত হয়।

শেষ অবস্থায় রাণী ভবানীর দান ধর্ম্মের ব্যয় এত বাড়িয়াছিল যে, সময়ে সময়ে সরকারী খাজানা বাকী পড়িত। রাজসাহীর কালেক্টর শোর সাহেব এই জন্য তাঁহার সমস্ত জমিদারী ছোট ছোট ভাগে ভাগ করিয়া পত্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন। সহসা একদিন রাত্রিতে শোর সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন, খড়গধারিণী শ্যামা মূর্ত্তিতে কে আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "সাবধান! রাণী ভবানীর জমিদারী যদি আর কাহাকেও দাও, তবে এই খড়্গে তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

লোকে যাহাকে কুসংস্কার বলে, তাহা সকল দেশের লোকের মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখা যায়। বিশেষ, তখনকার ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এদেশের আচার নিয়ম অনেক পালন করিতেন। এ দেশের প্রথা অনুসারে কোম্পানীর রীতিমত পুণ্যাহ হইত। কোম্পানীর পক্ষ হইতে কালীঘাটেও পূজা দেওয়া হইত বলিয়া শোনা যায়। যাহাহউক, শোর সাহেব এই

স্বপ্ন দেখিয়া রাণী ভবানীর জমিদারী পত্তনের সংকল্প ত্যাগ করিলেন, এইরূপ লোকপ্রবাদ আছে।

রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের ধর্ম্মসাধনার দিকে প্রবল আকর্ষণ ছিল। বিষয়ধর্ম্ম ও সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি করতোয়ার তীরে পীঠস্থান ভবানীপুরে অপর্ণাদেবীর মন্দিরে বসিয়া তপস্যা করিতেন। রাণী ভবানী তাঁহাকে সংসার-ধর্ম্মে ফিরিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। তিনি বলিতেন,—"তোমার হাতে বৃহৎ রাজ্যের মত এত বড় জমিদারীর ভার। বহুলোকের কল্যাণ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। গৃহে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখিয়া, সাধনা ও লোক-সেবা দুই-ই কর। লোকসেবা করিবার শক্তি ও অধিকার দেবতা যাহাকে দিয়াছেন, লোকসেবাই তাহার পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম অবহেলা করিলে দেবতার কাছে তাহাকে পাপী হইতে হয়। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; এখন আর এত বড় জমিদারীর পরিদর্শন করিতে পারি না। এ জমিদারী এখন তোমার, তোমার পরি-দর্শনের অভাবে ইহা নষ্ট হইবে। ইহার আয় হইতে এ পর্য্যন্ত যে সব ধর্ম্মসেবা ও লোকসেবা হইয়াছে, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ ও দীনদরিদ্রের হিত হইয়াছে। ইহা নষ্ট হইলে তাহা আর হইবে না। বিষয়কর্ম্মে অবহেলা করিয়া বিষয় সম্পত্তি সব নষ্ট করিয়া লোকহিতে আঘাত করিও না : এ বিষয়কর্ম্ম দেখিলে তুমি পাপের ভাগী হইবে না। দেবতার তুমি সাধনা করিতেছ, তিনিও ইহাতে তোমার উপর প্রীত হইবেন। তোমার সাধনা ও

জপ তপ অপেক্ষা, লোকহিতে, তোমার দানধর্ম্মে, তাঁহার বেশী তুষ্টি হইবে। দান ধর্ম্মের জন্যই তিনি তোমাকে এই সম্পদ্ দিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা অবহেলা করিয়া তাঁহাকে রুষ্ট করিলে তোমার ইহকাল পরকাল কিছুরই মঙ্গল হইবে না।”

রামকৃষ্ণ মাতার কথা কাণে তুলিলেন না। মন্দিরে থাকিয়া তিনি সাধনা-ই করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার সাধনার উত্তরসাধক ছিলেন (শক্তি-সাধনায় যে ব্যক্তি সাধকের সহায় বা সহযোগী থাকেন, তাঁহাকে উত্তরসাধক বলে)। উভয়ে অনেক বিভীষিকা দেখিতেন এবং এই ভীম গম্ভীর বাণী শুনিতেন,—“গৃহে যাও, তোমার মা’র সেবা কর, মা’র কথামত চল, তাহাতেই আমি তুষ্ট হইব। তোমার মা ও আমি এক।”

কিন্তু রামকৃষ্ণ ও ভোলানাথ ভীত হইলেন না, চঞ্চল হইলেন না, সাধনা ত্যাগ করিলেন না। শেষে তাঁহারা এক দিন দেখিলেন, যেন রাণী ভবানী ভীম তেজস্বিনী উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে খড়গ হাতে তাঁহাদের দিকে ধাইয়া আসিতেছেন। উত্তরসাধক ভোলানাথ ভীত হইয়া আসন ত্যাগ করিলেন। অদৃশ্য অলৌকিক কোন শক্তি রামকৃষ্ণকে তুলিয়া বেগে অনেক দূরে কোথায় ফেলিয়া দিল।

ভগ্নদেহে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রামকৃষ্ণ সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

মন্দিরের লোক-জন অতি কষ্টে অনেক অনুসন্ধানে তাঁহাকে

লইয়া নাটোর রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। তখন রামকৃষ্ণের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা।

তিনি দৈব-আদেশ শুনিলেন,—“তোমার মাতার দয়া ও আশীর্ব্বাদ ব্যতীত তোমার দেহমুক্তি ও সুগতি হইবে না।”

রামকৃষ্ণ মাতার পাদোদক চাহিয়া পাঠাইলেন। রাণী ভবানী তাহা দিলেন না। রামকৃষ্ণ কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“মা, অবহেলা করিয়াছি বলিয়া কি এখনো তোমার রোষ গেল না? এখনো সন্তানকে দয়া করিবে না?”

এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র রাণী ভবানী ছুটিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন।

হায় মা! তাই তুমি করুণারূপিণী জননী,—ধরিত্রী-সাগর-তুল্য ক্ষমাশীলা, বিশ্বধারিণী!

মাতা আসিলেন, আসিয়া মুমূর্ষু রামকৃষ্ণের মস্তকের উপর আপনার চরণ স্থাপন করিলেন।

রামকৃষ্ণ, সেই অন্তিম সময়ে,—এতকাল যে মায়ের সহস্র বাক্য সহস্র উপদেশ ঠেলিয়া আসিয়াছেন, যে মাকে ভুলিয়া, সিদ্ধিলাভের আশায় এতকাল বৃথা এত সাধনা করিয়াছেন, অন্ত্য সেই মাতা ভবানীতেই তাঁহার ইষ্টদেবীকে দর্শন করিলেন।—আজ তাঁহার সাধনার সিদ্ধি হইল;—আজ তাঁহার ললাট-বদনে যেন কোন্ অমৃতদীপ্তির, কৃতার্থজীবনের চরমশান্তির, চরমতৃপ্তির, চরম আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিল;—আনন্দে, প্রেমে, ভক্তিতে, অপার ব্যাকুল গদ্‌গদ ভাবে তাঁহার মুখে মা! মা! রবের উচ্ছ্বাস

উঠিল। নয়নপল্লব ভেদ করিয়া সহস্র ধারায় মর্ম্মের বিগলিত অশ্রু গলিয়া পড়িল ;—আনন্দোজ্জ্বল চক্ষু ভরিয়া কৃতার্থ হৃদয়ের পূর্ণতার অশ্রু বহিতে বহিতে, আজ পরম সিদ্ধ সাধকের মুক্ত আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল।

রাজা রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে এই গল্প রাজসাহী-অঞ্চলের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচারিত।

(৭)

এইরূপে জীবন ভরিয়া নিজে কঠোর ব্রতচারিণী থাকিয়া ধর্ম্মসেবায় ও লোকসেবায় বিপুল সম্পত্তির সমস্ত আয় মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া, দেবী—করুণাময়ীরূপে, ভগবতীরূপে লোকসমাজে পূজিতা হইয়া, ৭৯ বৎসর বয়সে সার্থক জীবনের অবসানে গঙ্গা-তীরে রাণীভবানী দেহ ত্যাগ করিলেন।

প্রাণে, পুণ্যে, জয়ে, গৌরবে, তাঁহার পরম পবিত্র জাগ্রত নাম বঙ্গদেশের চির পুণ্যমুকুট হইয়া রহিয়াছে।

রামকৃষ্ণের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হইলেন, কনিষ্ঠ শিবনাথ সেবায়ত রূপে দেবসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির পরিচালনার ভার পাইলেন। বিশ্বনাথের সময় সমস্ত জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। রাণী ভবানীর কন্যা তারাঠাকুরাণীর নামে যে সব বড় বড় তালুক ছিল, সব তিনি বিশ্বনাথকে দান করেন। সেই সব তালুক হইতে বর্ত্তমানে নাটোরের বড় তরফের জমিদারী হইয়াছে। বিশ্বনাথের প্রপৌত্র মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর এখন সেই বড় তরফের জমিদার। শিবনাথের অধিকৃত দেবসেবার সম্পত্তি হইতে ছোট তরফের জমিদারী হইয়াছে। শিবনাথের পৌত্র ছোট তরফের রাজা যোগেন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর কয়েক বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্র এখন জমিদারীর অধিকারী।

—দ্বিতীয় ভাগ—

সমাপ্ত।